চিকিৎসা বিজ্ঞানে বাঙালী

চিকিৎসা বিজ্ঞানে বাঙালী

অরুণকুমার চক্রবর্তী

: সিগনেট বুকশপ : কলকাতা ১২

CHIKITSA VIJNANE BANGALI

By Dr. Arun Kumar Chakravorty

প্রথম প্রকাশ
মে ১৯৫৯

প্রকাশিকা
অরুণা বাগচী
অরুণা প্রকাশনী
৭ যুগলকিশোর দাস লেন
কলকাতা ৬
প্রচ্ছদপট
পূর্ণেন্দু পত্রী
মুদ্রক
জগন্নাথ পান
শান্তিনাথ প্রেস
১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলকাতা ৬
বাঁধিয়েছেন
অশোকা বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
৫০ পটলডাঙা স্ট্রীট
কলকাতা ৯
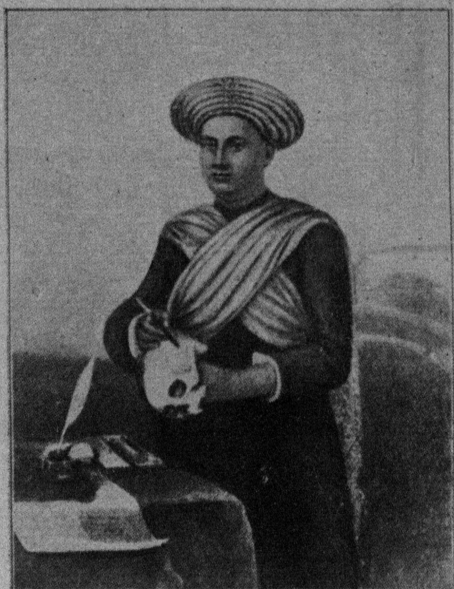
মধুসূদন গুপ্ত

প্রথম বিলাতযাত্রী চারজন ছাত্র
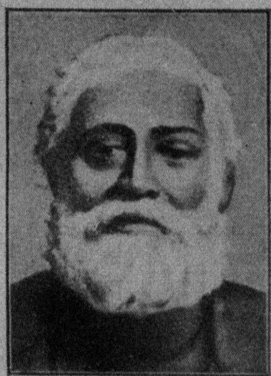
সূর্যকুমার সর্বাধিকারী
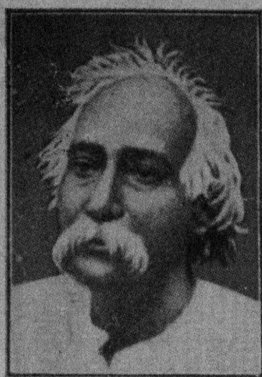
মহেন্দ্রলাল সরকার

নীলরতন সরকার
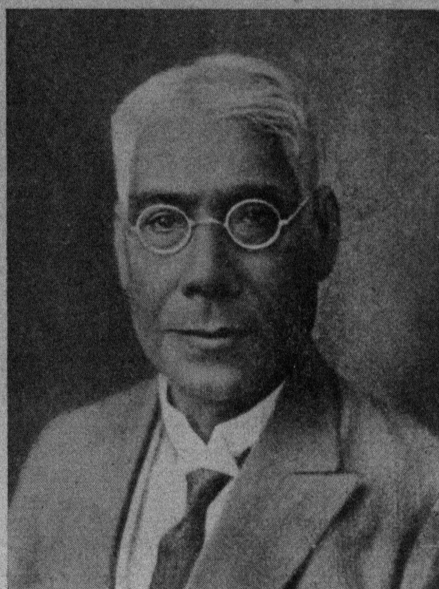
কেদারনাথ দাস

কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়
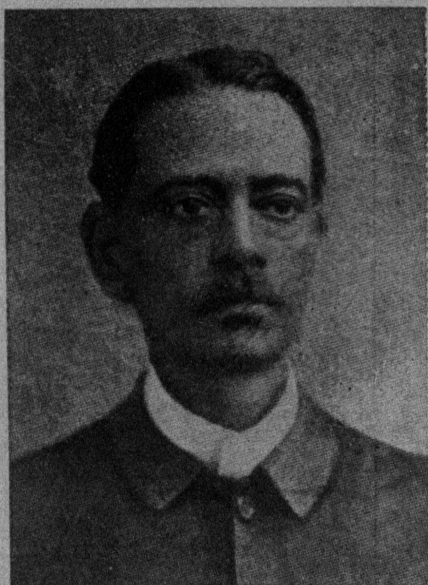
সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারী

রাখালদাস ঘোষ

মৃগেন্দ্রলাল মিত্র

বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

হাসান সুরাবর্দি

সুবোধ মিত্র

বিধানচন্দ্র রায়

চুনিলাল বসু

সুন্দরীমোহন দাস

কুমুদশঙ্কর রায়
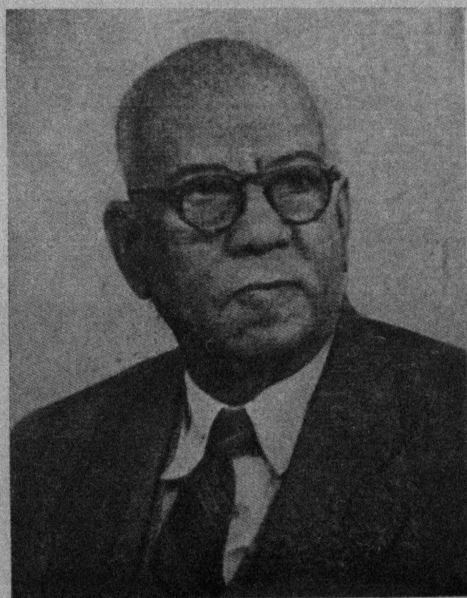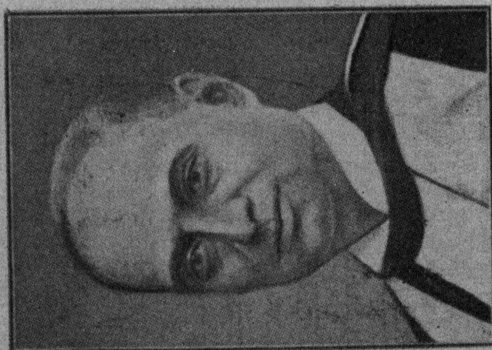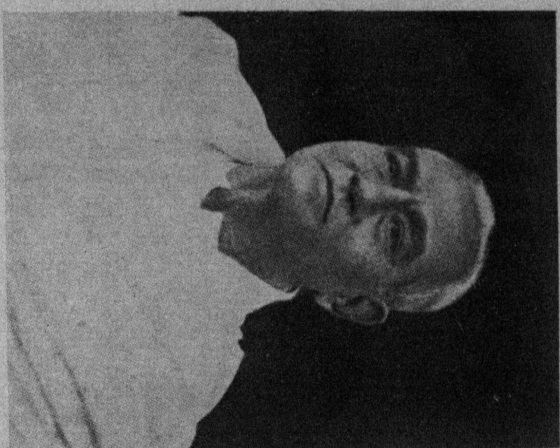
অবতরণিকা

রোগ নিয়ে মানুষের ভাবনা

মানুষের ইতিহাসের আদিপর্ব থেকেই তাকে সংগ্রাম করতে হয়েছে তিনটি বিরুদ্ধ-শক্তির সঙ্গে—প্রকৃতি, বন্যজন্তু ও ব্যাধি। ব্যাধি মানুষের মনে যুগপৎ আতঙ্ক এবং প্রশ্ন উদ্রেক করেছে। ব্যাধির প্রতিকারের জন্য তার চেষ্টা চিরকালের। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষ রোগের কারণ সম্বন্ধে ভেবেছে, অনেক রোগের কারণ জানতে পেরেছে, আবার এমন অনেক রোগ আছে যাদের কারণ এখনো তার অজ্ঞাত। চিকিৎসার বেলাতেও তাই। অনেক রোগ চিকিৎসার ফলে নিরাময় হয়, আবার এমন সব রোগও আছে, যাদের কোনো সন্তোষজনক চিকিৎসা আজ পর্যন্ত জানা যায়নি। কিন্তু মানুষের চেষ্টার বিরাম নেই। রোগের কাবণ জানার এবং সার্থক চিকিৎসা-পদ্ধতি উদ্ভাবন করার চেষ্টা মানুষ প্রতিনিয়ত করে চলেছে।

একেবারে গোড়ায় মানুষ ভাবত রোগের কারণ হচ্ছে প্রেতের প্রভাব বা দেবতার রোষ। প্রেত আসে মৃত বা জীবিত ব্যক্তির কাছ থেকে। ভিন্ন ভিন্ন রোগের জন্য তার কল্পনায় ছিল ভিন্ন ভিন্ন প্রেত। এক ব্যাবিলনেই প্রায় এক লক্ষ প্রেতের উপদ্রব ছিল। রোগ নিরাময়েব 'উপায়' ছিল—নানা উপঢৌকন দিয়ে প্রেতকে তুষ্ট রাখা বা জোর কবে তাকে শরীর থেকে বিতাড়ন করা। ম্যাজিকের সাহায্যেই তা করা সম্ভব হত। সে সময়ে ম্যাজিসিয়ান বা যাদুকররা ছিল চিকিৎসক। প্রেত বিতাড়নের জন্য নানা মন্ত্র এবং আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কলাপের সাহায্য নেওয়া হত। আবার দেবতা যদি কোনো কারণে মানুষের উপর রুষ্ট হতেন, তাহলে তাকে শাস্তি দিতেন ব্যাধি দিয়ে। দেবতাকে খুশি রাখার জন্য মানুষের চেষ্টার অন্ত ছিল না। পূজা, প্রার্থনা, উৎসর্গ প্রভৃতি দ্বারা দেবতাকে তুষ্ট করাই ছিল ব্যাধি

নিরাময়ের উপায়। এ ধরনের চিকিৎসা ছিল পুরোহিতের হাতে। রোগের জন্য প্রেত বা দেবতা দায়ী, এ ধারণা এখনো কোনো কোনো গোষ্ঠীতে বিদ্যমান।

প্রেতবিতাড়ন বা দেবতা তোষণ সেকালের প্রধান চিকিৎসাবিধি হলেও মানুষ ক্রমশ যাদুকরী বিদ্যার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করেছে। 'ট্রিফাইনিং' অর্থাৎ মাথার খুলিতে গর্ত করা এমনি একটি চেষ্টা। মস্তিষ্কের কোনো কোনো অসুখে সেযুগে বোধ হয় এই অপারেশন করা হত। উদ্দেশ্য, প্রেতকে শরীরের ভিতর থেকে বার করে দেওয়া।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অগ্রসরতার ইতিহাসে কয়েকটি দেশের কৃতিত্ব অপরিসীম। প্রাচীন মিশর তার মধ্যে অন্যতম। খ্রীস্ট জন্মের প্রায় তিন হাজার বছর আগে মিশরে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। রোগের কারণ সম্বন্ধে সে দেশের চিকিৎসকদের ধারণা ছিল যে অন্ত্র থেকে কোনো দূষিত পদার্থ রক্তে প্রবেশ করে রক্ত দূষিত করে এবং তার ফলে রোগ উৎপন্ন হয়। অলৌকিকতার প্রভাব তখনো যথেষ্ট ছিল, কিন্তু চিকিৎসকরা বিরেচক, বমনকারক ওষুধ ব্যবহার করতেন, রক্তক্ষরণ করাতেন—যেগুলি পরবর্তীযুগে ইয়োরোপীয় চিকিৎসার অন্তর্ভূত হয়। বিশেষজ্ঞর সংখ্যা তখন খুব বেশি ছিল—কেউ করতেন শুধু মাথার অসুখের চিকিৎসা, কেউ করতেন চোখের, কেউ বা নাকের; প্রায় প্রতিটি অঙ্গের জন্য ছিলেন বিশেষজ্ঞ। চিকিৎসার দেবতা ছিলেন ইমহোটেপ (Imhotep)। ইমহোটেপের মন্দির ছিল চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা দেওয়ার স্থান।

আর একটি দেশ ব্যাবিলন। সেখানেও চিকিৎসাশাস্ত্রের যথেষ্ট চর্চা ছিল। মানুষের শরীরের অঙ্গ অর্থাৎ শারীর স্থান (Anatomy) সম্বন্ধে ব্যাবিলনের চিকিৎসকদের মোটামুটি একটা ধারণা ছিল। যেসব পশু দেবতার উদ্দেশে বলি দেওয়া হত, সেসব পশুর অঙ্গ পরীক্ষা করত তারা। তাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ছিল যকৃৎ। হামুরবির কোড (Code Hammurabi) থেকে জানা যায়, তাঁর

রাজত্বকালে (২০০০ খ্রীঃ পূঃ) চিকিৎসা-ব্যবস্থা সুসংগঠিত ছিল, চিকিৎসকদের দর্শনী নির্দিষ্ট ছিল এবং অন্যায় আচরণকারী চিকিৎসকদের দণ্ডদানের বিধান ছিল।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের আশ্চর্য উন্নতি হয়েছিল ভারতবর্ষে। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের জন্ম সম্ভবত খ্রীষ্টপূর্ব পাঁচ হাজার বছর আগে। প্রবাদ এই যে ব্রহ্মা সৃষ্টি করেছিলেন আয়ুর্বেদ। তিনি এই বিদ্যা শেখালেন দক্ষ প্রজাপতিকে। দক্ষ আবার শিক্ষা দিলেন সূর্যপুত্র অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে। দেবরাজ ইন্দ্র আয়ুর্বেদ শিক্ষা করলেন অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের কাছ থেকে। মর্তের ঋষিরা ভরদ্বাজ মুনিকে পাঠালেন ইন্দ্রের কাছে আয়ুর্বেদ শিক্ষার জন্য। ভরদ্বাজের শিষ্য ছিলেন আত্রেয় বা পুনর্বসু।

আত্রেয় ঐতিহাসিক ব্যক্তি। তিনি তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ছিলেন। 'আত্রেয় সংহিতা' আয়ুর্বেদের একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। আত্রেয়ের কয়েকজন শিষ্য ছিলেন। চরক সম্ভবত আত্রেয়ের শিষ্য। চরক সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। যেটুকু জানা যায় তা থেকে মনে হয়, তিনি ছিলেন কুষাণরাজ কণিষ্কের চিকিৎসক। 'চরক-সংহিতা' একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

দেবরাজ ইন্দ্রের অপর এক শিষ্য ছিলেন কাশীরাজ ধন্বন্তরি। অন্য প্রবাদ এই যে, সমুদ্র মন্থনের সময় ধন্বন্তরির আবির্ভাব। তাঁর হাতে ছিল অমৃতের ভাণ্ড। ধন্বন্তরির ছয়জন প্রধান শিষ্য ছিলেন। তাঁদের মধ্যে সুশ্রুত শ্রেষ্ঠ। ধন্বন্তরি তাঁর শিষ্যদের প্রশ্ন করেছিলেন, চিকিৎসাশাস্ত্রের কোন বিষয়ে তারা বুৎপত্তি লাভ করতে চায়। শিষ্যরা উত্তর দিয়েছিলেন—শল্যচিকিৎসা।

সুশ্রুতও ঐতিহাসিক ব্যক্তি। তিনি ছিলেন শল্য-চিকিৎসক। তাঁর জন্মস্থান কাশীতে। সুশ্রুত অস্ত্রোপচারের বহু যন্ত্রপাতির বর্ণনা করেছেন। প্লাস্টিক সার্জারির মতো কঠিন অস্ত্রচিকিৎসা তখন করা হত। সুশ্রুত শল্য-চিকিৎসক হলেও, চিকিৎসাশাস্ত্রের অন্যান্য বিভাগে তাঁর প্রভূত জ্ঞান ছিল। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'সুশ্রুত সংহিতায়' শল্যচিকিৎসা ছাড়াও আলোচিত হয়েছে ভেষজবিদ্যা, শারীরস্থান, প্রসূতিতন্ত্র প্রভৃতি বিষয়।

বিম্বিসারের রাজত্বকালে মগধে বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন জীবক। জীবক রাজগীরে জন্মগ্রহণ করেন এবং তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি বিম্বিসারের চিকিৎসক ছিলেন এবং গৌতম বুদ্ধকে কয়েকবার চিকিৎসা করেন। তাঁর এতই খ্যাতি ছিল যে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তাঁর কাছে রোগী আসত, আর দর্শনীও ছিল খুব বেশি। 'কাশ্যপ সংহিতা' তাঁর রচিত। আয়ুর্বেদের মতে রোগের উৎপত্তি হয় বায়ু, পিত্ত, কফ এই তিন উপাদানের অসম সংযোগে।

'আধুনিক' চিকিৎসা-বিজ্ঞানের গুরু গ্রীস। মিশরে ইমহোটেপের মতো গ্রীসে চিকিৎসার দেবতা ছিলেন অ্যাপোলোর পুত্র এস্‌কিউ-লেপিয়াস্ (Aesculapius)। তাঁর কন্যা হাইজিয়া (Hygiea) ছিলেন স্বাস্থ্যের দেবী। খ্রীস্টপূর্ব ৪৬০ অব্দে এমন এক ব্যক্তির জন্ম হয় কসদ্বীপে, যিনি চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের শ্রেষ্ঠ গুরু বলে স্বীকৃত। তিনি শুধু বড় চিকিৎসকই ছিলেন না, চিকিৎসা-বিজ্ঞানে তিনি এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনলেন। সেই মহান গ্রীকের নাম হিপোক্রেটিস (Hippocrates, ৪৬০—৩৭৫ খ্রীঃ পূঃ)। হিপোক্রেটিসের ছিল সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা, আর যা দেখতেন তাই লিখে রাখার অভ্যাস। তিনিই প্রথম বললেন, রোগের জন্য কোনো প্রেত বা দেবতা দায়ী নয়। প্রকৃতির মধ্যেই আছে রোগ-উৎপত্তির বীজ। তাঁর মতে পৃথিবীতে চার রকমের উপাদান আছে: অগ্নি, বায়ু, মাটি ও জল। মানবদেহেও আছে চারটি উপাদান: রক্ত, কফ, হলুদ পিত্ত ও কালো পিত্ত। এ যেন আয়ুর্বেদেরই প্রতিধ্বনি! যখন এই সব উপাদান যথাযথ পরিমাণে থাকে, তখন শরীর সুস্থ থাকে, কিন্তু কোনো একটির কম বেশি হলে শরীর অসুস্থ হয়। হিপোক্রেটিসের মৃত্যু হয় খ্রীস্টপূর্ব ৩৭৫ অব্দে।

হিপোক্রেটিসের সময়েই ছিলেন সক্রেটিস (৪৬৩—৩৯৯ খ্রীঃ পূঃ) ও প্লেটো (৪২৭—৩৪৭ খ্রীঃ পূঃ)। প্লেটো হিপোক্রেটিসকে মহান চিকিৎসক বলে উল্লেখ করেছেন। প্লেটোর শিষ্য অ্যারিস্টট্ল (৩৮৪—৩২২ খ্রীঃ পূঃ) চিকিৎসক ছিলেন না, কিন্তু চিকিৎসা-বিজ্ঞান তাঁর কাছে গভীর-

ভাবে ঋণী। তুলনা-মূলক শারীরস্থান, প্রাণীতত্ত্ব, শারীরবৃত্ত, ভ্রূণতত্ত্ব, উদ্ভিদবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়গুলির স্রষ্টা অ্যারিস্টট্ল। জন্তুর দেহ ব্যবচ্ছেদ করে মানবদেহের অঙ্গ সম্বন্ধে তিনি সম্যক ধারণা করেছিলেন। মানুষের মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করার প্রয়াস তখনো শুরু হয়নি। অ্যারিস্টট্ল হৃদ্‌যন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উল্লেখ করেছেন।

খ্রীস্টীয় ১৩১ অব্দে জন্ম হল আর এক মহান চিকিৎসকের, যাঁর প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল সারা ইয়োরোপে এবং হাজার বছর ধরে সেই ব্যক্তির চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়েছিল ইয়োরোপের চিকিৎসা। তাঁর নাম গ্যালেন (Galen ১৩১—২০১ খ্রীস্টাব্দ)। গ্যালেনের জন্ম প্যারগামস্ (Pergamos) শহরে। চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা করার এতই আগ্রহ ছিল তাঁর যে গ্রীসের শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি গেলেন আলেকজান্দ্রিয়াতে। আলেকজান্দ্রিয়া স্কুল স্থাপিত হয় খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে। এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে বর্তমান কালের মতো লেবরেটরি, লাইব্রেরি ও হাসপাতাল ছিল। আলেকজান্দ্রিয়াতে গ্যালেন বিশেষ করে শিখেছিলেন শারীর-স্থান। সে সময়ে শুধু ঐখানেই মানুষের মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করা হত। গ্যালেনের আসল কর্মক্ষেত্র রোম। ১৬২ অব্দে তিনি আসেন রোমে। চিকিৎসক হিসাবে গ্যালেন অতি শীঘ্র শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করলেন। অন্যদিকে তিনি ছিলেন গবেষক ও দার্শনিক। শারীরস্থান তাঁর প্রিয় বিষয়। হৃদ্‌যন্ত্রের এবং শিরাধমণীর সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন তিনি। রোগের উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে গ্যালেন ধারণা করতে পেরেছিলেন, রোগের জন্য তিনটি জিনিস দায়ি—প্রাকৃতিক অবস্থা, শারীরিক অবস্থা এবং রোগকারক উপাদান। ভেষজ-বিদ্যার উপর গ্যালেন ত্রিশটিরও অধিক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তিনি শুধু উদ্ভিদ থেকে নিষ্কাষিত রস ব্যবহার করতেন। সে সব ওষুধ এখনো 'গ্যালেনি-কেল্‌স্' নামে পরিচিত। চিকিৎসক হিসাবে গ্যালেনের ছিল প্রচুর খ্যাতি, বিরাট পসার এবং রাজদরবারে প্রতিপত্তি। তাই তাঁর প্রতাপও ছিল আকাশচুম্বী। তাঁর প্রভাবের ফল এমনি যে প্রায় হাজার বছর ধরে নতুন কোনো চিন্তার উন্মেষই হল না। গ্যালেনের সবচেয়ে

বড় দোষ তিনি তাঁর মতবাদগুলি প্রমাণ করার জন্য হাতে-কলমে কাজ করেন নি।

মধ্যযুগ ইয়োরোপের অন্ধকারময় যুগ। সাহিত্যে শিল্পে বিজ্ঞানে দর্শনে সর্বত্রই অবক্ষয়ের চিহ্ন। হিপোক্রেটিস, অ্যারিস্টট্ল, গ্যালেন প্রমুখ মণীষীদের সূক্ষ্মদৃষ্টি ও বিচার বিশ্লেষণ করার রীতির পরিবর্তে দেখা দিল অলৌকিকতার পুনরাবির্ভাব, জ্যোতির্বিদ্যার পরিবর্তে জ্যোতিষশাস্ত্র। আবার এই সময়ে সারা ইয়োরোপ প্লেগ-মহামারিতে বিধ্বস্ত হচ্ছিল। ব্ল্যাক ডেথ, (Black Death) এই সময়কার এক ভয়াবহ ঘটনা। এই সময় চিকিৎসাশাস্ত্রের নেতৃত্ব চলে আসে আরবদের হাতে। তারা বহু নতুন ওষুধ আবিষ্কার করেন এবং ইউনানি (unani) চিকিৎসার প্রবর্তন করেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে ঘটে ইয়োরোপের নব জাগরণ, যা রেনেসাঁস নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। অন্ধকারের অচলায়তন থেকে মুক্তি পেয়ে ইয়োরোপ আলোর মধ্যে এসে দাঁড়াল। সাহিত্যে শিল্পে দর্শনে তখন নতুন চিন্তার ছড়াছড়ি। চিকিৎসাবিজ্ঞানও বাদ পড়ল না। অযৌক্তিকতা ও অলৌকিকতা বিসর্জন দিয়ে চিকিৎসকগণ যুক্তি, বিচার ও বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করতে আরম্ভ করলেন। হিপোক্রেটিস ও গ্যালেনের চিন্তাধারা নতুন করে বিচারের সম্মুখীন হল। এই সময়কার এক বিতর্কিতচরিত্র প্যারাসেল্সাস (Paracelsus ১৪৯৩-১৫৫১ খ্রীস্টাব্দ)। তাঁকে বলা হয় চিকিৎসাশাস্ত্রের 'লুথার'। যা কিছু পুরাতন তাই তাঁর কাছে জীর্ণ এবং বর্জনীয়। অতীতযুগের কারো উপর তাঁর কণামাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। সবচেয়ে রাগ গ্যালেনের উপর। এই লোকটি দীর্ঘ এক হাজার বছর ধরে চিকিৎসা-বিজ্ঞানকে প্রভাবিত করে নতুন চিন্তার জন্মের পথে বাধা সৃষ্টি করলেন। এজন্য তিনি গ্যালেনকেই দায়ী করলেন। গ্যালেনের উদ্ভিদ-জাত ওষুধ নিয়েও তিনি তীব্র বিদ্রূপ করতেন এবং নিজে ব্যবহার করতেন ধাতব পদার্থ। গ্যালেনকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেই তিনি নিরস্ত হলেন না, একদিন দলবল নিয়ে গ্যালেন এবং অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থকারদের গ্রন্থসকল আনুষ্ঠানিক-

ভাবে অগ্নিতে নিক্ষেপ করলেন। প্যারাসেল্‌সাস বলতেন, কেবল বই পড়ে ভাল চিকিৎসক হওয়া যায় না। ভাল চিকিৎসক হতে হলে চাই অভিজ্ঞতা, যে অভিজ্ঞতা একমাত্র তাঁর আছে। তিনি বেজেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিনের অধ্যাপক ছিলেন। অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য তিনি প্রচুর দেশভ্রমণ করেছিলেন। কথিত আছে চীনে এবং ভারতেও তিনি পদার্পণ করেছিলেন। যেখানেই গিয়েছেন, সেখানেই করেছেন ঝগড়া। অনেক জীবনীলেখক তাঁকে মাতাল, নাস্তিক, কলহপ্রিয় ইত্যাদি বলে প্রচুর গালমন্দ করেছেন, কিন্তু তাঁর বিদ্রোহ যে চিকিৎসক-সমাজকে নাড়া দিয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

রোগের কারণ সম্বন্ধে কিন্তু এ পর্যন্ত মানুষের কোনো স্পষ্ট ধারণা হয়নি। ইংল্যাণ্ডের থমাস সিডেনহ্যাম (Thomas Sydenham, ১৬২৪-১৬৮৯ খ্রীস্টাব্দ) লক্ষ্য করলেন, প্রাকৃতিক আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রোগের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। হিপোক্রেটিস যে বলেছিলেন, প্রকৃতিই রোগের জন্য দায়ী, একথা সত্য বলে তিনি পুনরায় প্রচার করলেন। প্রকৃতিতত্ত্ব আবার নতুন করে আলোচিত হতে লাগল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বসন্ত রোগের (Small Pox) টিকা আবিষ্কৃত হলে রোগ প্রতিরোধের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। বসন্ত রোগ প্রতিরোধের জন্য নানা ব্যবস্থা চালু ছিল—যেমন বসন্ত রোগীর শরীরের গুটি থেকে তরল পদার্থ, অর্থাৎ বীজ নিয়ে তা অন্যের হাতের একটুখানি চামড়া কেটে ঢুকিয়ে দেওয়া, শুকনো গুটি গুঁড়ো করে নাক দিয়ে টানা। কিন্তু এসবের ফল প্রায়ই হত মারাত্মক। প্রতিরোধের পরিবর্তে দেখা দিত সত্যিকার রোগ। এডওয়ার্ড জিনার (Edward Jenner, ১৭৪৯—১৮২৩ খ্রীস্টাব্দ) নামে এক চিকিৎসক প্র্যাকটিস করতেন গ্লস্টারশায়ারে। সে সময় বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব সারা ইয়োরোপে ব্যাপকভাবে দেখা দিত। গোয়ালাদের মধ্যে একটা ধারণা ছিল যে হাতে গো-বসন্তের গুটি হলে তাদের আর বসন্ত হবে না। এই ধারণার উৎস কোথায়, এই চিন্তা জিনারের ভাবরাজ্য দখল করে আছে। জিনার অনেক চিকিৎসককেই বললেন তাঁর মনের কথা। তাঁরা তো হেসেই উড়িয়ে দিলেন, বললেন—

এসব কাকতালীয় ব্যাপার। একমাত্র জিনারের বন্ধু বিখ্যাত শল্য-চিকিৎসক হাণ্টার উৎসাহ দিয়ে বললেন, আর কত ভাববে বন্ধু, এবার কাজে লাগ। 'Don't think, but try'। জিনার হাতে কলমে পরীক্ষা করতে লেগে গেলেন।

১৭৯৬ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই মে। সারা নেল্‌ম্‌স (Sara Nelmes) নামে এক তরুণী গোয়ালিনীর হাতের গো-বসন্তের গুটি থেকে বীজ নিয়ে জিনার তা ঢুকিয়ে দিলেন জেম্‌স ফিপ্‌স (James Phipps) নামে একটি ছেলের হাতে, একটু চামড়া কেটে। কয়েকদিন পর টিকা উঠল। (গোরুর বাঁটে অনেক সময় গো-বসন্তের গুটি থাকে। দুধ দোয়ার সময় গুটি ফেটে তরল পদার্থ গোয়ালাদের হাতে লাগে এবং সেখানে গুটি হয়।) ১লা জুলাই তারিখে জিনার আর একটি পরীক্ষা করলেন ফিপ্‌সের উপর। এবার আর গো-বসন্ত নয়, আসল বসন্ত রোগীর গুটি থেকে জলীয় পদার্থ নিয়ে তা ঢুকিয়ে দিলেন ছেলেটির চামড়াতে। কিন্তু কী আশ্চর্য ! এবার ছেলেটির গায়ে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। কেন এমন হল ? জিনার এ থেকে প্রমাণ করলেন, প্রথম টিকা দেবার পর শরীরে বসন্ত রোগের জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-ক্ষমতা এতই বেড়ে গেছে যে দ্বিতীয় টিকা শরীরে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে নি।

উনিশ শতকের শেষার্ধে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে চাঞ্চল্যকর সব তথ্য আবিষ্কৃত হতে লাগল। ফ্রান্সের লুই পাস্তুর (Louis Pasteur, ১৮২২—১৮৯৫) এবং জার্মানীর রবার্ট কক (Robert Koch, ১৮৪৩—১৯১০) রোগের প্রচলিত ধারণা সম্পূর্ণ পাল্টে দিলেন। পাস্তুরের অনেক আগে ফ্রেকাস্টরিয়াস (Fracastorius, ১৪৮৪—১৫৫৩) রোগের সংক্রমণ-ক্ষমতা সম্বন্ধে ধারণা করেছিলেন। হল্যাণ্ডের বস্ত্রব্যবসায়ী লিউয়েনহুক (Leeuwenhoek, ১৬৩২—১৭২৩) অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে জীবাণুর আকার বর্ণনা করেছিলেন। পাস্তুরের সময়ে জীবাণুর অস্তিত্ব জানা ছিল বটে, তবে এর প্রকৃতি সম্বন্ধে সঠিক ধারণা ছিল না। একদল ভাবতেন, জীবাণু মরা, পচা শরীর থেকে আপনাআপনি জন্মে (spontaneous generation)। আর এক দল ভাবতেন, জীবাণুর জন্ম জীবাণু থেকে।

পাস্তুর তখন তরুণ রসায়নবিদ্। অ্যালকহলিক ফার্মেনটেশন (alcoholic fermentation) নিয়ে কাজ করার সময় তাঁর ধারণা হল, ফার্মেনটেশন-ক্রিয়া সম্পন্ন হয় জীবাণু দ্বারা। মানুষের কোষেও জীবাণু নিশ্চয়ই রাসায়নিক পরিবর্তন আনতে পারে। পাস্তুর দেখালেন, জীবাণুর জন্ম জীবাণু থেকে এবং জীবাণু মানুষের দেহে রোগ সৃষ্টি করে। তিনি অ্যানথ্রাক্স (Anthrax) এবং জলাতঙ্ক (Rabies) রোগের প্রতিষেধক টিকাও প্রস্তুত করেন।

রবার্ট কক জার্মানির এক চিকিৎসক। চিকিৎসা ছেড়ে দিয়ে তিনি জীবাণুর উপর গবেষণা শুরু করলেন। আবিষ্কার করলেন যক্ষ্মার ও কলেরার জীবাণু। এই সব জীবাণুর সংখ্যা যাতে বাড়ান যায় এবং যাতে অনেকদিন জীবাণুগুলিকে বাঁচিয়ে রাখা যায়, তার জন্য তৈরি করলেন নানারকম মিডিয়ম বা মাধ্যম (culture media)। পাস্তুর ও কক শুধু যে নিজেরাই মহান বৈজ্ঞানিক ছিলেন, তা নয়, তাঁদের ঘিরে গড়ে উঠেছিল নৈষ্ঠিক গবেষক গোষ্ঠী।

যদিও জীবাণুতত্ত্ব অতি দ্রুত প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছিল, তবু এর বিরোধিতাও কম হয় নি। বিরুদ্ধবাদীদের অগ্রগণ্য ছিলেন মিউনিকের স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের অধ্যাপক পেটেনকফার (Max Von Pettenkofer ১৮১৮-১৯০১)। কক যখন কলেরার জীবাণু আবিষ্কার করলেন, তখন পেটেনকফার এর ঘোর বিরোধিতা করেন। তাঁর মতে, কলেরার তথাকথিত জীবাণু ভুয়ো জিনিস, কলেরা হওয়ার কারণ হচ্ছে, কোনো স্থানের মাটির মধ্যে এমন একটা কিছু আছে, যা জলের সঙ্গে মিশে কলেরা রোগ সৃষ্টি করে। পেটেনকফার ককের বিরোধিতা করেই নিরস্ত হলেন না, তাঁর দুই শিষ্যসহ তিনি কলেরার জীবাণু খেয়ে ফেললেন। এঁদের কিন্তু কলেরা হল না। অতএব পেটেনকফার ঘোষণা করলেন, কলেরার জীবাণু কলেরার জন্য দায়ী নয়। বিজ্ঞানী যদি অন্ধবিশ্বাসী হন, তবে তার ফল বড় সাংঘাতিক হয়ে ওঠে। পেটেনকফার তাঁর তত্ত্ব নিয়ে বড় বড় প্রবন্ধ লিখলেন। কিন্তু তাঁর শিষ্যরা তাঁকে অচিরেই ত্যাগ করলেন। জীবাণুতত্ত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হল অতি শীঘ্র। ১৯০১ সালে বৃদ্ধ

নিঃসঙ্গ বিভ্রান্ত পেটেনকফার আত্মহত্যা করলেন। অথচ আজ একথা বলা যায়, পেটেনকফার সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ছিলেন না। জীবাণু শরীরে অনুপ্রবেশ করলেই রোগ হয় না। শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে কি নেই তার উপর রোগ হওয়া না-হওয়া নির্ভর করে। আবার পারিপার্শ্বিক অবস্থা যদি জীবাণুর প্রতিকূল হয়, তা হলেও রোগ হয় না।

এতদিনে রোগের প্রকৃত কারণ জানা সম্ভব হল। জীবাণুতত্ত্ব পরবর্তী বৈজ্ঞানিকদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। জীবাণুতত্ত্বকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠল মাইক্রোবায়োলজি (Microbiology), ইমিউনোলজি (Immunology) প্রভৃতি বিষয়। প্রতিটি রোগের জন্য জীবাণুর সন্ধান চলল। ম্যানসন (Patrick Manson, ১৮৪৪—১৯২২) যখন প্রমাণ করলেন মশা ফাইলেরিয়া (Filariasis) রোগ ছড়ায়, তখন লোকের দৃষ্টি পড়ল তার প্রতিবেশী কীটপতঙ্গের প্রতি। ক্রমে ধরা গেল বহু রোগ, যেমন ম্যালেরিয়া, টাইফাস ফিবর (Typhus fever), প্লেগ, কালাজ্বর প্রভৃতি রোগ কীভাবে ছড়ায়।

আবার অচিরেই দেখা গেল জীবাণুই সব রোগের জন্য দায়ী নয়। অধিকাংশ ক্যানসার, অধিকাংশ হৃদরোগ, মানসিক ব্যাধি, পুষ্টিজনিত রোগ প্রভৃতির জন্য কোনো জীবাণুকে দায়ী করা যায় না। মেণ্ডেলের (Gregor Johann Mendel ১৮২২-৮৪) জিনেটিকতত্ত্ব (genetic) চিকিৎসাবিজ্ঞানে নূতন চিন্তার জন্ম দিয়েছে। এমন কয়েকটি রোগ আছে, যেগুলো উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত। জিনেটিকতত্ত্ব দিয়ে এই রোগগুলির কারণ ব্যাখ্যা করা যায়।

রোগ নিরূপণের জন্যেও ক্রমে বহু পদ্ধতির সন্ধান পাওয়া গেল। প্যাথলজি (Pathology), বায়োকেমিস্ট্রি (Biochemistry) প্রভৃতি রোগ নিরূপণের কাজে লাগে। রঞ্জন (W. C. Rontgen ১৮৪৫—১৯২৩) ১৮৯৫ সালে এক্স্-রে (X-ray) আবিষ্কার করে রোগ নিরূপণে এবং কয়েকটি রোগের চিকিৎসায় যুগান্তর সৃষ্টি করলেন।

রোগের কারণ যত জানা যেতে লাগল, ততই চিকিৎসার জন্য উপযুক্ত ওষুধের সন্ধান চলল। আরলিশ (Paul Ehrlich ১৮৫৪-১৯১৫) প্রথম

দেখালেন, আর্সেনিক ব্যবহারে কয়েকটি রোগের জীবাণু মরে যায়। ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং (Alexander Fleming, ১৮৮১-১৯৫৫) আবিষ্কার করলেন পেনিসিলিন (Penicillin), জার্মানির ডোমাক (Gerhard Domagk, ১৮৯৫—১৯৬৪) ১৯৩৫ সালে সালফোনেমাইড এর (sulfonamide) উপকারিতা প্রমাণ করলেন। ক্রমে আবিষ্কৃত হল আরো অনেক বীজবারক ও বীজঘ্ন ওষুধ। কিন্তু জীবাণু যেদিন আবিষ্কৃত হয়েছিল, সেদিন রোগ জয় করার যে আশা মানুষের মনে জেগেছিল, তা আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেছে। দেখা গেল, প্রথম প্রথম জীবাণুগুলি ওষুধের কাছে পরাজয় স্বীকার করলেও এখন সেগুলি আর হার স্বীকার করছে না। আবার যে সব রোগ জীবাণুঘটিত নয়, সেগুলির জন্য দরকার অন্য ওষুধের। সমস্যা যত জটিল হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের চেষ্টাও মানুষের মধ্যে ততই বেড়ে যাচ্ছে।

ভারতে আয়ুর্বেদের অবনতি

আগেই বলা হয়েছে ভারতবর্ষে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রচুর উন্নতি হয়েছিল খ্রীস্টপূর্ব চার-পাঁচ হাজার বছর আগে। চরক এবং সুশ্রুতের কাল সম্বন্ধে নানা বিতর্ক আছে। অনেকের ধারণা চরক ছিলেন খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে এবং সুশ্রুত ছিলেন খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় এবং পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে। আবার কারো কারো মতে চরক এবং সুশ্রুত খ্রীস্টপূর্ব দশম এবং ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে ছিলেন। সে যাই হোক, চরক-সুশ্রুতের সময়ই আয়ুর্বেদের স্বর্ণ-যুগ।

বঙ্গদেশও আয়ুর্বেদের যথেষ্ট চর্চা ছিল। একাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত রোগনিদানবিদ্ চক্রপাণি দত্ত বাঙালী ছিলেন। চক্রপাণিই প্রথম বৈদ্য যিনি উদ্ভিদ এবং প্রাণী থেকে নিষ্কাশিত রসের সঙ্গে খনিজ পদার্থ মিশিয়ে ওষুধ প্রস্তুত করেছিলেন। চক্রপাণির ভ্রাতা ভানুও রোগনিদান শাস্ত্রে পণ্ডিত এবং চিকিৎসক হিসাবে বিখ্যাত ছিলেন।

বল্লাল সেন (দ্বাদশ শতাব্দী) আয়ুর্বেদের পরম অনুরাগী ছিলেন। তাঁর আনুকূল্যে বৈদ্যগণ ওষুধের গুণাগুণ পরীক্ষা করার সুযোগ পেতেন। এই পরীক্ষা হত বন্দীদের উপর। সে সময় বন্দী অপরাধীদের শাস্তি দেওয়া হত কালিমূর্তির সামনে বলি দিয়ে, শূলে চড়িয়ে, হাত-পা বেঁধে আগুনে পুড়িয়ে এবং জীবন্ত কবর দিয়ে। কালিমূর্তির সামনে বলি দেওয়া হত উচ্চ বংশজাত অপরাধীদের। যেসব অপরাধীদের শূলে চড়াবার এবং আগুনে পুড়িয়ে মারার শাস্তি হত, সে সব অপরাধীদের মধ্য থেকে স্বাস্থ্যবানদের বাছাই করা হত ওষুধের ক্রিয়া পরীক্ষার জন্য। ওষুধে সাপের বিষে কাজ হয় কিনা পরীক্ষা করার জন্য সেই সব বন্দীদের বেঁধে বিষাক্ত সাপ দ্বারা দংশন করানো হত। তারপর ওষুধ প্রয়োগ করা হত। বর্তমান সমাজব্যবস্থায় এই সব পরীক্ষা অমানুষিক মনে হতে পারে, কিন্তু যেসব বন্দী অপরাধী এই পরীক্ষার পরও বেঁচে থাকত, তারা পেত মুক্তি।

নৃপতির আনুকূল্য ব্যতীত কোনোকিছুরই উন্নতি সম্ভব নয়। ভারতবর্ষের চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ইতিহাসে তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। মুসলমান আগমনের পর আয়ুর্বেদের অধোগতি শুরু হয়। মুসলমান বিজেতাগণ সঙ্গে নিয়ে এলেন আরবের চিকিৎসা-বিজ্ঞান। বৈদ্যরা চিকিৎসাকে ব্যবসা হিসাবেই চালিয়ে গেলেন, বিজ্ঞান হিসাবে নয়। আয়ুর্বেদ শুধু বেঁচে রইল তার অতীত সমৃদ্ধি নিয়ে। নতুন চিন্তা, নতুন আবিষ্কার আয়ুর্বেদে আর দেখা গেল না। বিজ্ঞান কখনো স্থিতিশীল নয়। সহস্র বৎসর ধরে যে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে নতুন কোনো চিন্তার জন্ম হয় নি, সে-বিজ্ঞানের পুনরুজ্জীবন সহজসাধ্য নয়। স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষে আয়ুর্বেদের উন্নতির জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে। অনেক কলেজ ও গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সেকালে বিদেশীরা যখন দলবদ্ধভাবে ভারতে আসত, সে রাজ্যজয়ের লোভেই হোক বা বাণিজ্য উপলক্ষেই হোক, সঙ্গে নিয়ে আসত নিজেদের দেশের চিকিৎসক। পর্তুগিজরা যখন ভারতে আসে, সঙ্গে নিয়ে আসে পর্তুগিজ চিকিৎসক। ১৪৯৮ খ্রীস্টাব্দে ভাস্কো-ডা-গামার কালিকটে অবতরণের পর থেকে বহু পর্তুগিজ একে একে ভারতে এসে হাজির হয়। তাদের মধ্যে চিকিৎসকও ছিলেন। পর্তুগিজরা ক্রমে গোয়া অধিকার করে। গোয়াতে তারা ইয়োরোপীয় চিকিৎসার প্রথম হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। এবং ভারতে ইয়োরোপীয় চিকিৎসার প্রথম মেডিকেল স্কুল গোয়াতেই স্থাপিত হয় ১৬৮৭ খ্রীস্টাব্দে।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ইংরেজরা যখন ভারতে আসত, তখন প্রতিটি জাহাজে থাকত চিকিৎসক। ১৬০০ খ্রীস্টাব্দে যে চারখানি জাহাজে প্রথম অভিযান শুরু হয়, সেসব জাহাজের প্রতিটিতে ছিলেন চিকিৎসক। এঁরাই ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসের জনক। ১৬১২-তে জন উডাল-কে সার্জন জেনারেল পদে নিযুক্ত করা হয় এবং সুশৃঙ্খল চিকিৎসা ব্যবস্থার গোড়াপত্তন হয়।

কালক্রমে গোরা সৈন্য ও নাবিকদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার দরুন হাসপাতালের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। কলকাতায় কোম্পানি প্রথম হাসপাতাল স্থাপন করে ১৭০৭-এ। এই হাসপাতাল ছিল গার্স্টিন প্লেস অঞ্চলে। এখানে কেবল গোরা সৈন্য ও নাবিকদের চিকিৎসা করা হত। হাসপাতালের একদিকে ছিল এক বিরাট দীঘি, অন্যদিকে ছিল গোরস্থান। হাসপাতালের সংলগ্ন গোরস্থান রাখার কারণ খুব স্পষ্ট। মৃত্যুহার ছিল অত্যন্ত বেশি। শহরের মধ্যে সৈন্যদের স্থান দেওয়ায় অনেকের আপত্তি ছিল, সেজন্য পরে হাসপাতালের চারদিকে প্রাচীর তুলে দেওয়া হয়। এর পাশেই ১৭১৬ খ্রীস্টাব্দে সেন্ট জন চার্চ স্থাপিত হয়। এখানকার গোরস্থানে রয়েছে জব চার্ণকের সমাধি।

ক্যাপ্টেন আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটন নামে এক নাবিক ১৭০৮-এ

কলকাতায় আসেন। তাঁর অভিজ্ঞতা 'এ নিউ একাউণ্ট অব দি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি' নামক গ্রন্থে তিনি বর্ণনা করেছেন। হাসপাতাল সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন : 'কলকাতায় কোম্পানির একটি ভাল হাসপাতাল রয়েছে। সেখানে অনেককেই যেতে হয় শরীর শোধন করাতে, কিন্তু সেখানকার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করার জন্য অতি অল্পজনই ফিরে আসে।'

হাসপাতালে কুড়ি থেকে ত্রিশজন রোগীব থাকার বন্দোবস্ত ছিল। খাট, বিছানা, ওষুধ প্রভৃতি হাসপাতাল থেকে দেওয়া হত। খাওয়ার খরচের জন্য সাধারণ সৈনিককে দিতে হত দৈনিক চার আনা, কর্পোরালকে ছ' আনা এবং সার্জেণ্টকে আট আনা। অসুস্থ হলে অবিবাহিত সৈন্যদের হাসপাতালে ভর্তি হওয়া ছিল বাধ্যতামূলক। একজন দরোয়ান ছিল, তার কাজ ছিল যাতে কোনো রোগী বাইরে থেকে সুরা ভিতরে নিয়ে আসতে না পারে, সেদিকে দৃষ্টি রাখা।

হাসপাতাল যখন খোলা হয়, তখন সেটি ছিল এক তলার একটি বাড়ি। সেখানে চিকিৎসকদের বাসস্থানের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। পরে উপরে কয়েকটি ঘর তৈরি করা হয় এবং সেখানে একজন চিকিৎসকের থাকার বন্দোবস্ত হয়। সিরাজুদ্দৌলা ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে যখন কলকাতা অবরোধ করেন, তখন নবাবের সৈন্যরা এই হাসপাতালটি ধ্বংস করে দেয়। অবরোধ তুলে নেওয়ার পর হাসপাতালের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে দেখা দিল। কোম্পানির সৈন্যসংখ্যা আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে, তাদের জন্য দরকার বড় একটি হাসপাতালের। কর্তৃপক্ষ নগর-স্থপতিকে আদেশ দিলেন হাসপাতালের উপযোগী একটি স্থান নিরূপণ এবং হাসপাতালের নক্সা প্রস্তুত করতে। ইতিমধ্যে আশু প্রয়োজন মেটাবার জন্য ফোর্ট উইলিয়মে (পুরনো) কাঠ ও খড় দিয়ে একটি অস্থায়ী বাড়ি তৈরি করা হল এবং হাসপাতাল খোলা হল ১৭৫৭-তে। এই হাসপাতালের কাজ চলে তের-চোদ্দ বছর।

কোম্পানির আদেশমতো নগর-স্থপতি উপযুক্ত জায়গার অনুসন্ধান করতে লাগলেন। সে সময়কার চৌরঙ্গী ছিল নির্জন, সেই চৌরঙ্গীতে সুইডিস্ ধর্মযাজক জন জাকারিয়া কিয়ারনেণ্ডারের (John Zachariah

Kiernander) একটি বাগানবাড়ি ছিল বিরাট জমির উপর। সরকার প্রায় এক লক্ষ টাকা দিয়ে এই বাগান বাড়িটি ক্রয় করলেন ১৭৬৮-তে। কিয়ারনেণ্ডারের শখ- ছিল বাড়ি তৈরি করার। তিনি বাগানবাড়ি সরকারের কাছে বিক্রয় করেই ক্ষান্ত হলেন না, হাসপাতালের জন্য আরো দুটি ব্লক তৈরির যে পরিকল্পনা সরকারের ছিল, তা কার্যে রূপায়িত করার জন্য ঠিকাদারি নিলেন। ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দে হাসপাতালের পশ্চিম ও পূর্বদিকে দুটি ব্লক তৈরি শেষ হল। এই হাসপাতাল শুধু ইয়োরোপীয়দের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। দেশীয় লোকদের সেখানে প্রবেশাধিকার ছিল না। এই হাসপাতালই প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতাল অর্থাৎ বর্তমান শেঠ সুখলাল কারনানি মেমোরিয়েল হাসপাতাল। পরবর্তীকালে এখানেই কাজ করেছিলেন রোনাল্ড রস এবং আবিষ্কার করেছিলেন, মশা ম্যালেরিয়া রোগ ছড়ায়।

তখন পর্যন্ত দেশীয় লোকদের চিকিৎসার জন্য কোনো হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয় নি। দেশীয় লোকদের জন্য হাসপাতালের পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে একটি কমিটি গঠিত হয় ১৭৯২ খ্রীস্টাব্দে। এও স্থির হয় যে হাসপাতালের তত্ত্বাবধান করার দায়িত্ব থাকবে সমসংখ্যক ইয়োরোপীয় ও ভারতীয়ের উপর। সেণ্ট জন চার্চের পুরোহিত জন ওয়েন (Rev. John Owen) এই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ছিলেন খুব উৎসাহী। হাসপাতালের স্থান নিরূপণ, চাঁদা আদায় প্রভৃতি ব্যাপারে তিনি ছিলেন অগ্রণী। কলকাতার ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের কাছ থেকে ৫৪,০০০ টাকা চাঁদা আদায় হয়। লর্ড কর্ণওয়ালিস দেন ৩০০০ টাকা, কাউন্সিলের প্রত্যেক সদস্য দেন ৪০০০ টাকা। হাসপাতাল স্থাপিত হল চিৎপুর রোড ও কলুটোলার মোড়ে ফৌজদারি হাউসে। ১৭৯৪-এর ১লা সেপ্টেম্বর এই হাসপাতাল উদ্বোধন করেন বাঙলার গবর্নর স্যার জন শোর। এই হাসপাতাল 'নেটিব হাসপাতাল' নামে পরিচিত হয়। পরিচালকগণ ১৭৯৮ খ্রীস্টাব্দে ধর্মতলার মুক্ত আবহাওয়ায় এই হাসপাতাল স্থানান্তরিত করেন। সে সময়ে ধর্মতলা ছিল জনবিরল স্থান। সারা ধর্মতলায় তিন-চারটির বেশি বাড়ি

ছিল না। এই হাসপাতালের তুটি শাখা ডিস্পেনসারি ছিল—একটি গরানহাটায় এবং অন্যটি কলিঙ্গাতে (পার্ক স্ট্রীট)। দীর্ঘ পঁচাত্তর বছর এই স্থানে 'নেটিব হাসপাতাল' অবস্থিত ছিল। কিন্তু ধর্মতলায় ক্রমেই জনবসতি বাড়তে থাকে, ফলে ১৮৭১-এ প্রস্তাব নেওয়া হয় যে হুগলি নদীর তীরে কোনো উপযুক্ত জায়গায় হাসপাতালটি স্থানান্তরিত করা হবে। স্ট্রাণ্ড রোডের উপর পুরনো টাঁকশালের কাছে একটি স্থান ঠিক করা হয়। ধর্মতলা হাসপাতালের বৃহৎ অংশ এবং গরানহাটা ডিস্পেনসারি বিক্রি করা হল ৯৭০০০ টাকায়। চাঁদা তোলা হল ৭৮,৯৯০ টাকা, মেয়ো মেমোরিয়াল ফাণ্ড দিলেন ৫০,০০০ টাকা। ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারি ভাইসরয় লর্ড নর্থব্রুক ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং ১৮৭৪-এর ৫ই সেপ্টেম্বর হাসপাতালের উদ্বোধন হয়। স্ট্রাণ্ড রোডে স্থানান্তরিত হবার পর নেটিব হাসপাতালের নতুন নামকরণ হয় 'মেয়ো হাসপাতাল'।

কলকাতায় প্রথম প্রসূতিসদন 'Calcutta Lying-in Hospital' স্থাপিত হয় ১৮১৪-র ১২ই জুন পার্ক স্ট্রীট অঞ্চলে। কাউণ্ট লাউডন এবং কাউণ্ট ময়রার পত্নীদ্বয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় ও চেষ্টায় এই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়।

কলকাতায় প্রথম মেডিকেল স্কুল স্থাপিত হয় ১৮২৪-এর অক্টোবর মাসে। এই স্কুলের সংস্কৃত শাখার ক্লাশ হত সংস্কৃত কলেজে। সংস্কৃত কলেজের সঙ্গে যুক্ত কোনো হাসপাতাল না থাকায় ছাত্রদের হাতে-কলমে কাজ করার সুযোগ ছিল না, সেজন্য ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষায় উৎসাহী বাবু রামকমল সেনের সহায়তায় একটি ছোট হাসপাতাল স্থাপন করা হয়। এই হাসপাতাল ছিল ত্রিশটি শয্যাবিশিষ্ট। নবকৃষ্ণ গুপ্ত নামে উপর ক্লাসের একজন বিশিষ্ট ছাত্রকে অ্যাপথিকারি অর্থাৎ ওষুধ বিক্রেতা নিযুক্ত করা হয়। ছাত্রদের মধ্য থেকে একজনকে দিনে এবং একজনকে রাত্রে ওষুধ তৈরির কাজে সাহায্যের জন্য 'ডিউটি' দিতে হত। এতে ছাত্ররা ওষুধ তৈরির প্রণালী শিখতে পারত।

১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দে মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হলে ছাত্রদের শিক্ষার জন্য হাসপাতালের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। ১৮৩৮-এর ১লা এপ্রিল কুড়িটি শয্যাবিশিষ্ট একটি হাসপাতাল খোলা হয়। এখানে একটি বহির্বিভাগের ব্যবস্থাও করা হয়। আজকের মেডিকেল কলেজের সুবৃহৎ হাসপাতালের শুরু এই কুড়ি শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল দিয়ে। ১৮৪০-এ তৈরি হয় একশো শয্যার একটি প্রসূতি সদন। কলেজ স্ট্রীট দিয়ে মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করলে ডানদিকে যে বিরাট প্রাসাদোপম অট্টালিকা চোখে পড়ে, এটির নির্মাণ কার্য শেষ হয় ১৮৫২-তে। ঐ হাসপাতালের জন্য মতিলাল শীল বিস্তৃত ভূমি দান করেন। ১৮৪৮-এর ৩০শে সেপ্টেম্বর এই হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন ভারতের গবর্নর জেনারেল লর্ড ডালহৌসি। এই হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা স্থির হয় সাড়ে তিনশো। এত বড় হাসপাতাল সে সময়ে খুব কমই ছিল। দেশী ও বিদেশী পত্রপত্রিকা এই হাসপাতালের উদ্বোধন অনুষ্ঠানের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করে। সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদকীয় মন্তব্য থেকে হাসপাতালের সংবাদ যেমন জানা যায় তেমনি কিছু কৌতুকও বোধ হয়।

'পটল ডাঙ্গায় ফিবর হাস্পিটাল নামক যে এক রম্য হর্ম্য নির্মিত হইয়াছে তদ্দৃষ্টে বোধ করি সকলেরই নয়ন সম্পূর্ণ সন্তোষে পরিপূর্ণ হইয়াছে, ঐ বাটীর নিমিত্ত যে মুদ্রা সংগৃহীত হইয়াছিল তৎসমুদয় ব্যয় হইয়া গিয়াছে, এ কারণ আর আর কর্মের জন্য অতিরেক অর্থের আবশ্যক হইতেছে এবং কার্যারারম্ভ কল্পেও বিলম্ব হইতেছে। উত্তর ভাগে বাবু মতিলাল শীলের কলেজ ও দক্ষিণ ভাগে হীরাকাটার গলি অবধি ইহার পরিসর বৃদ্ধি হইবার প্রস্তাব হইতেছে, কিন্তু টাকা ভিন্ন সম্পন্ন হইতে পারে না, এই সূত্রে এ পর্যন্ত যে ব্যয় হইয়াছে তাহার সংখ্যা ২॥০ (আড়াই) লক্ষ টাকার উপর হইবেক। ইহার পর সমুদয় কল্পনা সম্পন্ন করিতে যে আরো কত ব্যয় হইবে তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করুন। অধুনা এতন্নগরে এতদ্রূপ মনোহর অট্টালিকা আর দৃষ্ট হয় না, যে ব্যক্তি সর্বাগ্রে ঐ গৃহে বাস করিয়া প্রাণত্যাগ করিবেক বোধ করি সে ব্যক্তির জন্ম

সফল হইয়া কৈবল্য লাভ হইবেক। উক্ত বাটীর তেতালার ছাদের উপর চারিদিগে চারিটা পুষ্করিণী হইয়াছে, তাহা জল পরিপূর্ণ করণার্থ নূতন জল প্রণালী প্রস্তুত হইতেছে, গোলদীঘির জল সেই প্রণালীতে পড়িয়া কলের দ্বারা উপরে উঠিয়া ছাদের পুষ্করিণীকে পরিপূর্ণ করিবেক। এই সময়ে আমরা অনুরোধ করি, সকলে একবার উক্ত অট্টালিকা এবং তৎসংক্রান্ত কার্য সমুদয় দেখিয়া আসুন।' [বিনয় ঘোষ—সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র ১ম খণ্ড, পৃ ৪২৫]

কার ভাগ্যে কৈবল্যপ্রাপ্তি ঘটেছিল, তা আজ আর জানার উপায় নেই।

হাসপাতাল অর্থে আমরা বুঝি যেখানে রোগীর চিকিৎসা হয়। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে দমদমে এমন এক হাসপাতাল তৈরি হল, যেখানে কোনো রোগীর চিকিৎসা হত না। এর উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই হাসপাতালে দেওয়া হত বসন্তের টিকা।

এখানে ভারতে প্রচলিত বসন্ত রোগের প্রতিষেধক টিকার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। অতি প্রাচীনকাল থেকে ভারতে টিকা প্রচলিত ছিল। সে টিকার পদ্ধতি অবশ্য ভিন্ন ছিল। বসন্তরোগে আক্রান্ত রোগীর শরীরের গুটি থেকে বীজ নিয়ে সুস্থ লোকের হাতের চামড়ায় সুচ দিয়ে কয়েকটি ফুটো করে সেখানে বীজ লাগিয়ে দেওয়া হত। এইভাবে টিকা দেওয়ার পদ্ধতিকে বলা হয় ভ্যারিওলেশন, কারণ টিকা দেওয়ায় বসন্ত রোগের জীবাণু ভ্যারিওলা-ভাইরাস ব্যবহৃত হত। বর্তমান যুগের টিকার মতই সে টিকার প্রতিষেধক ক্ষমতা ছিল। কিন্তু কখনো কখনো ফল হত মারাত্মক। টিকার পরিবর্তে দেখা দিত সত্যিকার বসন্ত রোগ। দ্বিতীয় অসুবিধা ছিল টিকা থেকে রোগ সংক্রামিত হত সুস্থ লোকের শরীরে। টিকা দেওয়া সে সময়ে এক বিরাট আনুষ্ঠানিক ব্যাপার ছিল। টিকাদাররা আসত ফেব্রুয়ারি মার্চে। টিকা দেওয়ার একমাস আগে থেকে দুধ, মাছ ও ঘি খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। যেসব শিশু মাতৃস্তন্য পান করে, তাদের টিকা দেওয়া হত না।

জিনার ১৭৯৯-এ ভারতের জন্য গোবসন্তের বীজ পাঠাবার চেষ্টা করেন 'কুইন' জাহাজে, কিন্তু সে জাহাজ জলমগ্ন হওয়ায় বীজ এদেশে এসে পৌঁছতে পারে নি। জিনার ইতিমধ্যে বুঝতে পেরেছেন, বেশিদিন তরল অবস্থায় সঞ্চিত থাকলে গোবসন্তের বীজের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়। সেজন্য তিনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃপক্ষের কাছে প্রস্তাব দেন যে যদি এমন কুড়িজন ব্যক্তি পাওয়া যায়, যাদের কখনো বসন্ত হয় নি তবে এদের পর্যায়ক্রমে টিকা দিয়ে কার্যকরী বীজ পাঠানো সম্ভব হতে পারে। কর্তৃপক্ষ অবশ্য জিনারের এই প্রস্তাবে সম্মত হন নি।

অবশেষে লণ্ডনের সেণ্ট জর্জেস হাসপাতালের ডাক্তার পিয়ারসন ভারতের জন্য কিছু বীজ পাঠান ভিয়েনাতে। ভিয়েনা থেকে এই বীজ আসে বাগদাদে। এখানে একটি ছেলেকে ঐ বীজে টিকা দেওয়া হয়। টিকা উঠলে ছেলেটিকে পাঠান হয় বসোরাতে। সেখানে ঐ ছেলেটির টিকার গুটি থেকে বীজ নিয়ে কয়েকজনকে টিকা দেওয়া হয়। এদের টিকা উঠলে পর গুটি থেকে প্রচুর পরিমাণে বীজ সংগ্রহ করা হয়। সেই বীজ ভারতে পাঠানো হয় 'রিকভারি' জাহাজে, ১৮০২ খ্রীস্টাব্দে। বোম্বাই বন্দরে বীজ এসে পৌঁছানমাত্র টিকা দেওয়া শুরু হল। কিন্তু প্রথম দিকে কারো হাতেই টিকা উঠল না। অবশেষে ১৮০২-এর ১৪ই জুন ডাঃ স্কট নামে এক চিকিৎসক সফল হলেন। তিন বৎসর বয়স্কা আন্না ডস্টহলের(Anna Dusthall) হাতে টিকা উঠল। চিকিৎসকগণ এই সাফল্যে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। আন্নার টিকার গুটি থেকে যে বীজ সংগ্রহ করা হল, সেই বীজই ভারতে প্রচলিত গো-বসন্ত বীজের আদি। এই বীজ দিয়ে বোম্বাই শহরের বহু লোককে টিকা দেওয়া হয়। তাদের গুটি থেকে সংগৃহীত হল প্রচুর বীজ। খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বীজের জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে তাগিদ আসতে লাগল। পুনা, সুরাট, হায়দরাবাদ, মাদ্রাজ এবং অন্যান্য স্থানে বীজ পাঠানো হল। বঙ্গদেশেও পাঠাবার চেষ্টা হয়, কিন্তু সে প্রয়াস ব্যর্থ হয়।

বঙ্গদেশে টিকার বীজ আসে মাদ্রাজ থেকে। মাদ্রাজের ফিজিশিয়ন জেনারেল ডাঃ এণ্ডারসন বীজ পাঠাতে সমর্থ হলেন। ১৮০২

সালের ১০ই অক্টোবর ডাঃ এণ্ডারসন জন ক্রেসওয়েল নামে একটি তের বৎসর বয়স্ক বালককে টিকা দেন। টিকা দেওয়ার অব্যবহিত পরেই এণ্ডারসন বালকটিকে সঙ্গে নিয়ে 'হাণ্টার' জাহাজে রওনা দেন কলকাতা অভিমুখে। জাহাজে থাকার সময় এর টিকা থেকে বীজ নিয়ে একটি মহিলাকে টিকা দেওয়া হয়। আবার ঐ মহিলার গুটি থেকে বীজ নিয়ে পর্যায়ক্রমে দুটি বালককে টিকা দেওয়া হয়। ১৭ই নভেম্বর জাহাজ এসে পৌঁছল কলকাতায়। বালক চার্লস নর্টনের হাতে তখন টিকা উঠেছে। নর্টনের গুটি থেকে বীজ নিয়ে কয়েকজন ইয়োরোপীয় ছেলেমেয়েকে টিকা দেওয়া হয় অনতিবিলম্বে। এইভাবে শুরু হল বঙ্গদেশে গো-বসন্তের বীজ দিয়ে টিকা দেওয়া। কলকাতার ইংরেজ অধিবাসীরা জিনারের প্রতি কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ চার হাজার পাউণ্ড উপহার পাঠান।

১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দে দমদমে হাসপাতাল স্থাপিত হবার পর ভ্যারিও-লেশন পদ্ধতিতে টিকা দেওয়া হত। গো-বসন্তের বীজ আসার পর থেকে অর্থাৎ ১৮০২ থেকে নতুন পদ্ধতি অর্থাৎ 'ভ্যাক্সিনেশন' (Vaccination) চালু হয়। ধর্মতলার নেটিব হাসপাতালেও প্রাত মঙ্গলবার ও শুক্রবার সকালে বিনামূল্যে টিকা দেবার ব্যবস্থা হয়। টিকার গুরুত্ব এতই বৃদ্ধি পেল যে একাজে তত্ত্বাবধানের জন্য ডাঃ রাসেলকে টিকার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত করা হয়।

গো-বসন্তের বীজ দিয়ে টিকা দেওয়া কিন্তু দেশীয় লোকেরা বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করে নি। দেশীয় লোকদের মধ্যে এই টিকার প্রচলন করতে প্রথম দিকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল, সরকারকে সম্মুখীন হতে হয়েছিল সমালোচনার। লোকের মনে ছিল সংশয় এবং দ্বিধা। গোরুর শরীর থেকে বীজ নিয়ে মানুষের শরীরে দেওয়া শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলে অনেকে প্রচার করতে লাগল। তার উপর পুরনো টিকাদারেরা নতুন টিকার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাতে লাগল। এত সব অসুবিধা সত্ত্বেও ১৮০৩-এ ১১,১৬৬ জন লোককে টিকা দেওয়া হয়েছিল। ভারতবর্ষে এবং বঙ্গদেশে রোগ প্রতিরোধের নবযুগের সূচনা হল।

শবব্যবচ্ছেদ ও মধুসূদন গুপ্ত

ইংরেজ আমলের প্রথম দিকে ইংরেজ চিকিৎসকরা কিছু দেশীয় লোককে হাসপাতালে শিক্ষানবিশ রেখে ইয়োরোপীয় চিকিৎসাবিধি সম্বন্ধে মোটামুটি শিক্ষা দিয়ে ড্রেসার ও কম্পাউণ্ডারের কাজের যোগ্য করে নিতেন। এদের বলা হত 'নেটিব ডাক্তার'। সুনির্দিষ্ট কোনো পাঠক্রম না থাকায় এবং শিক্ষার কোনো মান না থাকায় চিকিৎসাবিষয়ে এই সব নেটিব ডাক্তারের জ্ঞান ছিল সামান্য। অথচ এদের প্রয়োজনীয়তা উত্তরোত্তর বেড়ে যেতে লাগল। পাঠক্রম অনুযায়ী রীতিবদ্ধ চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা দেবার আবশ্যকতাও তখন অনেকেই অনুভব করলেন।

১৮২৪ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে কলকাতায় স্থাপিত হল প্রথম চিকিৎসা-বিদ্যালয়। সার্জন ব্রেটন (Bretton) এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন। বিদ্যালয়ের বিভাগ ছিল দুটি, সংস্কৃত ক্লাশ হত সংস্কৃত কলেজে এবং উর্দু ক্লাস হত মাদ্রাসায়। সংস্কৃতক্লাসে ইয়োরোপীয় চিকিৎসাবিধি ছাড়া চরক-সুশ্রুত প্রভৃতি আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসাশাস্ত্রও পড়ান হত। এই শিক্ষাব্যবস্থা এদেশের প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট-কিনা সে বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য এবং কিভাবে শিক্ষার উন্নতি করা যায় তা নির্ণয় করার জন্য ১৮৩৩-এ গর্ভনর জেনারেল উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক একটি কমিটি নিয়োগ করলেন। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন জে.গ্রাণ্ট (J. Grant)। সভ্য ছিলেন সাদারল্যাণ্ড (J.C.C Sutherland), ট্রিভিলিয়ান (C.C. Trevelyan), থমাস স্পেনস (Thomas Spens), ব্রামলি (M.J.Bramley) এবং রামকমল সেন। এই কমিটি সংস্কৃত কলেজের এবং মাদ্রাসার ক্লাস বন্ধ করে দেবার এবং অবিলম্বে একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের সুপারিশ করেন। ডাঃ টাইটলর (Tytler) ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেবার ঘোর বিরোধী ছিলেন। ব্রেটনের মৃত্যুর পর টাইটলর স্কুলের অধ্যক্ষ হন। তিনি সংস্কৃত এবং প্রাচ্য বিষয়ে খুব পণ্ডিত ছিলেন।

কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বেন্টিঙ্ক ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারির ঘোষণায় কলকাতায় মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার বিষয়টি ব্যক্ত করেন। ডাঃ মাউন্টফোর্ড জোসেফ ব্রামলির উপর কলেজ প্রতিষ্ঠার ভার অর্পিত হয়। কলেজের প্রতিষ্ঠাদিবস নিয়ে কিছুটা মত পার্থক্য দেখা যায়। মেডিকেল কলেজের শতবার্ষিকী স্মারক-লিপিতে বলা হয়েছে: 'This worthy band of workers commenced their labours on the 20th February, 1835।' এই উক্তি থেকে মনে হতে পারে, মেডিকেল কলেজ বুঝি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ২০শে ফেব্রুয়ারি। পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর লিখেছেন: '১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দে ডাঃ হেনরী হ্যারি গুডিব সাহেব (H.H.Goodeve) মেডিকেল কলেজে এই কলেজ সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দেন, তা হল, 'মেডিকেল কলেজের নিমিত্ত ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দে, ২০শে ফেব্রুয়ারি হইতে আমরা প্রাণপণে পরিশ্রম করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দে ১লা মে শুক্রবার ছাত্র-নির্বাচনের নিমিত্ত পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। সুতরাং ২০শে ফেব্রুয়ারি তারিখে কলেজ খোলা হইয়াছিল, একথা হইতেই পারে না। ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দে ১লা জুন সোমবার (১২৪২ বঙ্গাব্দ, ১৯শে জ্যৈষ্ঠ) মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়।' General Committee of Public Instruction-এর ১৮৩৬ সালের রিপোর্টেও বলা হয়েছে ডাঃ ব্রামলি ১লা জুন থেকে বক্তৃতা দিতে শুরু করেন। প্রকৃত পক্ষে এই দিন থেকেই কলেজের কাজ শুরু হয়।

ব্রামলির সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট পদের নাম পরিবর্তিত হয় অধ্যক্ষে এবং গুডিব হন শারীরবিদ্যা ও ভেষজবিদ্যার অধ্যাপক, রসায়নের অধ্যাপক হন উইলিয়ম ব্রুক ও'স্যানেসী (W. B. O'Shaughnessy)। সংস্কৃত কলেজ থেকে এলেন পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত, গুডিবের সহকারী হিসাবে।

শবব্যবচ্ছেদ তখনকার দিনে ভারতবর্ষে-অকল্পনীয় ঘটনা। যেদেশে মৃতদেহ স্পর্শ করলে স্নান করে শুদ্ধ হতে হয়, অন্য জাতির শবস্পর্শে দোষের অবধি থাকে না, সেদেশে শবব্যবচ্ছেদের কথা চিন্তা করাই দুঃসাহসিক ব্যাপার। অথচ প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের চিকিৎসকগণ-

শবব্যবচ্ছেদ করতেন। শারীরস্থান এবং চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানের জন্য মানুষের মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করার প্রয়োজনীয়তা আমাদের দেশের চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা প্রাচীনকালেও অনুভব করেছিলেন। সুশ্রুতের যুগে ভারতবর্ষে শবব্যবচ্ছেদ প্রচলিত ছিল। সুশ্রুত-সংহিতায় ব্যবচ্ছেদ সম্বন্ধে উল্লেখ রয়েছে। শারীরস্থানের পঞ্চম অধ্যায়ে বলা হয়েছে—

ত্বক্ পর্য্যন্তস্য দেহস্য যোঽয়মঙ্গ বিনিশ্চয়ঃ।
শল্যজ্ঞানাদৃতে নৈষ বর্ণ্যতেঽঙ্গেষু কেষুচিৎ॥
তস্মান্নিঃসংশয়ং জ্ঞানং হর্ত্রা শল্যস্য বাঞ্ছতা।
শোধয়িত্বা মৃতং সম্যগ্ দ্রষ্টব্যঽঙ্গ বিনিশ্চয়ঃ॥
প্রত্যক্ষতো হি যদ্দৃষ্টং শাস্ত্রদৃষ্টঞ্চ যদ্-ভবেৎ।
সমাসতস্তদুভয়ং ভূয়ো জ্ঞান বিবর্দ্ধনম্॥ ৪৯

অর্থাৎ, 'ত্বক্ পর্যন্ত দেহের যে সকল অঙ্গ নিরাকৃত হইল, শল্য শাস্ত্রের জ্ঞান না থাকিলে তাহাদের মধ্যে কোন অঙ্গই বর্ণনা করা যায় না। আর যদি শল্যহর্তা সেই সকল অঙ্গের নিঃসংশয় জ্ঞান ইচ্ছা করেন, তবে মৃতদেহ শোধন করিয়া সেই সকল অঙ্গ সম্যক্‌রূপে প্রত্যক্ষ করিবেন। প্রত্যক্ষদৃষ্ট ও শাস্ত্রদৃষ্ট উভয় হইলে সমাসতঃ অতিশয় জ্ঞান বিবর্ধক হয়।' (যশোদানন্দন সরকার কর্তৃক অনূদিত)

তস্মাৎ সমস্তগাত্রমবিষোপহতমদীর্ঘব্যাধিপীড়িতমবর্ষশতিকং নিঃসৃষ্টান্ত্র-পুরীষং পুরুষমাবহন্ত্যা মাপগায়াং নিবদ্ধং পঞ্জরস্থং মুঞ্জবল্কল কুশশণাদীনামন্যতমেনাবেষ্টিতাঙ্গমপ্রকাশে দেশে কোথয়েৎ। সম্যক্ প্রকুথিতঞ্চোদ্ধৃত্য, ততো দেহং সপ্তরাত্রাদুশীরবালবেণুবল্কলকূচীনামন্য-তমেন শনৈঃ শনৈরব ধর্ষয়ংস্ত্বগাদীন সর্বানেব বাহ্যাভ্যন্তরাঙ্গপ্রত্যঙ্গ-বিশেষান্ যথোক্তান্ লক্ষয়েচ্চক্ষুষা॥ ৫০

অর্থাৎ, 'পরীক্ষার্থে গৃহীত শবদেহ সম্পূর্ণগাত্র হওয়া উচিত, যেন উহা বিষ-দূষিত না হয়, যেন দীর্ঘকাল ব্যাধি-পীড়িত না হইয়া থাকে, যেন শতবর্ষ বয়স্ক (অর্থাৎ অতিবৃদ্ধ) ব্যক্তির মৃতদেহ না হয়। আর মৃতদেহের অন্ত্র হইতে পুরীষ (মল) নিষ্কাসিত করিয়া ফেলিবে। পরে উহার অঙ্গ

মুঞ্জবৃক্ষের বল্কল, কুশ বা শণাদিদ্বারা বেষ্টিত করিবে এবং পঞ্জরের মধ্যে রাখিয়া স্রোতস্বতীর স্থির জলে (স্রোত রহিত নদীতে) নিবদ্ধ করিবে, যেন ঐ স্থানটি নির্জন হয়। এইরূপে সাতদিন রাখিলে উহা পচিয়া যাইবে এবং সম্যক্‌রূপে পচিয়া গেলে তুলিয়া লইয়া উশীর (বেনার মূল), কেশ বা বেণুবল্কলের কুচীদ্বারা আস্তে আস্তে ঘর্ষণ করিয়া পূর্বোল্লিখিত ত্বগাদি সর্বপ্রকার বাহ্য ও আভ্যন্তর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চক্ষু দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ দর্শন করিবে।' (য. স.)

> ন শক্যশ্চক্ষুষা দ্রষ্টুং দেহে সূক্ষ্মতমো বিভুঃ।
> দৃশ্যতে জ্ঞানচক্ষুর্ভিস্তপশ্চক্ষুর্ভিরেব চ॥
> শরীরে চৈব শাস্ত্রে চ দৃষ্টার্থঃ স্যাদ্বিশারদঃ।
> দৃষ্টশ্রুতাভ্যাং সন্দেহমবাপোহ্যাচরেৎ ক্রিয়াঃ॥ ৫১

অর্থাৎ, 'আত্মা সূক্ষ্মতম বলিয়া দেহের মধ্যে চক্ষুদ্বারা দেখা যায় না। উহা জ্ঞান-চক্ষু ও তপশ্চক্ষুদ্বারা দেখিতে হয়। মৃতদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চাক্ষুষ দর্শন করিলে ও শাস্ত্রার্থে অবগতি থাকিলে আয়ুর্বেদে বিশারদ হওয়া যায়। প্রত্যক্ষ দর্শন ও শাস্ত্রপাঠ দ্বারা সন্দেহ নিরাকৃত করিয়া চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবে।' (য স.)

প্রাচীন মিশরেও শবব্যবচ্ছেদ প্রচলিত ছিল। আলেকজান্দ্রিয়ার বিখ্যাত শারীরস্থানবিদ্ ছিলেন এরাসিস্ট্রাটাস (Erasistratus) ও হেরোফিলাস (Herophilus)। গ্রীক চিকিৎসক গ্যালেন তাঁর ছাত্রদের বলতেন, শারীরস্থান বিষয়ে শিক্ষার শ্রেষ্ঠস্থান আলেকজান্দ্রিয়া।

প্রাচীন ইয়োরোপে শারীরস্থান-বিশেষজ্ঞদের[১] অগ্রণী ছিলেন খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে অ্যারিস্টট্‌ল এবং খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে গ্যালেন। কিন্তু ইয়োরোপ তখন সংস্কারমুক্ত ছিল না। তাঁরা মানুষের মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করার কথা ভাবতেই পারতেন না। তখনকার দিনে মানুষের শরীরের গঠনপ্রকৃতি জানার একমাত্র উপায় ছিল জন্তুর বা বানরের শরীর ব্যবচ্ছেদ করে দেখা।

ইয়োরোপে শিক্ষার জন্য মানুষের মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ প্রথম শুরু হয় খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইতালির বলনা (Bologna)

বিশ্ববিদ্যালয়ে। ব্যবচ্ছেদ হত, অস্বাভাবিকভাবে মৃত ব্যক্তির দেহের উপর। শুধু শবব্যবচ্ছেদই নয়, শারীরস্থানের প্রথম পুস্তক রচনার কৃতিত্বও বলনা-র। বলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরস্থানবিদ্ মাণ্ডিনাস (Mundinus) এই গ্রন্থটি লেখেন।

শারীর-বিজ্ঞানের প্রচুর উন্নতি হয় রেনেসাঁস যুগে। এই যুগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নাম লিওনার্দো দ্য ভিন্‌সি (Leondardo da Vinci, ১৪৫২—১৫১৯), এন্‌ড্রিয়াস ভেসালিয়াস (Andreas Vesalius ১৫১ —১৫৬৪) এবং উইলিয়ম হারভে (William Harvey ১৫৭৪—১৬৫৪)।

লিওনার্দো এক অনন্যসাধারণ প্রতিভা। রেনেসাঁসের তিন প্রধান শিল্পী—মাইকেল্যাঞ্জেলো, রাফেল এবং লিওনার্দো। তিনজনই ইতালির। মনুষ্যদেহের গঠন সম্বন্ধে ত্র্ঁদের প্রত্যেকেরই পরিষ্কার ধারণা ছিল। তবে এ ব্যাপারে লিওনার্দোর সঙ্গে কারুর তুলনা হয় না। লিওনার্দো মূলত শিল্পী। কিন্তু গণিত, বিজ্ঞান, শারীরতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর মৌলিক গবেষণা সেযুগের বিস্ময়কর ঘটনা। তাঁর আঁকা 'মোনালিসা' এবং 'লাস্ট সাপার' শাশ্বত আনন্দের সামগ্রী। প্যারিসের লুব্‌র এ সংরক্ষিত মোনালিসা যুগ যুগ ধরে মানুষকে অপূর্ব আনন্দ দান করে এসেছে। লিওনার্দোর একদিকে যেমন শিল্পীমন, অন্যদিকে তেমনি বিশ্লেষণ করে দেখার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং অনুসন্ধিৎসা। বৈজ্ঞানিক চেতনা ও শিল্পীমনের অসাধারণ সমন্বয়ে লিওনার্দো অসাধ্যসাধন করেছেন। শুধু অদম্য কৌতূহল নিবৃত্তির জন্যই নয়, মানবদেহের আভ্যন্তরিক রহস্য উন্মোচনের জন্যও তিনি মানুষের মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করেন এবং বিভিন্ন অবয়বের চিত্র অঙ্কন করেন। তিনি হৃদ্‌যন্ত্রের যে-চিত্রটি এঁকেছিলেন, তার কপাটকগুলি পর্যন্ত অতি স্পষ্ট। রক্ত-সঞ্চালনে কপাটকের ভূমিকা কী তা তিনি বর্ণনা করেছেন। লিওনার্দোর আঁকা শরীরের বিভিন্ন অংশের চিত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে মাতৃগর্ভে শিশুর চিত্রটি। জরায়ুর ভিতর শিশু কী অবস্থায় থাকে, তা তিনি এই অপরূপ চিত্রে ফুটিয়ে তুলেছেন।

এন্‌ড্রিয়াস ভেসালিয়াসের জন্ম ব্রুসেল্‌সে, পড়াশুনা করেন প্যারিসে। তারপর চলে আসেন ইতালির পাদুয়া-তে। সেখানে মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে তিনি অ্যানাটমির অধ্যাপক নিযুক্ত হন। অ্যানাটমির একটি চমৎকার গ্রন্থও তিনি রচনা করেন। সম্পূর্ণতার দিক থেকে বিচার করলে তাঁকেই এ-বিষয়ের প্রথম গ্রন্থকার বলা যায়। বই প্রকাশিত হবার পরই তিনি অধ্যাপনা ছেড়ে সম্রাট পঞ্চম চার্লসের কোর্ট-চিকিৎসক পদে যোগ দেন। সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান-জগতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। হারভের কৃতিত্ব রক্তের সংবহন আবিষ্কার করা। হারভের জন্ম কেণ্টে, পড়াশুনা করেন পাদুয়াতে। লণ্ডনে ফিরে যোগ দেন কলেজ অব ফিজিসিয়ানস্‌-এ। তিনিই প্রথম দেখান হৃদপিণ্ড পাম্পের মত কাজ করে। যখন হৃদপিণ্ড সঙ্কুচিত হয়, তখন রক্ত ধমনীর ভিতর দিয়ে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে অ্যানাটমির বা শারীরস্থানের প্রতি অনেক প্রতিভাবান ব্যক্তির দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। মনুষ্য দেহের অনেক অজ্ঞাত অংশ এ সময়ে আবিষ্কৃত হয়। নানা জায়গায় অ্যানাটমির স্কুল স্থাপিত হয়। লণ্ডনে এই সময়ে ছিলেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ শারীরস্থানবিদ্‌ জন হাণ্টার (১৭২৮-৯৩)।

শবব্যবচ্ছেদ বিষয়ে ভারতবর্ষের মধ্যযুগীয় কুসংস্কার ও অজ্ঞতা পেরিয়ে এবার আমরা আসতে পারি ঊনবিংশ শতাব্দীতে। এ সময়টায় ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে এক বিরাট 'জাগরণে'র দিন। রামমোহন রায় সমাজ সংস্কারে প্রবৃত্ত হয়ে শিক্ষিত লোকের ভিতর দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। হিন্দু কলেজের শিক্ষক হেনরী ভিভিয়ান ডিরোজিও যুবসমাজের উপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছেন এবং এক সামাজিক বিপ্লবের সূচনা করেছেন। সমস্ত বাধা নিষেধ লঙ্ঘন করে সামাজিক নিয়মকানুনের বেড়া ভেঙে দিয়ে তরুণরা ভাবত তারা এক নতুন যুগের সূচনা করছে। এই সামাজিক আন্দোলনের সময়ে মানুষের মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদও একটি বৈপ্লবিক ঘটনা।

পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত সংস্কৃত কলেজে বৈদ্যকশাস্ত্র শ্রেণীর ছাত্র

ছিলেন। তিনি এতই প্রতিভাবান ছাত্র ছিলেন যে সেখানকার শিক্ষক পণ্ডিত ক্ষুদিরাম বিশারদ চলে গেলে ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে তাঁকে ষাট টাকা বেতনে এই পদে নিযুক্ত করা হয়। এই নিয়োগের ব্যাপারে সহপাঠীরা বিক্ষুব্ধ হন এবং তাঁদের কেউ কেউ ক্লাসে যোগদান থেকে বিরত থাকেন। মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হলে মধুসূদন সেখানে যোগ দেন ১৮৩৫ সালের ১৭ই মার্চ ডেমনস্ট্রেটর পদে। মাসিক বেতন একশত টাকা।

শবব্যবচ্ছেদের প্রয়োজনীয়তা সেদিন শিক্ষকগণ অনুভব করছিলেন সত্য, কিন্তু শবের প্রতি দেশীয় লোকদের অন্ধ বিশ্বাস এবং কুসংস্কার থাকায় তাঁরা হঠাৎ একাজে অগ্রসর হতে চাইছিলেন না। শারীরস্থান বিষয়ে শিক্ষা দেবার জন্য কাঠের মডেল, কুকুর, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি জন্তু ব্যবচ্ছেদ করে তাঁরা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিক্ষা দিতেন। ক্রমে মানুষের মৃতদেহের বিভিন্ন অঙ্গও দেখানো হতে লাগল। তারপর একদিন অধ্যাপক গুডিব সাহেব সাহস করে একটি সম্পূর্ণ মৃতদেহ টেবিলের উপর রেখে ছাত্রদের সামনে বক্তৃতা দিলেন। এতে ছাত্রদের মধ্যে যেমন উত্তেজনার সৃষ্টি হল, তেমনি সৃষ্টি হল তীব্র কৌতূহল। শিক্ষকগণ বুঝলেন, শব ব্যবচ্ছেদের উপযুক্ত সময় উপস্থিত।

শিক্ষা প্রসারে উৎসর্গীকৃত প্রাণ ডেভিড হেয়ারের (১৭৭৫—১৮৪২) যথেষ্ট প্রভাব ছিল মেডিকেল কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকদের উপর। তিনিও ছাত্রদের উৎসাহ দিতেন শবব্যবচ্ছেদ করার জন্য। মধুসূদন গুপ্ত যখনই হেয়ারের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন, হেয়ার বলতেন, কি হে মধু! শবব্যবচ্ছেদের কী হল? এল সেই দিন। ১৮৩৬-এর ২৮শে অক্টোবর। মধুসূদন ঐদিনে মানুষের মৃতদেহে প্রথম ছুরি চালান।

শিক্ষা সমাজের সভাপতি, বড়লাটের আইন-সচিব ড্রিঙ্ক ওয়াটার বেথুন (**Drinkwater Bethune,** ১৮০১—১৮৫১) ১৮৫০ সালে মেডিকেল কলেজে খ্যাতনাম্নী শিল্পী শ্রীমতী বেলনস অঙ্কিত মধুসূদনের তৈলচিত্রের আবরণ উন্মোচন করতে গিয়ে যা বলেছিলেন,

তা থেকে শবব্যবচ্ছেদের একটি সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি বলেছিলেন : 'নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে ছুরি হাতে মধুসূদন ডাঃ গুডিবকে অনুসরণ করে সেই গুদামঘরে প্রবেশ করলেন, যেখানে একটি মৃতদেহ রক্ষিত আছে। অন্যান্য ছাত্রদের মধ্যে প্রবল কৌতূহল ও উত্তেজনা। তারা গুদামঘরের বাইরে জড় হয়েছে। যেখানে একটি ভয়াবহ ঘটনা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে, সেখানে প্রবেশ করার সাহস নেই, অথচ অনুষ্ঠানের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা লাভ করার আগ্রহও প্রচুর। কয়েকজন দাঁড়িয়েছে দরজার সামনে, কয়েকজন দেখছে ঝিলমিলের ফাঁক দিয়ে। মধুসূদন শক্তহাতে ছুরিটি ধরলেন মৃতদেহের বুকের উপর। ছাত্ররা এক ভয়াবহ দৃশ্যের কল্পনা করে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে। দৃঢ়ভাবে মধুসূদন ছুরিটি চালিয়ে দিলেন শরীরের ভিতর। অপেক্ষমান ছাত্ররা এতক্ষণে দীর্ঘশ্বাস ফেলল, যেন এক দুঃসহ উৎকণ্ঠা থেকে তারা অব্যাহতি পেল।' [সাহিত্য সাধক চরিতমালা ৯৬]

অন্ধকুসংস্কার ঝেড়ে ফেলে দিয়ে, সামাজিক লাঞ্ছনার ভয়কে গ্রাহ্য না করে মধুসূদন যে এই দুরূহ কাজে এগিয়ে এসেছিলেন, তাতে তাঁর সাহস এবং মানসিক দৃঢ়তাই প্রমাণিত হয়। প্রথম শবব্যবচ্ছেদকারী হিসাবে যদিও মধুসূদনের নাম প্রচলিত, তবু এ কৃতিত্ব শুধু তাঁর একার নয়—আরো চারজন ছাত্রের। সেই চারজন ছাত্র হলেন, রাজকৃষ্ণ দে, উমাচরণ শেঠ, দ্বারকানাথ গুপ্ত এবং নবীনচন্দ্র মিত্র। এঁরা মেডিকেল কলেজের প্রথম ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন। বস্তুত কেউ কেউ মনে করেন, প্রথম শবব্যবচ্ছেদ করার কৃতিত্ব আদৌ মধুসূদনের নয়, এ কৃতিত্ব রাজকৃষ্ণ দে-র। এ ধারণার কারণ আছে।

মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ ব্রামলি তাঁর রিপোর্টে শবব্যবচ্ছেদকারী হিসাবে মধুসূদনের নামোল্লেখ করেন নি। তিনি বলেন : শবব্যবচ্ছেদ করার ব্যাপারে গোপনীয়তা রক্ষা করা অত্যাবশ্যক ছিল, কারণ শবব্যবচ্ছেদকারী ছাত্রদের নাম প্রকাশ পেলে তারা লোকসমাজে চিহ্নিত হয়ে যেত। তাদের ও তাদের পরিবারবর্গের সমাজচ্যুত হবার সম্ভাবনাও ছিল। যদি তা হত, তবে যে মহৎ কাজে তারা ব্রতী

হয়েছে, তাতে বাধা পড়ত।······আমি খুব আনন্দের সঙ্গে বলতে পারি ২৮শে অক্টোবর (১৮৩৬) দিন সকল সংশয়ের নিরসন হয়েছে। ঐ দিনটি মেডিকেল কলেজের ইতিহাসে একটি বিশেষ দিন বলে গণ্য করা যায়। ঐ দিনে কলেজের চারজন সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান ও সম্ভ্রান্ত ছাত্র স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে শবব্যবচ্ছেদ করেন এবং সকল অধ্যাপক ও চোদ্দজন সহপাঠীর সম্মুখে দেহের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ অতিশয় নৈপুণ্যের সঙ্গে ও সুন্দরভাবে দেখান। দেশীয় চারজন তরুণের এই প্রসংশনীয় দৃষ্টান্তে প্রকৃত সভ্যতার অগ্রগতির দিকে মহত্তম পদক্ষেপ সূচিত হল। [সাহিত্য সাধক চরিতমলা ৯৬]

বেথুনের উক্তির সঙ্গে ব্রামলির উক্তির মিল নেই। ব্রামলি মধুসূদনের নাম উল্লেখ করেননি, বলেছেন চারজন বুদ্ধিমান এবং সদগুণবিশিষ্ট ছাত্র একাজে অগ্রসর হয়েছিলেন। ব্রামলির রিপোর্ট ১৮৩৬ সালের Report of the General Committee of Public Instruction of the Presidency of Fort William in Bengal-এ প্রকাশিত। ব্রামলি ছিলেন এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। অপরদিকে বেথুন ভারতে এসেছিলেন ১৮৪৮ সালে এবং তিনি শোনাকথার উপর নির্ভর করে বক্তৃতা করেছিলেন। সুবিখ্যাত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ১৮৭২ সালে তাঁর 'ক্যালকাটা জার্নাল অব মেডিসিনে' লিখেছিলেন : 'একদিন উমাচরণ শেঠ ও দ্বারকানাথ গুপ্তকে এক সঙ্গে দেখতে পাই। কে প্রথম শবব্যবচ্ছেদ করেছিল, একথা তাঁদের কাছে জানতে চাই। তাঁরা বলেন রাজকৃষ্ণ দে-ই প্রথম শব ব্যবচ্ছেদ করেছিলেন।'

এই সব উদ্ধৃতির ফলে এই ধারণাই জন্মায় যে মধুসূদন বুঝি প্রথম শবব্যবচ্ছেদ করেননি। কিন্তু যদি অন্য ভাবে বিচার করা যায়, তবে এ ধারণাও পালটাতে হয়। সে সময়কার পত্র-পত্রিকায় প্রথম শবব্যবচ্ছেদকারী হিসাবে একমাত্র মধুসূদনেরই নামোল্লেখ আছে। ব্রামলি মধুসূদনের নাম উল্লেখ করেননি, কারণ মধুসূদন ছিলেন শিক্ষক। মধুসূদন শিক্ষক হিসাবে মৃতদেহে ছুরি চালিয়ে ছাত্রদের হয়ত দেখিয়ে-

ছিলেন কীভাবে ব্যবচ্ছেদ করতে হয়—তারপর ছাত্ররা কাজ শুরু করে।

অন্য একটি তর্কের বিষয়, কোন তারিখে শবব্যবচ্ছেদ হয়েছিল। কারো মতে ১০ই জানুয়ারি আবার অন্যদের মতে ২৮শে অক্টোবর। ১০ই জানুয়ারি তারিখটির উল্লেখ করেছেন জেম্‌স হ্যারিসন, শতবার্ষিকী কমিটি এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালণ্ডার। অন্যদিকে প্রথম অধ্যক্ষ ডাঃ ব্রামলি তাঁর রিপোর্টে তারিখ দিয়েছেন ২৮শে অক্টোবর। ব্রামলি শবব্যবচ্ছেদের সময় উপস্থিত ছিলেন। তাঁর রিপোর্টকেই সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য বলে ধরে নেওয়া উচিত। সেজন্য বলা যায়, ২৮শে অক্টোবর প্রথম শবব্যবচ্ছেদ হয়েছিল।

অপর তর্কসাপেক্ষ বিষয়, যখন শবব্যবচ্ছেদ হয় তখন নাকি দুর্গ থেকে তোপধ্বনি করা হয়েছিল। 'কোনো সমসাময়িক পত্রিকায় এবিষয়ের উল্লেখ নেই। গোপনীয়তা রক্ষার জন্য যেখানে ব্রামলি ছাত্রদের নামোল্লেখ পর্যন্ত করেননি, সেখানে তোপধ্বনি করে সবাইকে জানানো অস্বাভাবিক ব্যাপার।

মধুসূদনের জন্ম বৈদ্যবাটীতে সম্ভবতঃ ১৮০০ সালে। তাঁর পিতার নাম বলরাম গুপ্ত। শৈশবে পাঠে মনোযোগ না থাকায় তাঁর পিতা একদিন তাঁকে তিরস্কার করেন। রাগে দুঃখে মধুসূদন বাড়ি ছেড়ে কলকাতা চলে আসেন। সেখানে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন এবং সংস্কৃতে যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করেন।

মধুসূদন মেডিকেল কলেজে যোগ দেন শিক্ষক হিসাবে। অথচ ১৮৪০ সালে কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলে তাঁকে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। জেনারেল কমিটির রিপোর্টে মধুসূদনের পরীক্ষার ফল সম্বন্ধে লেখা আছে যে ইংরেজিতে কিছু কাঁচা, কিন্তু অন্যান্য উত্তর সন্তোষজনক। অথচ মধুসূদন কোনোদিনই মেডিকেল কলেজে ছাত্র হিসাবে পড়েননি। এ থেকে মনে হয়, কলেজ কর্তৃপক্ষ মধুসূদনের উপর সন্তুষ্ট থাকায় ছাত্র না হওয়া সত্ত্বেও পরীক্ষায় বসতে অনুমতি দিয়েছিলেন।

সৈন্যবাহিনীর বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে 'নেটিব ডাক্তার'দের চাহিদাও বেড়ে যেতে লাগল। অন্যদিকে সাধারণ মানুষের চিকিৎসার ব্যবস্থা করার প্রয়োজনও অনুভূত হল। যদিও ইংরেজি ক্লাসে শিক্ষাব্যবস্থা ভাল এবং উৎকৃষ্ট চিকিৎসক তৈরি করা হয়, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এই ধরনের চিকিৎসকের সংখ্যা নগণ্য। ১৮৩৯ সালে মেডিকেল কলেজে হিন্দুস্থানী ক্লাস খোলা হল। ঠিক হল এখানে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ছাত্রদের ভর্তি করা হবে এবং হিন্দুস্থানীতে চিকিৎসা, বিজ্ঞানের মোটামুটি জ্ঞান দেওয়া হবে। ভর্তির যোগ্যতা ছিল মাতৃভাষায় পড়ার ও লেখার ক্ষমতা। পঞ্চাশ জন ছাত্র নেওয়া স্থির হয়। এতে পড়াবার জন্য শিক্ষক নিযুক্ত হলেন শিবচন্দ্র কর্মকার, চমনলাল এবং নবকৃষ্ণ।

মধুসূদন ১৮৪৫ সালে এই ক্লাসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হন। তাঁর অধ্যাপনার গুণে এই ক্লাসের দ্রুত উন্নতি হতে লাগল। এই ক্লাসের ভিজিটর অধ্যাপক এলান ওয়েব এক রিপোর্টে বলেছেন: 'তাদের উত্তর বেশ সন্তোষজনক। এর জন্য সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব প্রাপ্য শারীরস্থান ও শারীরবৃত্তের যোগ্য শিক্ষক মধুসূদন গুপ্তের। ঐ বাবুর উৎসাহে ও অনুপ্রেরণায় ইংরেজি ক্লাশের হিন্দু ছাত্রদের মত মিলিটারি ক্লাসের ছাত্ররাও শবব্যবচ্ছেদ করেছে। আমি প্রতিদিন পরিদর্শনকালে তাদের ব্যবচ্ছেদ কার্য দেখে খুব প্রীতি লাভ করেছি।' [সাহিত্যসাধক চরিতমালা ৯৬]

হিন্দুস্থানী ক্লাসের ছাত্রদের বেশির ভাগই মুসলমান। তাঁদের মধ্যেও শবব্যবচ্ছেদ নিয়ে কুসংস্কার ছিল। কিন্তু মধুসূদন তাঁর অধ্যাপনা-নৈপুণ্যে ছাত্রদের এতই প্রভাবিত করেছিলেন যে তাঁরাও শবব্যবচ্ছেদে এগিয়ে এসেছিল।

মেডিকেল কলেজে বাংলা ক্লাস খোলা হয় ১৮৫২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে। মধুসূদন এই বিভাগেরও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হন। ১৭-৬-১৮৫২-এর 'সংবাদ প্রভাকরে'র সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে: 'অদ্য ঐ বাঙ্গলা শ্রেণীর কার্যারম্ভ হইবেক। পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত, বাবু শিবচন্দ্র কর্মকার, তথা বাবু প্রসন্নকুমার মিত্র প্রভৃতি কয়েক

জন পূর্বেই উপদেশের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। অধুনা শুনিতেছি বাবু রামনারায়ণ দাস ২০০ টাকা মাসিক অস্ত্র চিকিৎসার শিক্ষা প্রদানার্থ উক্তশ্রেণীর একজন শিক্ষকের পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন, দেখা যাউক কিরূপ হয়। দুই চারি মাসের মধ্যে ফল অবশ্যই প্রত্যক্ষ হইবেক। [বিনয় ঘোষ : সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র প্রথম খণ্ড।].

শিবচন্দ্র কর্মকার পড়াতেন মেটিরিয়ামেডিকা, প্রসন্নকুমার মিত্র ভেষজতত্ত্ব এবং রামনারায়ণ দাস শল্যচিকিৎসা। মধুসূদন পড়াতেন শারীরস্থান।

মধুসূদন চিকিৎসা-বিদ্যার কয়েকটি পুস্তক রচনা করেন। সংস্কৃত কলেজে থাকার সময় তিনি হুপারের 'Anatomist Vademecum' সংস্কৃতে অনুবাদ করেন। তা প্রকাশিত হয় ১৮৩৫ সালে। এই কাজের জন্য তাঁকে এক হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়। তিনি 'লণ্ডন ফার্মাকোপিয়া' গ্রন্থেরও বাংলা অনুবাদ করেন। তা প্রকাশিত হয় ১৮৪৯ সালে। তাঁর অপর বাংলা গ্রন্থ 'এনাটমী' বা শারীরবিদ্যা। এটি প্রকাশিত হয় ১৮৫২ সালে। যদিও মধুসূদনের বাংলা রচনা সুখপাঠ্য নয়, তবু তাঁর চেষ্টা যে প্রশংসনীয় সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। 'সাহিত্য-সাধক চরিতমালা'য় (৯৬) যোগেশচন্দ্র বাগল মধুসূদনের গ্রন্থ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

মধুসূদনের পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে যা জানা যায়, তা হল তিনি বর্ধমান জেলার হারোয়া গ্রামনিবাসী জমিদারকন্যা পদ্মাবতী দেবীকে বিবাহ করেন। তাঁর তিন পুত্র—গোপালচন্দ্র গুপ্ত, জয়গোপাল গুপ্ত ও দ্বারকানাথ গুপ্ত। এই গোপালচন্দ্র গুপ্ত মেডিকেল কলেজের প্রথম ছাত্রদের অন্যতম।

১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে মধুসূদনের মৃত্যু হয়। এই কর্মবহুল জীবনের অবসানে দেশব্যাপী শোকের ছায়া পড়ে। তারই প্রতিফলন ঘটে 'সম্বাদ ভাস্কর'-এর সম্পাদকীয়তে। ১৮৫৬ সালের ২২শে নভেম্বরের সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে : 'উক্ত গুপ্তবাবুর মৃত্যু হইয়াছে ইহাতে আমরা অতিশয় দুঃখিত হইলাম। মধুসূদন বাবু এতদ্দেশীয় ব্যবচ্ছেদ

বিদ্যাব্যবসায়ীগণের আদিপুরুষ ছিলেন, এতদ্দেশীয়েরা বিশেষতঃ হিন্দু মৃতদেহ স্পর্শ করিবেন দূরে থাকুক পিতামাতাদি আত্মীয়লোকের মৃত্যু হইলে যে স্থানে শব রাখে, গোময় জলে সেস্থান পর্যন্ত ধৌত করেন, শব লইয়া গেলে বহির্দ্বার পর্য্যন্ত গোময় জলের ছিটা দেন, মৃতদেহের বিষয়ে অদ্যাপিও যে জাতির ঘৃণা ও পাপ ভয় রহিয়াছে, মধুসূদনবাবু সেইজাতির মধ্যে এক উত্তমকুলে জন্মিয়াছিলেন, তথাচ মেডিকেল কলেজে প্রবিষ্ট হিন্দুজাতির মধ্যে সর্বাগ্রে মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ কার্যে প্রবৃত্ত হন, তাঁহার দৃষ্টান্তে অন্যান্য হিন্দুরা মৃতদেহ কাটাকুটি কার্যে সুপটু হইয়াছেন, ঐ বাবুই তাঁহাদিগকে শিক্ষাদান করিয়াছেন. মধুসূদন গুপ্ত স্বজাতীয় বৈদ্যক বিদ্যায় এবং ইংরাজী চিকিৎসা বিদ্যায় সুপ্রবিষ্ট হইয়াছিলেন তাহাতে দেশের বিস্তর উপকার করিয়াছেন, তাঁহার মৃত্যু সমাচারে ইংরাজ বাঙালী সাধারণ বহুলোক আক্ষেপ করিবেন।'

বর্তমান মেডিকেল কলেজগুলির ছাত্রছাত্রীদের কাছে 'মরা কাটা'র উপর গুরুত্ব আরোপ হাস্যকর মনে হতে পারে, কারণ তারা আজ দ্বিধাহীন পদক্ষেপে অ্যানাটমি-হলে প্রবেশ করে। মৃতদেহগুলি এখন একটার পর একটা সাজানো থাকে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এতগুলি শবের মধ্যে কাজ করতে তাদের কোনো ঘৃণা জাগে না, হাত এতটুকু কাঁপে না। তাদের কাছে আজ শব-ব্যবচ্ছেদে কোনো বীরত্ব নেই। কিন্তু ১৮৩৬ সালে মধুসূদন গুপ্ত, রাজকৃষ্ণ দে এবং অন্যান্যরা প্রথম শব-ব্যবচ্ছেদ করে বীরত্ব দেখিয়েছিলেন বইকি! শুধু বীরত্ব নয়, ভবিষ্যতের জন্য অ্যানাটমি শেখার দরজা খুলে দিয়েছিলেন তাঁরা।

পঞ্চাশ জন ছাত্র নিয়ে কলকাতায় মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়েছিল। এঁদের বর্ণানুযায়ী পরিচয় এইরূপ : ব্রাহ্মণ—৫, বৈদ্য—৩, কায়স্থ—১৫, সুবর্ণ বণিক—২, তাঁতি—৬, এবং অন্যান্য—১৯। সাড়ে তিন বছর পড়ার পর ১৮৩৮ সালের অক্টোবর মাসে মাত্র এগারজন পরীক্ষার্থী শেষ পরীক্ষা দিলেন। এঁরা হলেন—উমাচরণ শেঠ, দ্বারকানাথ গুপ্ত, রাজকৃষ্ণ দে, গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত, কালাচাঁদ দে, গোপালচন্দ্র গুপ্ত, চমনলাল, নবীনচন্দ্র মিত্র, নবীনচন্দ্র মুখার্জি, বুধেনচন্দ্র চৌধুরী এবং জেমস্ পোর্ট। সাতদিন ধরে চলল পরীক্ষার বিভীষিকা। কেউ কেউ দু-একটি পরীক্ষা দিয়ে আর এগুতে সাহস করলেন না। শেষ অবধি যাঁরা টিকে রইলেন, তাঁদের মধ্যে কৃতকার্য হলেন মাত্র চারজন। এই ভাগ্যবান চারজন হলেন—উমাচরণ শেঠ, দ্বারকানাথ গুপ্ত, রাজকৃষ্ণ দে ও নবীনচন্দ্র মিত্র। এই পরীক্ষার কিছুদিন পর ১৮৩৯ সালের জানুয়ারি মাসে আরো একটি পরীক্ষা নেবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। পাটনার অফিসবোর্ডে একজন সহকারী নিয়োগের জন্য। এবার পরীক্ষা দিলেন পাঁচ জন। শ্যামচরণ দত্ত কৃতকার্য হলেন এবং আগের চারজনের সঙ্গে তাঁকেও সারটিফিকেট দেওয়া হল। এঁরাই হলেন বঙ্গদেশে প্রথম পাস-করা ডাক্তার।

দ্বারকানাথ ঠাকুর মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের উৎসাহ দেবার জন্য তিন বছরের জন্য বার্ষিক দুহাজার টাকা পুরস্কার দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। শিক্ষা কমিটি সিদ্ধান্ত নেন, শব-ব্যবচ্ছেদ ও রসায়ন শ্রেণীতে পুরস্কার দেওয়ার। ১৮৩৭ সালের ২৯শে জুন প্রথমবার এই পুরস্কার দেওয়া হয়। শব-ব্যবচ্ছেদ শ্রেণীতে 'দ্বারকানাথ পুরস্কার' লাভ করেন রাজকৃষ্ণ দে, ঈশ্বরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামচরণ দত্ত, রামনারায়ণ দাস, পঞ্চানন শ্রীমানী, যাদবচন্দ্র ধাড়া, নবীনচন্দ্র মিত্র, দ্বারকানাথ গুপ্ত,

রামকুমার দত্ত, কালিদাস মুখোপাধ্যায়, পরমানন্দ শেঠ। রসায়ন শ্রেণীতে পুরস্কার পেলেন ঈশ্বরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র মিত্র, রামনারায়ণ দাস, রামকুমার দত্ত, উমাচরণ শেঠ, গোবিন্দচন্দ্র পাল, হরচন্দ্র দাস, সাতকড়ি দত্ত। পরবর্তী যুগে এঁদের সকলেই চিকিৎসক হিসাবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন।

উমাচরণ শেঠ পরীক্ষায় প্রথমস্থান অধিকার করেন। সেজন্য লর্ড অকল্যাণ্ড তাঁকে একটি সোনার ঘড়ি পুরস্কার দেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রত্যেককে পুরস্কৃত করেন। এই সময় দেশের নানা জায়গায় সরকারী এবং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় অনেকগুলি হাসপাতাল ও ডিসপেনসারি স্থাপিত হয়। মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করার পরই ডাক্তারদের সরকারী ডিসপেনসারিতে সাব-অ্যাসিস্টাণ্ট সার্জন পদে নিয়োগ করার ব্যবস্থা হয় এবং তাঁদের মাসিক বেতন নির্ধারিত হয় একশত টাকা। উমাচরণ শেঠ ১৮৩৯ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আগ্রা ডিসপেন-সারিতে যোগ দেন। পরে বর্ধমান, কানপুর, গাজীপুর, মির্জাপুর, নৈনিতাল, ফতেপুর প্রভৃতি জায়গায় কাজ করেন। দীর্ঘ ৩৪ বছর কাজ করার পর তিনি অবসর গ্রহণ করেন। উমাচরণ শেঠের বংশধরদের প্রদত্ত একটি তৈল চিত্র মেডিকেল কলেজে উন্মোচিত হয় ১৯২২ সালের ১লা জুলাই। উমাচরণের জন্ম ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে, কলকাতার জোড়াসাঁকোর ৬৯ নং রতন সরকার স্ট্রীটে। তিনি হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। তাঁর মৃত্যু হয় ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে।

রাজকৃষ্ণ দে খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন। মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ তাঁর রিপোর্টে যে চারজন বিশিষ্ট এবং সাহসী ছাত্রের দ্বারা প্রথম শব-ব্যবচ্ছেদের কথা উল্লেখ করেছিলেন, সেই চারজনের মধ্যে রাজকৃষ্ণ দে অন্যতম। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার অনেক অনুসন্ধান করে এবং উমাচরণ শেঠ ও দ্বারকানাথ গুপ্তর সঙ্গে কথা বলে নিশ্চিত হয়েছিলেন যে ছাত্রদের মধ্যে রাজকৃষ্ণ দে-ই প্রথম শব-ব্যবচ্ছেদ করেন। রাজকৃষ্ণ দে দিল্লীতে সরকারী কাজে নিযুক্ত হন। কিন্তু সেখানে মাত্র এক বছর কাজ করার পর তাঁর মৃত্যু হয় ১৮৪০ সালের ২৮শে

সেপ্টেম্বর। একটি উজ্জ্বল সম্ভাবনা অকালে বিনষ্ট হয়ে যায়। লর্ড অকল্যাণ্ড রাজকৃষ্ণ দে-র বিধবা স্ত্রীকে ৩০০ টাকা সাহায্য দেন।

নবীনচন্দ্র মিত্র নিযুক্ত হন লক্ষ্ণৌ-এর ডিসপেনসারিতে। পরে আসেন কালনায়। সুচিকিৎসক হিসাবে তাঁর নাম ছিল। তবে এই চারজনের মধ্যে দ্বারকানাথ গুপ্ত বা ডি. গুপ্তের মতো যশ ও অর্থ আর কেউ অর্জন করতে পারেননি। প্রথমদিকে তিনি 'কাকরেল কোম্পানির হাউসে' চিকিৎসক নিযুক্ত হন। তিনি দ্বারকানাথ ঠাকুরের পারিবারিক চিকিৎসকও ছিলেন। তাঁর প্রধান কৃতিত্ব এদেশের লোকদের জন্য ঔষধালয় স্থাপন। কাকরেল কোম্পানির সাহেবদের সহায়তায় তিনি ইংল্যাণ্ড থেকে উৎকৃষ্ট ওষুধপত্র আনান এবং দেশীয় লোকরা যাতে ন্যায্য মূল্যে এইসব ওষুধ কিনতে পারে, তার চেষ্টা করেন। তাঁর সাফল্যের মূল কারণ ম্যালেরিয়া রোগের ওষুধ প্রস্তুত করা। ডি. গুপ্তের ছাপমারা ওষুধের বোতল সে-সময় বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে দেখা যেত।

তখনো ম্যালেরিয়া রোগের সঠিক কারণ জানা যায়নি। ম্যালেরিয়ার জীবাণু আবিষ্কৃত হয় ১৮৮০ সালে। আলজিয়ার্সে কাজ করার সময় সেনাবাহিনীর সার্জন লেভারণ (Laveran) এই জীবাণু আবিষ্কার করেন। এই রোগ কীভাবে ছড়ায়, তা আবিষ্কৃত হয় আরো পরে। ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসের ডাক্তার রোনাল্ড রস আবিষ্কার করেন মশা ম্যালেরিয়া রোগ ছড়ায়। ম্যালেরিয়া রোগের উৎপত্তির কারণ অজ্ঞাত থাকলেও এরোগে সিঙ্কোনার ব্যবহার অনেক আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। ১৬৩৮ সালে পেরুতে নিযুক্ত ভাইসরয়ের স্ত্রী সিঙ্কোনের কাউন্টেস (Countess Anna del Chinchon) জ্বরে অসুস্থ হয়েছিলেন। এক বন্ধু একটি গাছের বাকল পাঠালেন ভাইসরয়ের কাছে। এই বাকলের রস খেয়ে কাউন্টেস সুস্থ হয়ে উঠলেন। কাউন্টেস যখন স্পেনে ফিরে এলেন সঙ্গে নিয়ে এলেন ঐ গাছের প্রচুর বাকল।

এগারজন পরীক্ষার্থীর মধ্যে যে সাতজন প্রথমবার উত্তীর্ণ হতে পারেননি, তাঁরাও পরে যশস্বী হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে বুধেনচন্দ্র চৌধুরীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৮৪১ সালে শেষ পরীক্ষায়

উত্তীর্ণ হন এবং সরকারী কাজে যোগ দেন হুগলি ইমামবরা হাসপাতালে সাব-অ্যাসিস্টান্ট পদে। ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত এখানে কাজ করে অবসর গ্রহণ করেন এবং হুগলিতেই স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকেন। চিকিৎসায় তাঁর বিরাট পসার হয়েছিল। তাঁর মৃত্যু হয় ১৯০৭ সালে, ৯৭ বছর বয়সে।

সেকালের অন্যান্য যশস্বী চিকিৎসকদের মধ্যে ছিলেন—সূর্যকুমার গুডিব চক্রবর্তী, প্রসন্নকুমার মিত্র, দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রকুমার দে, মহেন্দ্রলাল সরকার, জগবন্ধু বসু, তামিজ খান, রাজেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র, সূর্যকুমার সর্বাধিকারি, অন্নদাচরণ খাস্তগির প্রভৃতিরা। এঁরা যে শুধু সুচিকিৎসক হিসাবেই বিখ্যাত ছিলেন তাই নয়, বাংলার নবজাগরণে এঁদের অনেকেরই কিছু না কিছু অবদান ছিল। সূর্যকুমার চক্রবর্তী প্রথম চারজন বাঙালীর একজন, যাঁরা ইংল্যাণ্ডে ডাক্তারি পড়তে গিয়েছিলেন। পরবর্তী অধ্যায়ে তাঁদের সম্বন্ধে পৃথকভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

১৮৫৭ সনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে মেডিকেল কলেজ এর অনুমোদন লাভ করে। আগে ডাক্তারি পরীক্ষায় পাশ করলে কলেজের অধ্যক্ষ উত্তীর্ণ ছাত্রদের জি এম. সি. বি. অর্থাৎ 'গ্রাজুয়েট মেডিকেল কলেজ বেঙ্গল' উপাধি দিতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনের পর মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের এল. এম. এস. অর্থাৎ 'লাইসেনসিয়েট ইন মেডিসিন এণ্ড সার্জারি'; এম. বি. অর্থাৎ 'ব্যাচলর অব মেডিসিন' এবং এম. ডি. অর্থাৎ 'ডক্টরেট অব মেডিসিন'—উপাধি দেওয়ার নিয়ম প্রবর্তিত হয়। এম. ডি. হওয়ার জন্য বি. এ পাশ করা আবশ্যিক ছিল।

চন্দ্রকুমার দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এম. ডি.। তাঁর জন্ম ১৮৩০ সালে। তিনি মেডিকেল কলেজের কৃতী ছাত্র ছিলেন। ১৮৬২ সালে এম. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। অতি অল্পদিনেই চিকিৎসকরূপে তাঁর সুখ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কেশবচন্দ্র সেন মেয়েদের

বিবাহযোগ্য নিম্নতম বয়স স্থির করার জন্য কয়েকজন চিকিৎসকের অভিমত চেয়ে পাঠালে চন্দ্রকুমার দে তা চোদ্দ বছর বলে নির্ধারণ করেন এবং ব্রাহ্মসমাজে বিবাহযোগ্য বয়স হিসাবে চোদ্দ বছর মেনে নেওয়া হয়। ৫৬ বছর বয়সে ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে চন্দ্রকুমার দে-র মৃত্যু হয়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় এম. ডি-কে নিয়ে সেযুগে যত আলোড়ন উঠেছিল, চিকিৎসক-সমাজে তত আলোড়ন আর কাউকে নিয়ে হয়নি। সেই ব্যক্তিটি হলেন স্বনামধন্য মহেন্দ্রলাল সরকার। মহেন্দ্রলালের জন্ম ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দের ২রা নভেম্বর। পৈতৃক নিবাস হাওড়ার কাছে পাইকপাড়ায়। তাঁর পিতার নাম তারকনাথ সরকার। মহেন্দ্রলালের বয়স যখন মাত্র পাঁচ বছর, তখন তিনি পিতৃহীন হন। তাঁর মা তাঁকে নিয়ে চলে আসেন কলকাতার নেবুতলায় তাঁর ভাইদের বাড়িতে। মহেন্দ্রলাল দুই মামা ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ ও মহেশচন্দ্র ঘোষের তত্ত্বাবধানে লালিত হতে থাকেন। কিন্তু তাঁর বয়স যখন মাত্র নয় বছর, তখন তাঁর মাতারও মৃত্যু হয়।

সেকালের প্রথানুসারে মহেন্দ্রলালকে লেখাপড়া করতে হয় গুরু মহাশয়ের পাঠশালায়। তারপর তিনি ভর্তি হন হেয়ার স্কুলে। ১৮৪৯ সালে এলেন হিন্দু কলেজে। অসাধারণ মেধা এবং অধ্যবসায়ের গুণে তিনি হিন্দু কলেজের অধ্যাপকদের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। বিজ্ঞানে, বিশেষ করে গণিতে, তাঁর আগ্রহ ছিল সবচেয়ে বেশি। তাই ১৮৫৫ সালে তিনি যখন মেডিকেল কলেজে ভর্তি হলেন, তখন অনেকে বিস্মিত হলেন, কেউ কেউ তাঁর উপর বিরূপও হলেন। চিকিৎসা-বিদ্যা একটি পেশাগত শিক্ষা এবং সে শিক্ষা অনেক সময় বিজ্ঞানের চর্চা ব্যাহত করে। হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষও ভাবলেন, মেডিকেল কলেজে মহেন্দ্রলালের প্রতিভার অপচয় হবে মাত্র। তিনি মহেন্দ্রলালকে বাধা দিলেন। কিন্তু মহেন্দ্রলাল অনেক চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিতেন এবং একবার কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছালে তাতে অবিচল থাকতেন। এ তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। পরবর্তী ঘটনাগুলিতেও এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

মেধা ছাড়া মহেন্দ্রলালের আর একটি গুণ ছিল, যা মেডিকেল

কলেজে বিশেষ কাজে লাগে। তা হল অধ্যবসায়। অসাধারণ পড়ুয়া ছেলে ছিলেন তিনি। যখন তিনি মেডিকেল কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র, তখন একটি মজার ঘটনা ঘটে। তাঁর কোনো আত্মীয়ের চোখ দেখাবার জন্য তিনি হাসপাতালে গিয়েছিলেন। সেখানে চক্ষুরোগের অধ্যাপক ডাঃ আর্চার পঞ্চম বর্ষের ছাত্রদের পড়াচ্ছিলেন। তিনি ছাত্রদের চোখের বিষয়ে একটি প্রশ্ন করেন। প্রশ্নটি কঠিন ছিল, উত্তর দিতে না পেরে ছাত্ররা চুপ করে রইল। মহেন্দ্রলাল দূরে দাঁড়িয়ে শুনছিলেন। তিনি সেখানে দাঁড়িয়েই প্রশ্নটির উত্তর দিলেন। ডাঃ আর্চার যখন শুনলেন, ছেলেটি দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র, তখন তাঁর বিস্ময়ের সীমা রইল না। তিনি আরো অনেক জটিল প্রশ্ন করলেন, মহেন্দ্রলাল প্রতিটি প্রশ্নের ঠিক ঠিক জবাব দিলেন। ডাঃ আর্চার এই তরুণ ছাত্রের জ্ঞানে এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তিনি একদিন মহেন্দ্রলালকে দিয়ে ছাত্রদের সামনে 'আলোকবিদ্যা' (optics) সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়ালেন। কোনো দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রকে দিয়ে আলোক বিদ্যা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়ানো এক অসাধারণ ঘটনা।

১৮৬০ সালে মহেন্দ্রলাল এল. এম. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। মেডিসিন, সার্জারি ও মিডওয়াইফারিতে অনার্স পেলেন এবং প্রায় সব কয়েকটি পদক লাভ করলেন। ১৮৬৩ সালে তিনি এম. ডি. পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হলেন। মেডিকেল কলেজে পড়ার সময়ই তাঁর বিবাহ হয়। যে বছর এল. এম. এস. পাশ করেন, সে বছর তাঁর একমাত্র পুত্র অমৃতলালের জন্ম।

মহেন্দ্রলালের প্রতিভার দীপ্তি ও চারিত্রিক দৃঢ়তা কর্মক্ষেত্রে বিকশিত হতে লাগল। অল্প দিনেই তিনি চিকিৎসক-সমাজের প্রথম সারিতে আসন পেলেন। এই সময় ডাঃ সূর্যকুমার চক্রবর্তীর উদ্যোগে কলকাতায় 'ব্রিটিশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনে'র বঙ্গদেশীয় শাখা স্থাপিত হয়। মহেন্দ্রলাল এই শাখার সম্পাদক হন। তিন বছর তিনি এই পদে কাজ করেন। পরে সহ-সভাপতি হন। সমস্ত পৃথিবী জুড়েই চিকিৎসা-বিজ্ঞান তখন নতুন-নতুন আবিষ্কারের দ্বারা সমৃদ্ধ হচ্ছিল।

ডাঃ মহেন্দ্রলালের মতো প্রতিভাবান ব্যক্তি এই সব আশ্চর্য আবিষ্কারে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন সন্দেহ নেই। আবার এই সময়ই আর এক ধরনের চিকিৎসা জার্মানির হ্যানিম্যান সাহেব প্রবর্তন করলেন। বেশ কিছু মানুষ এই চিকিৎসায় আকৃষ্ট হয়েছিল, কারণ এতে খরচ খুব কম। মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম সভাতেই মহেন্দ্রলাল এই হোমিওপ্যাথিকে 'হাতুড়ে চিকিৎসা' বলে তীব্র আক্রমণ করলেন।

কিছুদিন পর মর্গানের লেখা 'হোমিওপ্যাথির দর্শন' নামে একটি গ্রন্থ মহেন্দ্রলালের হাতে আসে। এই গ্রন্থটি পাঠ করার পর তাঁর চিন্তাধারার পরিবর্তন হতে থাকে। তিনি আকৃষ্ট হলেন হোমিওপ্যাথিতে। ১৮৬৭ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে ব্রিটিশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক অধিবেশনে গোপালচন্দ্র রায় এবং মহেন্দ্রলাল সরকার প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রথমে পাঠ করলেন গোপাল চন্দ্র রায় 'সাব-অ্যাসিস্টান্ট সার্জনদের অবস্থা'। পরে পাঠ করলেন মহেন্দ্রলাল সরকার। তাঁর প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ছিল : চিকিৎসা-বিদ্যার অনিশ্চয়তা এবং রোগ ও তার প্রতিকার। মহেন্দ্রলাল স্থান-কাল বিবেচনা না করে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসাকে নিন্দা ও হোমিওপ্যাথির গুণগান করলেন। প্রবন্ধ পাঠের শেষে তিনি কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হলেন। সাহেব ডাক্তাররা তো রেগে আগুন হলেনই, লব্ধপ্রতিষ্ঠ বাঙালী ডাক্তার জগবন্ধু বসুও ডাঃ সরকারকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন। যে দু-একজন ডাঃ সরকারের পক্ষ নিয়ে কথা বললেন, তাঁদের কথাও কারো কানে ঢুকল না। সভাপতি সূর্য কুমার চক্রবর্তী কিছুটা নিরপেক্ষভাবে সভার কাজ চালাতে চেষ্টা করলেন এবং ডাক্তার সরকারকে কারো কারো সমালোচনার উত্তর দেবার সুযোগ দিতে চাইলেন। কিন্তু ডাঃ ওয়ালার চিৎকার করে উঠলেন —ডাঃ সরকার! আর যদি একটি কথা বল, তবে তোমাকে এখান থেকে বের করে দেব। শিবনাথ শাস্ত্রী সে অবস্থার সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন—

'সভামধ্যে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় সভ্যগণের ক্রোধ-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইল। ডাক্তার সরকার সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা লইয়া ধীর,

গম্ভীরভাবে গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। বাড়িতে আসিয়া বলিলেন—আমি চাষার ছেলে, না হয় সামান্য কাজ করে খাব, তাতে আর কি? সত্য যা তা বলতেই হবে ও করতেই হবে। ওদিকে সংবাদপত্রের স্তম্ভ সকল এই বার্তাতেই পূর্ণ হইতে লাগিল। মেডিকেল মিশনারী ডাক্তার রবসন তাঁহার বিরুদ্ধে এক বক্তৃতা করিলেন। ডাঃ ইওয়ার্ট সংবাদপত্রে অস্ত্রধারণ করিলেন এবং চিকিৎসকরা একবাক্যে তাঁহাকে বর্জন করিলেন। শহর তোলপাড় হইয়া যাইতে লাগিল। ডাঃ সরকারের পসার কিছুদিনের জন্য মাটি হইয়া গেল। ছয়মাসের মধ্যে তিনি একটিও রোগী পাইলেন না। কিন্তু তিনি নির্ভীকচিত্তে দণ্ডায়মান রহিলেন। যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছেন, তাহা ঘোষণা করিতে বিরত হইলেন না। [শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ-সমাজ]

মহেন্দ্রলাল চিকিৎসক-সমাজের দ্বারা যেভাবে লাঞ্ছিত ও বর্জিত হলেন, অন্য কেউ হলে হয়ত একেবারে ভেঙে পড়তেন। কিন্তু মহেন্দ্রলালের চরিত্র অন্য ধাতুতে গড়া। এ ঘটনা না ঘটলে তিনি হোমিওপ্যাথি পুরোপুরি গ্রহণ করতেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় অনুশোচনা করার বা ফিরে যাওয়ার কোনো পথ ছিল না। মহেন্দ্রলাল মানবকল্যাণের এক বিরাট প্রবাহ থেকে দূরে সরে গেলেন বটে, তবে বিজ্ঞান-সাধনা অব্যাহত রইল। বিজ্ঞানের প্রেরণায় গড়ে তুললেন 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর কালটিভেশন অব সায়েন্স।' জীবিকার জন্য হোমিওপ্যাথি আর বিজ্ঞান সাধনার জন্য 'বিজ্ঞান সভা'। তাঁর একক চেষ্টায় একটি মেডিকেল জার্নাল প্রকাশিত হয়—'ক্যালকাটা জার্নাল অব মেডিসিন'। কলকাতার শেরিফ হয়েছিলেন তিনি। চিকিৎসকদের মধ্যে তিনিই প্রথম শেরিফ। মহেন্দ্রলালের সঙ্গে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সান্নিধ্যের বিবরণ 'কথামৃত'র পাঠকমাত্রেরই জানা। কথামৃতের অনেকগুলি পাতা জুড়ে রামকৃষ্ণ-মহেন্দ্রলালের কথোপকথন বর্ণিত আছে। ১৯০৪ খৃস্টাব্দে ২৩শে ফেব্রুয়ারি এই মনীষীর মৃত্যু হয়।

ডাঃ মহেন্দ্রলালের সমবয়সী সে-যুগের আর একজন বিখ্যাত

চিকিৎসক ছিলেন সূর্যকুমার সর্বাধিকারী। সূর্যকুমার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেকালটি অব মেডিসিনের প্রথম ভারতীয় 'ডীন'। সর্বাধিকারীদের বাড়ি হুগলী জেলার রাধানগর গ্রাম। সর্বাধিকারী-বাটির পাশেই রামমোহন রায়ের বসতবাটি। সূর্যকুমারের পিতার নাম যদুনাথ সর্বাধিকারী।

১৮৩২ সালের ৩১শে ডিসেম্বরে রাধানগর গ্রামে সূর্যকুমারের জন্ম হয়। যদুনাথের আট পুত্রের মধ্যে সকলেই যশস্বী। তবে জ্যেষ্ঠ প্রসন্নকুমার, দ্বিতীয় সূর্যকুমার এবং চতুর্থ রাজকুমারের নাম বিশেষ পরিচিত। বাল্যকাল থেকেই সূর্যকুমারের তীক্ষ্ণ মেধার পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দু কলেজে পড়ার পর তিনি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করে বেরুবার পর তিনি সরকারী কাজে যোগ দেন। প্রথমেই তাঁকে যেতে হয় ব্রহ্মদেশে। তারপর যান কোয়েটায়। পরে আসেন গাজীপুরে। গাজীপুরে এমন অনেক ঘটনা ঘটে যেগুলি থেকে সূর্যকুমারের সাহস, দেশপ্রেম এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় মেলে।

গাজীপুরে অল্পদিনের মধ্যেই সূর্যকুমার চিকিৎসক হিসাবে যশস্বী হয়ে ওঠেন। তিনি 'ব্রিগ্রেড সার্জন' পদে নিযুক্ত হন। একজন দেশীয় ডাক্তারের এত খ্যাতি ও প্রতিপত্তি সাহেব ডাক্তার ও সৈনিকদের ঈর্ষার কারণ হয়। তারা কেবলই সুযোগ খুঁজতে থাকে, যাতে তাঁকে অপদস্থ করা যায়। সাহেবদের এই মনোভাব জেনারাল নীলের (Genl. Neel) অজানা ছিল না। তিনি চিকিৎসক হিসাবে সূর্যকুমারকে খুব খাতির করতেন। একদিন কুচকাওয়াজের সময় সূর্যকুমারের প্রতি তাঁর আস্থা প্রদর্শনের জন্য সকলের সামনে তাঁর শরীরের একটি বিস্ফোটক অস্ত্র করালেন। সাহেব ডাক্তার উপস্থিত থাকতেও একজন দেশীয় ডাক্তার দিয়ে অস্ত্র করাবার ফলে সৈনিকগণ সূর্যকুমারের জয়ধ্বনি করে ওঠে।

সিপাহী বিদ্রোহ প্রশমিত হয়ে আসার সময় একটি ঘটনা ঘটে, যা থেকে তাঁর সাহস ও বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়। সিপাহীদের শাস্তি দেওয়া শুরু হয়েছে। বহু নিরীহ লোককেও বিদ্রোহী ভেবে

শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। একদিন রাত্রে অনেক লোকের আর্তনাদে সূর্য-কুমারের ঘুম ভেঙে গেল, কী ব্যাপার দেখার জন্য ঘটনাস্থলে গিয়ে উপস্থিত হলেন। দেখলেন একদল দেশীয় লোককে ফাঁসি দেওয়ার উদ্যোগ হচ্ছে। শুনলেন, এরা নাকি বিদ্রোহী দস্যু। সূর্যকুমারের মনে সন্দেহ দেখা দিল। তিনি খোঁজ নিয়ে দেখলেন, এক মারাত্মক ভুল করা হচ্ছে। আসলে এরা বরযাত্রীর দল। সূর্যকুমার অনেক কষ্টে তরুণ ইংরেজ কাপ্তেনকে বোঝালেন—এরা বিদ্রোহী নয়। বরযাত্রীর দল মুক্তি পেল। এদের মধ্যে সত্যি একজন বিদ্রোহী ছিল। তার নাম ভূপাল সিং। সে ডাঃ সর্বাধিকারীর কাজে এতই অভিভূত হল যে ডাক্তার সাহেবকে আর ছাড়ল না, চিরদিন তাঁর সেবক হয়ে রইল।

তেজস্বী স্বাধীনচেতা ডাঃ সর্বাধিকারীর পক্ষে সাহেবদের দাসত্ব করা ক্রমেই দুঃসহ হয়ে উঠছিল। অবশেষে তিনি চাকরি ছেড়ে দিলেন। প্রথমে শ্রীরামপুরে প্র্যাকটিস শুরু করেন, পরে আসেন কলকাতায়। অতি অল্পদিনেই তাঁর নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। শল্য ও ভেষজ দু'রকম চিকিৎসাতেই তিনি অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন।

তখন কলকাতা ও তার আশেপাশে চারজন ডাক্তারের বিশেষ নাম-ডাক ছিল। স্যার সুরেন্দ্রনাথের পিতা ডাঃ দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বৌবাজারের ডাঃ জগবন্ধু বসু, ডাঃ চন্দ্রকুমার দে এবং সূর্যকুমার সর্বাধিকারী। ডাঃ সর্বাধিকারী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হন এবং মেডিসিন ফেকালটির ডীন হন। এক সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলোদের মধ্যে ছয়জন ছিলেন সর্বাধিকারী-পরিবারের। তাঁরা হলেন—প্রসন্নকুমার, সূর্যকুমার, রাজকুমার, দেবপ্রসাদ, সুরেশপ্রসাদ এবং জ্যোতিপ্রসাদ। উনিশ শতকের শেষভাগে বে-সরকারী প্রচেষ্টায় 'কলেজ অব ফিজিশিয়ন অ্যাণ্ড সার্জন' প্রতিষ্ঠিত হলে সূর্যকুমারকে তার পরিচালক-সমিতির সভাপতি করা হয়।

তখনকার দিনে মেডিকেল কলেজ এবং ক্যাম্পবেল স্কুল ছিল সরকার দ্বারা পরিচালিত। এগুলিতে সাহেব ডাক্তারদের প্রতাপ এতই বেশি ছিল যে দেশীয় ডাক্তারদের প্রতিভা বিকাশের নানা অন্তরায় ছিল।

বেসরকারী প্রচেষ্টায় প্রথম মেডিকেল স্কুল স্থাপিত হয় ১৮৮৬ সালে রাজাবাজারে এক বাড়িতে। এই স্কুলে পড়ানো হত বাংলা ভাষার মাধ্যমে। বিখ্যাত চক্ষুরোগবিশেষজ্ঞ রায় বাহাদুর ডাঃ লালমাধব মুখোপাধ্যায় হলেন স্কুলের পরিচালক সমিতির সভাপতি এবং রাধাগোবিন্দ কর হলেন সম্পাদক। এই স্কুল বেলগাছিয়ায় স্থানান্তরিত হয় ১৯০৩ সালে। কলেজ অব ফিজিশিয়ন অ্যাণ্ড সার্জন স্থাপিত হয় ১৮৯৫ সালে। মেডিকেল স্কুল বেলগাছিয়ায় স্থানান্তরিত হওয়ার পর কলেজ অব ফিজিসিয়ন অ্যাণ্ড সার্জনও এর সঙ্গে যুক্ত হয় এবং এর নাম হয় 'ক্যালকাটা মেডিকেল স্কুল অ্যাণ্ড কলেজ অব ফিজিসিয়ন অ্যাণ্ড সার্জন'। এইভাবে বর্তমান আর জি. কর. মেডিকেল কলেজের গোড়া-পত্তন হয়।

ডাঃ সূর্যকুমার সর্বাধিকারী যেমন প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন, তেমনি দানও করেছেন অকাতরে। কত দরিদ্র ছাত্র তাঁর অকৃপণ দানে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কত নিরাশ্রয় তাঁর কাছে আশ্রয় পেয়েছে তার সঠিক কোনো হিসেব নেই।

সূর্যকুমার ছিলেন কর্মব্যস্ত চিকিৎসক, কিন্তু সাহিত্যের প্রতি তাঁর যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। বিদ্যাসাগর, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিহারীলাল চক্রবর্তী, রঙ্গলাল, মাইকেল প্রমুখ সেকালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণ সূর্যকুমারের বাড়িতে আসতেন। সূর্যকুমার এবং তাঁর অগ্রজ প্রসন্নকুমার উচ্চশিক্ষা তথা বিজ্ঞান-শিক্ষার বাহন হিসাবে বাংলাভাষা ব্যবহারের চেষ্টা করেন এবং সেজন্য বৈজ্ঞানিক পরিভাষাও প্রস্তুত করেন। প্রসন্নকুমার বাংলায় সর্বপ্রথম পাটিগণিত ও বীজগণিত প্রণয়ন করেন।

১৯০৪ সালে জানুয়ারি মাসে মধুপুরে সূর্যকুমারের মৃত্যু হয়। তাঁর আটপুত্রের মধ্যে তিনজন ভারতবিখ্যাত—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বে-সরকারী উপাচার্য স্যার দেবপ্রসাদ, প্রসিদ্ধ শল্য চিকিৎসক কর্ণেল সুরেশপ্রসাদ এবং আই. এফ. এ-র জনক 'ক্রীড়া-সম্রাট' নগেন্দ্রপ্রসাদ।

চিকিৎসকদের মধ্যে সমাজ-সংস্কারে যাঁরা অগ্রণী ছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্নদাচরণ খাস্তগিরের এবং দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অন্নদাচরণ ব্রাহ্ম-সমাজের উৎসাহী কর্মী ছিলেন। নারীর মুক্তি ও অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে দুর্গামোহন দাস, গুরুচরণ মহলানবিশ, রজনীনাথ রায়, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও অন্নদাচরণ খাস্তগির এক প্রগতিশীল দল গড়ে তোলেন। সে সময় ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় মহিলাদের বসার স্থান ছিল পর্দার আড়ালে। ডাঃ খাস্তগিরের দল একদিন উপাসনার সময় বাড়ির স্ত্রীলোকদের পর্দার বাইরে সকলের সঙ্গে বসিয়ে দিলেন। এতে ব্রাহ্মসমাজের রক্ষণশীল দল উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। কেশবচন্দ্র সেনও বিশেষ অসন্তুষ্ট হন। প্রগতিশীল দল তখন অন্নদাচরণের গৃহে নতুন সমাজ স্থাপন করে উপাসনার ব্যবস্থা করেন।

অন্নদাচরণ চিকিৎসক হিসাবে যশস্বী ছিলেন এবং যে কতিপয় বাঙালী চিকিৎসক সেযুগে গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখতেন, তাঁদের মধ্যে অন্নদাচরণ ছিলেন অন্যতম। গভর্নর জেনারেল লর্ড নর্থব্রুক একবার ঘোষণা করলেন, বর্ধমান অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার অত্যধিক প্রকোপের কারণ সম্বন্ধে যিনি সবচেয়ে ভাল প্রবন্ধ লিখতে পারবেন, তাঁকে একটি পুরস্কার দেওয়া হবে। পুরস্কারের লোভে সাহেব এবং দেশীয় বহু ডাক্তার এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিলেন। অন্নদাচরণের ইংরেজি প্রবন্ধ শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হল এবং তিনিই এই পুরস্কার পেলেন।

অন্নদাচরণ বাংলাতেও অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর ভাষা ছিল মনোজ্ঞ। বাংলায় রচিত তাঁর বিরাট গ্রন্থ 'মানব-জন্মতত্ত্ব ও ধাত্রীবিদ্যা' এবং 'নবপ্রসূত শিশুর পীড়া ও চিকিৎসা এবং স্ত্রীজাতির ব্যাধি সংগ্রহ' মেডিকেল কলেজের বাংলা বিভাগের ছাত্রদের অবশ্যপাঠ্য ছিল। এ দুটি গ্রন্থ ছাড়াও তিনি লিখেছিলেন 'আয়ুর্বর্দ্ধন', 'শরীর রক্ষণ', 'পারিবারিক সুস্থতা' প্রভৃতি সুখপাঠ্য পুস্তক। চিকিৎসাবিষয়ক একটি পত্রিকাও প্রকাশিত হয় তাঁর উদ্যোগে। ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগির

ও কবিরাজ অবিনাশচন্দ্র কবিরত্নের সম্পাদনায় বাংলা ১২৯১ সালের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হয় 'চিকিৎসা সম্মিলনী' পত্রিকা।

অন্নদাচরণের জন্ম চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার অন্তর্গত সুচক্রদণ্ডী গ্রামে। তাঁর পিতার নাম মুন্‌সি রামচন্দ্র খাস্তগির। স্কুলের শিক্ষা প্রথম দিকে চট্টগ্রাম ইংরেজি স্কুলে। পিতা রামচন্দ্র ছিলেন সরকারী উকিল। তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল অন্নদাচরণ বড় হয়ে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হবে। ছাত্রবৃত্তি পাশ করার পর অন্নদাচরণ চলে গেলেন ঢাকায়। এখানে থাকার সময় এমন এক ঘটনা ঘটে, যার ফলে তাঁর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হওয়ার চেয়ে ডাক্তার হওয়ার আগ্রহ হল বেশি। ঢাকাতে অন্নদাচরণ থাকতেন অন্য দুটি ছেলের সঙ্গে। একটি ছেলের কলেরা হয়ে অবস্থা খুব খারাপ হয়, কিন্তু রাত্রে কোনো ডাক্তার আসতে রাজী হলেন না। ছেলেটির মৃত্যু হল। এই মৃত্যু অন্নদাচরণের মনে ডাক্তার হবার আগ্রহ জাগালো।

অন্নদাচরণ কলকাতায় এসে ভর্তি হলেন মেডিকেল কলেজে। এখানে প্রথম পরীক্ষাতে তিনি প্রথম হলেন। তাঁকে তখন বৃত্তি দিয়ে বিলাত পাঠাবার উদ্যোগ করলেন মেডিকেল কলেজের কর্তৃপক্ষ। কিন্তু তিনি ছিলেন বিবাহিত এবং বিলাত গেলে খ্রীস্টান হবার সম্ভাবনা—এই সব কারণে বিলাত যেতে রাজী হলেন না। অন্নদাচরণের সহপাঠী ছিলেন রাজেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র। তিনি পরীক্ষায় দ্বিতীয় হয়েছিলেন। অন্নদাচরণের পরিবর্তে বিলাত গেলেন রাজেন্দ্রচন্দ্র।

মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করার পর অন্নদাচরণ সরকারী কাজে যোগ দেন এবং মথুরা, বৃন্দাবন ও উত্তর ভারতের বহু জায়গায় কাজ করে আবার আসেন কলকাতায়। মেডিকেল কলেজে কিছুদিন শিক্ষকতাও করেন। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর আন্তরিক সৌহার্দ্য ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উৎসাহে শেষ দিকে তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাও করতেন। ১২৯৪ সালের ৬ই শ্রাবণ ডাঃ খাস্তগিরের মৃত্যু হয়। মৃত্যু সময়ে উপস্থিত থাকতে না পারায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দুঃখের সীমা ছিল না। ডাঃ খাস্তগিরের তিন পুত্র এবং চার কন্যা। দ্বিতীয়া কন্যা

মনোমোহিনীর সঙ্গে কেশবচন্দ্র সেনের জ্যেষ্ঠপুত্র করুণাচন্দ্র সেনের বিবাহ হয়।

স্যার সুরেন্দ্রনাথের পিতা দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ছিল বিচিত্র। ব্যারাকপুরের কাছে পৈতৃক বাসস্থান মণিরামপুরে ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দে তাঁর জন্ম। হিন্দু কলেজে পড়ার সময় তিনি সল্ট বোর্ডের চাকরিতে যোগ দেন। কিন্তু তাঁর পাঠতৃষ্ণা এতই গভীর ছিল যে সল্ট বোর্ডের চাকরি ছেড়ে আবার হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু অর্থের অনটন থাকায় তিনি হেয়ার সাহেবের স্কুলে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। তখন তাঁর বয়স ২১ বছর। এই সময়ে চিকিৎসা-বিদ্যায় তাঁর আগ্রহ জন্মে। স্কুলের অধ্যক্ষের অনুমতি নিয়ে তিনি প্রতিদিন দুঘণ্টা মেডিকেল কলেজে চিকিৎসা-বিদ্যা শিখতে যেতেন। মেডিকেল কলেজে তখন এরকম কিছু ছাত্র নেওয়া হত। পড়াশুনা বেশ চলছিল, কিন্তু হেয়ার স্কুলের নতুন অধ্যক্ষ জোন্স আসার পর দুর্গাচরণ অসুবিধার সম্মুখীন হলেন। নতুন অধ্যক্ষ দু ঘণ্টা ছুটি দেওয়া বন্ধ করে দিলেন। চিকিৎসা-বিদ্যায় দুর্গাচরণের আগ্রহ এতই বেশি যে অর্থাভাব সত্ত্বেও শিক্ষকতা তিনি ত্যাগ করলেন এবং পুরো সময়ের ছাত্র হিসাবে মেডিকেল কলেজে যোগ দিলেন। পাঁচ বছর পড়ার পরও শেষ পরীক্ষা পর্যন্ত অপেক্ষা করার ধৈর্য তাঁর ছিল না। তার আগেই তিনি প্র্যাকটিশে বসে গেলেন।

দুর্গাচরণের সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল। বিদ্যাসাগরের পরামর্শে দুর্গাচরণ কলকাতা কেল্লার খাজাঞ্চির পদ গ্রহণ করেন। বেতন মাসে ৮০ টাকা। সকাল-সন্ধ্যায় চিকিৎসাও করতেন তালতলায়। কিছুদিন পর খাজাঞ্চির কাজ তিনি ত্যাগ করেন এবং একমাত্র চিকিৎসার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। অতি অল্পদিনেই সুচিকিৎসক হিসাবে তাঁর নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

বৌবাজারের নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় গুরুতর অসুস্থ হলে কলকাতার সকল চিকিৎসক তাঁর জীবনের আশা ত্যাগ করেন। দুর্গাচরণের চিকিৎসায় রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেন। সে

সময়কার নবাগত সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার জ্যাক্‌সন দুর্গাচরণের ব্যবস্থাপত্র দেখে আনন্দ প্রকাশ করেন এবং করমর্দন করে বলেন—'তুমি নেটিব জ্যাকসন' (সুবল মিত্র—সরল বাংলা অভিধান)। এই ঘটনার পর তাঁর পসার খুব বেড়ে যায়। সে সময়ে দুর্গাচরণের নামে রোগীর মনে আশার সঞ্চার হত। তিনি ছিলেন তখনকার ধন্বন্তরি।

বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তিনি ইংরেজি শেখাতেন এবং বিধবা-বিবাহ ও অন্যান্য জনহিতকর কাজে সব সময় সাহায্য করতেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথেরও একজন প্রধান সঙ্গী ছিলেন তিনি। দেশের এবং সমাজের কীভাবে উন্নতি হবে, এই ছিল তাঁর চিন্তা। রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'আত্মচরিতে' বলেছেন: 'দুর্গাচরণবাবু সংশয়বাদি ছিলেন। তিনি দেবেন্দ্রবাবুর সঙ্গে এই বিশ্বাসে যোগ দিয়েছিলেন যে ব্রাহ্মধর্মের দ্বারা দেশের উপকার হইবে। দেশের উপকার করা তাঁর প্রাণের ব্রত ছিল। ......দেবেন্দ্রবাবুর ওখান হইতে গাড়িতে বাসায় ফিরিবার সময় তিনি একদিন আমাকে বলেছিলেন—রাজনারায়ণ। চল, আমরা এদেশ হইতে জার্মানি অথবা আমেরিকায় গিয়া বাস করি, এ দেশের কিছু হইবে না। তিনি অভিমান করিয়া ঐ কথা বলিতেন। উহা মনের কথা ছিল না। অভিমান করিয়া ঐ কথা বলিতেন অথচ দেশের উপকারজনক কার্য হইতে বিরত হইতেন না।'

১৮৭০ খ্রীস্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারি দুর্গাচরণের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর মাত্র একঘণ্টা আগে খবর আসে, পুত্র সুরেন্দ্রনাথ আই. সি. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন।

মেডিকেল কলেজের প্রথমদিকে মুসলমান সম্প্রদায়ের ছাত্র সংখ্যা খুবই কম ছিল। ১৮৩৮ সালে যে এগারজন ছাত্র পরীক্ষার্থী ছিলেন, তাঁদের মধ্যে কোনো মুসলমান ছিলেন না। ১৮৫০ সালে ৯৫ জন ছাত্রের মধ্যে মুসলমান ছিলেন ৫ জন। ১৯১৭ সালে প্রকাশিত আজিজুল হক রচিত 'History and Problems of Moslem Education

in Bengal' গ্রন্থে আছে, '১৯১৪ সালে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করছে ৮০০ জন ছাত্র। তাদের মধ্যে মুসলমান ছাত্র মাত্র দশজন। এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার বিহারী।' এ থেকে অনুমান করা যায় ৭৫ বছর আগে অবস্থা কী ছিল এবং বাঙালী মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা কত ছিল।

মেডিকেল কলেজের প্রথম মুসলমান ছাত্র কে বা কারা, তা জানা না থাকলেও সে সময়কার এমন একজন ছাত্রের নাম জানা আছে, যিনি ছিলেন মেডিকেল কলেজের একটি উজ্জ্বল রত্ন, প্রথম 'গুডিব স্কলার'। সেই ছাত্রের নাম তামিজ খান। বস্তুত তামিজ খান এত সর্বজন শ্রদ্ধেয় ছিলেন যে তাঁকে সম্প্রদায় বিশেষের লোক হিসাবে পরিচয় দেওয়া অন্যায়। মৌলভী তামিজ খান জ্ঞানে ও বুদ্ধিমত্তায় মুসলমান সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন সন্দেহ নেই; কিন্তু অন্য সম্প্রদায়ের লোকও তাঁকে যথেষ্ট শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতেন।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন যখন 'ভারত-সংস্কার সভা'র সভাপতি, তখন নারীর বিবাহের ন্যূনতম বয়স কত হওয়া উচিত, এই সম্পর্কে স্থিরনিশ্চয় হওয়ার জন্য ১৮৭১ সালের ১লা এপ্রিল বারোজন দেশী-বিদেশী সুবিখ্যাত চিকিৎসকের নিকট অভিমত চেয়ে পাঠান। তামিজ খান এই বারোজন বিশিষ্ট চিকিৎসকের অন্যতম। প্রসঙ্গত বলা যায়, দেশীয় চিকিৎসকদের মধ্যে অন্যরা হলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এম. ডি. চন্দ্রকুমার দে, দ্বিতীয় এম. ডি. বিজ্ঞান-সাধক মহেন্দ্রলাল সরকার, প্রথম বিলাতফেরত ডাক্তারদের অন্যতম সূর্যকুমার গুডিব চক্রবর্তী এবং নবীনচন্দ্র মিত্র। চন্দ্রকুমার দে চোদ্দ বছর, নবীনচন্দ্র পনের বছর, তামিজ খান, মহেন্দ্রলাল এবং সূর্যকুমার ষোল বছর বিবাহযোগ্য বয়স নির্ধারণ করেন। সে সময় বালবিবাহ বহুল প্রচলিত ছিল। লোকবাধা যাতে খুব প্রবল না হয়, সেজন্য কেশবচন্দ্র সেন নিম্নতম বয়স চোদ্দ বছর নির্ধারণ করেন।

তামিজ খানের জীবন বড় বিচিত্র। অতি সাধারণ অবস্থা থেকে নিজের অধ্যবসায়ের জোরে তিনি সমাজের শীর্ষস্থানে আরোহণ করে-ছিলেন। এমন অবস্থায় অনেকে উদ্ধত স্বভাব এবং অসহিষ্ণু প্রকৃতির

হয়। কিন্তু তামিজ খান বরাবর ছিলেন শান্ত, উদার এবং নম্র স্বভাবের।

তামিজ খানের প্রাথমিক শিক্ষা কলিঙ্গা শাখা স্কুলে। সে সময়ে মুসলমান ছেলেদের শিক্ষার জন্য ছিল 'কলকাতা মাদ্রাসা'। মাদ্রাসায় শুধু সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলেরা শিক্ষালাভের সুযোগ পেত। কলিঙ্গা শাখা স্কুল ছিল দরিদ্র ছেলেদের জন্য। এখানকার শিক্ষা শেষ করে তিনি কাজ নিলেন এক ওষুধের দোকানে। এরপর তিনি যোগ দিলেন মেডিকেল স্টোরে কম্পাউণ্ডার হিসাবে। তখন মেডিকেল স্টোরের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন ডাঃ গ্রাণ্ট। তামিজ মনে মনে চিকিৎসক হবার স্বপ্ন দেখতেন। কম্পাউণ্ডারের বৈচিত্র্যহীন কাজে তাঁর মতো প্রতিভাবান লোকের পক্ষে সন্তুষ্ট থাকা অস্বাভাবিক, ভিতরে ভিতরে তিনি অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিলেন। একদিন ডাঃ গ্রাণ্টের কাছে তিনি তাঁর সুপ্ত বাসনা ব্যক্ত করলেন, মেডিকেল কলেজে পড়তে চান তিনি। সে সময় মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন মৌএট। গ্রাণ্টের চিঠি নিয়ে তামিজ গেলেন মৌএটের কাছে। মৌএট তামিজের সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পারলেন ছেলেটির উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। ভর্তি করে নিলেন তাঁকে।

এবার তামিজের নতুন জীবন শুরু। চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষায় তিনি তাঁর সর্বশক্তি নিয়োজিত করলেন। তিনি প্রায় প্রতিটি পরীক্ষায় প্রথমস্থান অধিকার করতেন। ধাত্রী-বিদ্যা পরীক্ষায় যে ছাত্র সবচেয়ে বেশি নম্বর পেতেন, তাঁকে 'গুডিব বৃত্তি' দেওয়া হত। তামিজ খান প্রথম 'গুডিব স্কলার'। ১৮৪৬ সালে তিনি এই বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৪৭ সালের পুরস্কার বিতরণী সভার বিবরণে জানা যায়, ডিপ্লোমাধারী ছাত্রদের মধ্যে তামিজ খান প্রথম এবং কেদারনাথ দে দ্বিতীয় হয়েছিলেন। লর্ড হার্ডিঞ্জ-প্রদত্ত ২০০ টাকার এবং ডাক্তার জ্যাকসন-প্রদত্ত ১০০ টাকার পুস্তক তামিজ পেয়েছিলেন। গভর্নমেণ্ট-প্রদত্ত সাধারণ ব্যুৎপত্তিবিষয়ক স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন কেদারনাথ দে। সে সময়ে মেডিকেল কলেজের পুরস্কার বিতরণী সভায় কলকাতার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকতেন।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরই তামিজ খান সাব-অ্যাসিস্টান্টের চাকরি নিয়ে কুমায়ুন অঞ্চলে যান। সেখান থেকে আসেন লাহোরে। ইয়োরোপীয় ভেষজবিজ্ঞান সম্বন্ধে সেখানকার অধিবাসীদের ভাল ধারণা ছিল না। তামিজের চেষ্টায় লাহোরে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হয় এবং তাঁর সুচিকিৎসায় ও অমায়িক ব্যবহারে এই চিকিৎসালয় অল্পদিনের মধ্যেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

১৮৫২ সালে তামিজ খান বদলি হয়ে আসেন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে 'হাউস ফিজিশিয়ন' পদে। এই সময়ে মেডিকেল কলেজে তিন রকমের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিল। ইংরেজি ভাষায় শিক্ষা দেওয়া ছাড়া বাংলা ও হিন্দুস্থানীতেও শিক্ষা দেওয়া হত। এই দুটি বিভাগে ৫০ জন করে ছাত্র নেওয়া হত। ভর্তি হওয়ার যোগ্যতা হল, মাতৃ ভাষায় লেখা ও পড়ার জ্ঞান। ১৮৫২ সালে বাংলা বিভাগ খোলা হয়। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ এবং দুজন অধ্যাপক ভাষার ও সাহিত্যের পরীক্ষা নিয়ে ডাক্তারি পড়তে ইচ্ছুক ছাত্রদের যোগ্যতা বিচার করতেন। প্রথমবার ৩০৯ জন ছাত্রের মধ্যে মাত্র ৪০ জন ভর্তির যোগ্য বিবেচিত হয়েছিল। শারীরস্থানের শিক্ষক ছিলেন পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত, ভেষজবিদ্যার প্রসন্ন মিত্র, শস্ত্র-চিকিৎসার রামনারায়ণ দাস এবং ব্যবহারিক ঔষধবিজ্ঞানে (মেটেরিয়া মেডিকা) শিবচন্দ্র কর্মকার। ১৮৫৬ সালে মধুসূদন গুপ্তের মৃত্যু হলে তামিজ খানকে শারীরস্থানের শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়। কিছুকাল পর শিবচন্দ্র কর্মকারও মারা যান। তামিজ খানকে তখন 'মেটেরিয়া মেডিকা'ও পড়াতে হত। বলাবাহুল্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখাতেই তাঁর জ্ঞান ছিল গভীর। ১৮৬৬ সালে ভেষজবিদ্যার শিক্ষক প্রসন্ন মিত্রের মৃত্যু হলে তামিজকে ঐ পদে নিযুক্ত করা হয়।

মেডিকেল কলেজে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির দরুন বাংলা ক্লাস স্থানান্তরিত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। সে সময় শিয়ালদহতে মিউনিসিপালিটির একটি হাসপাতাল ছিল দরিদ্র রোগীদের জন্য। হাসপাতালটি স্থাপিত হয়েছিল ১৮৬৭ সালের ১লা জুলাই। এই হাসপাতালকে কেন্দ্র

করে ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুল স্থাপিত হয় ১৮৭৩ সালের ১লা ডিসেম্বর। প্রথমে নাম ছিল 'শিয়ালদা মেডিকেল স্কুল'। ১৮৭৪ সালে লেফটেনান্ট গভর্নর স্যার জর্জ ক্যাম্পবেলের নামানুসারে স্কুলের নাম হয় 'ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুল'। বাংলা বিভাগে তখন ছাত্রসংখ্যা ছিল ৮৮৩। এই সময় শিক্ষক ছিলেন—ভেষজবিজ্ঞানে তামিজ খান, ধাত্রীবিদ্যায় মির আসরাফ আলি, শল্য চিকিৎসায় রামনারায়ণ দাস, ঔষধ-বিজ্ঞানে জগবন্ধু বসু, রসায়নে কানাইলাল দে এবং শারীরস্থানে চন্দ্রমোহন ঘোষ। এই স্কুল থেকে পাস করলে প্রাকটিস করার লাইসেন্স দেওয়া হত। ১৯১৩ সালে এল. এম পি. ডিপ্লোমা দেওয়ার রীতি প্রবর্তিত হয়। ১৯১৪ সাল থেকে এল. এম. এফ. ডিপ্লোমা দেওয়া হত। এই স্কুলের প্রথম সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন সি. টি. ও. উডফোর্ড। স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৪৮ সালে ক্যাম্পবেল স্কুল 'কলেজে' পরিণত হয় এবং ১৯৫০ সালে এর নাম হয় 'নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ'।

তামিজ খানের চৌত্রিশ বছরের কর্মজীবনের দীর্ঘ পঁচিশ বছর এই স্কুলের সঙ্গে সম্পর্ক। এই স্কুলের সমৃদ্ধির পিছনে যে সব মনীষীর অক্লান্ত পরিশ্রম রয়েছে, তামিজ তাঁদের অন্যতম। তিনি এই স্কুলকে শুধু চাকরিস্থল হিসাবে গণ্য করেননি, একে পরম যত্নে লালন করেছে না প্যাথলজি মিউজিয়মের গোড়াপত্তন তাঁরই হাতে। তিনি বিভিন্ন স্পেসিমেন সংগ্রহ করেছেন এবং নিজের হাতে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন।

তাঁর ছাত্রদের মধ্যে পরবর্তী যুগে যাঁরা যশস্বী হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে নীলরতন সরকার অন্যতম। নীলরতন বরাবর সশ্রদ্ধচিত্তে তামিজের নাম উল্লেখ করতেন। ১৮৮১ সালে তামিজ সরকারী কার্য থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এর কিছুকাল পরেই ১৮৮২ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। কানাইলাল দে ও সূর্যকুমার সর্বাধিকারী তাঁর চিকিৎসা করতেন। কানাইলাল দে শোকসভায় বলেছিলেন, 'মৃত্যুকে যে মানুষ এত প্রশান্তির সঙ্গে গ্রহণ করতে পারে, তামিজকে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত।'

তামিজ খান ক্যালকাটা মেডিকেল সোসাইটির সহ-সভাপতি ছিলেন তিন বছর। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এর কার্যকরী সমিতির সদস্য ছিলেন। সরকার তাঁকে 'খান বাহাদুর' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করে। দেশীয় চিকিৎসকদের মধ্যে তিনিই প্রথম খান বাহাদুর।

তামিজ খান ছাড়া আরো দুজন মুসলমান চিকিৎসক সেযুগে যশস্বী হয়েছিলেন, তাঁরা হলেন মির আসরাফ আলি ও জহিরুদ্দিন আহমেদ। মির আসরাফ আলি ১৮৭৩ থেকে ১৮৭৭ সাল পর্যন্ত ক্যাম্পবেল স্কুলে ধাত্রীবিদ্যা, স্ত্রী চিকিৎসা ও শিশু চিকিৎসার শিক্ষক ছিলেন। তিনি 'বাল-চিকিৎসা' নামে একটি বই লিখেছিলেন।

জহিরুদ্দিন আহমেদ অস্ত্র-চিকিৎসার শিক্ষক ছিলেন ১৮৭৯ থেকে ১৮৯৯ সাল পর্যন্ত। সুশিক্ষক ও সুচিকিৎসক হিসাবে তাঁর খুব নামডাক ছিল। অস্ত্রচিকিৎসায় তিনি ছিলেন নিপুণ। সে সময়ে বাংলা বিভাগে ইংরেজি বই-এর অনুবাদ পড়ানো হত। শিক্ষকরা ইংরেজি বই থেকে অনুবাদ করে নোট নিয়ে আসতেন ক্লাসে এবং তা থেকে পড়ে যেতেন, ছাত্ররা নোট টুকে নিত। এই নোট ছাত্রদের সযত্নে রেখে দিতে হত। জহিরুউদ্দিন এই অসুবিধা দূর করার জন্য 'সার্জারি বা অস্ত্র চিকিৎসা' নামে একটি বই লেখেন (১ম সংস্করণ দেখিনি, ২য় সংস্করণ, ১৮৯৩)। তাঁর আগে রামনারায়ণ দাস 'সার্জারি' অর্থাৎ 'অস্ত্রচিকিৎসা প্রণালী' নামে এবং কাশীচন্দ্র দত্তগুপ্ত 'অস্ত্রচিকিৎসা প্রণালী' নামে বই লেখেন। রামনারায়ণ দাসের বইটি ছিল অসম্পূর্ণ। জহিরুদ্দিনের বইটি ছাত্রদের কাছে অবশ্যপাঠ্য হিসাবে গণ্য হয়। এই বই-এর ভাষা সাবলীল এবং তা ইংরেজি বই-এর অনুবাদবিশেষ নয়। নিজের এবং দেশীয় চিকিৎসক-দের অভিজ্ঞতা তাতে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। জহিরুদ্দিনের একটি তৈলচিত্র ক্যাম্পবেল স্কুলের সেণ্ট্রাল হলে স্থাপন করা হয়।

বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি 'ভিষক-দর্পণ' নামে একটি মাসিক পত্রিকার সম্পাদনা করেন। এই পত্রিকায় সেকালের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকগণ লিখতেন।

হ্যারিসন রোডের উপর সুরেন্দ্রনাথ কলেজের পাশে ছিল তাঁর

বাড়ি। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর অযোগ্য পুত্র পিতার সঞ্চিত সবকিছুই একে একে হারালেন, এমনকি বাড়িটি পর্যন্ত।

ডাঃ হাসান সুরাবর্দি সেকালের নন, বরং সন্দেহাতীতভাবে একালের। তবু এখানে তাঁর কথা সংযোজিত করার একমাত্র কারণ, পারম্পর্য বজায় রাখা। বিশ শতকের প্রথমার্ধে বঙ্গদেশে এমন কয়েকজন চিকিৎসক ছিলেন, সুচিকিৎসক হিসাবে যাঁদের নাম সারা ভারতে বিস্তৃত ছিল—ডাঃ সুরাবর্দি তাঁদের অন্যতম। তিনিই ভারতীয় চিকিৎসকদের মধ্যে প্রথম, যিনি বড়লাটের 'অনারারি সার্জন' পদে নিযুক্ত হওয়ার সম্মান লাভ করেন।

হাসান সুরাবর্দির জন্ম ১৮৮৪-এ বঙ্গদেশের এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারে। তাঁর পিতা মৌলানা ওবেদুল্লা এল. ওবয়দি আরবি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। ডাঃ সুরাবর্দি বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা শহীদ সুরাবর্দির কাকা। পড়াশুনা করেন প্রথমে কলকাতার মাদ্রাসায় এবং পরে মেডিকেল কলেজে। এল. এম. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর কিছুকাল মেডিকেল কলেজে কাজ করেন। উচ্চতর শিক্ষার জন্য পরে যান বিদেশে। ডাবলিন, এডিনবরা ও লণ্ডনে পড়াশুনা করেন। এম.ডি., এফ. আর. সি. এস. এবং ডি. পি. এইচ. ডিপ্লোমা নিয়ে দেশে ফিরে আসেন। প্রথমে কয়েক বৎসর বেঙ্গল মেডিকেল সার্ভিসে কাজ করেন। ১৯১৬ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়েজের ডিষ্টিক্ট মেডিকেল অফিসার পদে নিযুক্ত হন।

ডাঃ সুরাবর্দির জীবন কর্মীর জীবন। চিকিৎসায় নৈপুণ্য, সাংগঠনিক কাজে দক্ষতা, শিক্ষাপ্রসারে উৎসাহ প্রভৃতি তাঁর বহুমুখী কর্মপ্রতিভার নিদর্শন। যখন যে কাজে হাত দিয়েছেন, তাতেই সফল হয়েছেন। ১৯২১-এ তিনি বেঙ্গল ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল আনরেষ্ট এনকোয়ারি কমিটির সদস্য মনোনীত হন। এই কমিটির কাজে তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও দক্ষতার পরিচয় দিয়ে সকলের প্রশংসা অর্জন করেন। ঐ বৎসরেই তৎকালীন বঙ্গীয় আইন পরিষদে সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯২৩-এ হন এর উপাধ্যক্ষ।

ডাঃ সুরাবর্দি ১৯২৮-এ ইণ্ডিয়ান স্টেট রেলওয়েজের মেডিকেল ও হেল্থ বিভাগের প্রধান (সি. এম. ও. এইচ.) হন। ১৯৩৭ পর্যন্ত তিনি এই পদে আসীন ছিলেন। কলকাতার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ১৯২৩-এ স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদোগে এক নতুন নিয়ম প্রবর্তিত হয়। সে সময় ঐ হাসপাতালে ভারতীয় মেডিকেল সার্ভিসের অফিসারদের একচ্ছত্র আধিপত্য। সুরেন্দ্রনাথের চেষ্টায় স্থানীয় খ্যাতনামা চিকিৎসকদের অবৈতনিক চিকিৎসক-পদে নিযুক্ত করা শুরু হয়। ফলে আই. এম. এস-দের আধিপত্য কিছুটা খর্ব হয়। নীলরতন সরকার, সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারী ইতিমধ্যেই প্রমাণ করেছেন, আই. এম. এস না হয়েও নিপুণ চিকিৎসক হওয়া যায়। তবে তাঁরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আই. এম. এস-দের সঙ্গে কাজ করেন নি। নতুন নিয়মে প্রথমবার ডাঃ কৈলাসচন্দ্র বসু ভেষজ চিকিৎসায় এবং ডাঃ হাসান সুরাবর্দি শস্ত্রচিকিৎসায় অবৈতনিক চিকিৎসক-পদে নিযুক্ত হন। এঁদের সরাসরি প্রতিযোগিতা করতে হত আই. এম. এস অফিসারদের সঙ্গে, বলা বাহুল্য, আই. এম. এস. অফিসারদের অনেকেই ছিলেন বিদেশী। এই দুইজন চিকিৎসক এতই দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেন যে পরে আরো কয়েকজন চিকিৎসককে অবৈতনিক ভাবে নিয়োগ করা হয়।

ডাঃ সুরাবর্দি ১৯৩২ থেকে ১৯৩৪ পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যপদে আসীন ছিলেন। তাঁর আগে দেশীয় চিকিৎসকদের মধ্যে একমাত্র নীলরতন সরকার উপাচার্য হয়েছিলেন। ১৯৩২-এরই সমাবর্তন উৎসবে বীণা দাস (ভৌমিক) ছোটলাট স্ট্যানলি জ্যাকসনকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়েন এবং অল্পের জন্য জ্যাকসন বেঁচে যান। ১৯৩৪-এ সুরাবর্দি বড়লাটের 'অনার‍্যারি সার্জন' পদে নিযুক্ত হন। ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৬ পর্যন্ত নবগঠিত 'মেডিকেল কাউন্সিল অব ইণ্ডিয়ার' সহ-সভাপতি রূপে কাজ করেন। এর আগে ভারতে কোন 'মেডিকেল কাউন্সিল' ছিল না। মেডিকেল কাউন্সিলের কাজ হল মেডিকেল কলেজগুলির শিক্ষার মান পরীক্ষা করা ও বিশ্ববিদ্যালয়-প্রদত্ত ডিগ্রিগুলি অনুমোদন করা এবং চিকিৎসকদের নাম তালিকাভুক্ত করা। ১৯২২ পর্যন্ত গ্রেট

ব্রিটেনের জেনারেল মেডিকেল কাউন্সিল ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়-প্রদত্ত ডিগ্রিগুলি স্বীকার করে নিচ্ছিল, তার কারণ শিক্ষকদের প্রায় সকলেই ছিলেন আই. এম. এস.। ১৯২৩ সালে ইংল্যাণ্ডে খুব একটা সোরগোল উঠল ভারতে মায়েদের মধ্যে অস্বাভাবিক মৃত্যুহার নিয়ে। ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা আরো জোরদার করার জন্য অনেকেই মত প্রকাশ করতে লাগলেন। ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা এদেশে কেমন চলছে, তা অনুসন্ধান করার জন্য জেনারেল মেডিকেল কাউন্সিল স্যার নরম্যান ওয়াকার (Sir Norman Walker)-কে পাঠাল। ওয়াকার ইংল্যাণ্ডে ফিরে গিয়ে যে রিপোর্ট দিলেন, তার উপর ভিত্তি করে কাউন্সিল সিদ্ধান্ত নিল—ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দেবার প্রণালী ও পরীক্ষার মান পর্যবেক্ষণের জন্য কাউন্সিল একজন পরিদর্শক পাঠাবেন। তিনি যদি সন্তোষজনক বলে মনে করেন, তবে ডিগ্রি অনুমোদন করা হবে। কাউন্সিল কর্ণেল আর. এ. নীডহাম (Col. R. A. Needham I. M. S.)-কে পরিদর্শক করে পাঠাল। জেনারেল কাউন্সিলের এই সিদ্ধান্ত দেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পক্ষে অপমানজনক। পরিদর্শক-নিয়োগের সিদ্ধান্তে বিশিষ্ট দেশীয় চিকিৎসকগণ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত বিরক্ত হলেন এবং তাঁরা এর প্রতিবাদে সোচ্চার হলেন। কাউন্সিল ১৯২৪-এর ৩০শে নভেম্বর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল ডিগ্রির অনুমোদন প্রত্যাহার করে নিল। আবার ১৯২৭-এ অনুমোদন শুরু হল, কিন্তু ১৯৩০-এ আবার তা প্রত্যাহার করা হল। অবশেষে ১৯৩৩-এর সেপ্টেম্বর মাসে স্থির হল যে ব্রিটেনের জেনারেল কাউন্সিলের অনুকরণে ভারতে একটি মেডিকেল কাউন্সিল স্থাপিত হবে। ডাঃ সুরাবর্দি এর প্রথম সহ-সভাপতি নির্বাচিত হলেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছাড়া ডাঃ সুরাবর্দি আরো নানাভাবে এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। যেমন, ফেকালটি অব মেডিসিনের ডীন, জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিদ্যার অধ্যাপক, আরবি ও পার্শি-ভাষা শিক্ষাবোর্ডের সভাপতি।

শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা জাতির জীবনে অত্যাবশ্যক, ডাঃ সুরাবর্দি

এগুলি যে শুধু নিজে পালন করতেন, তা নয়; চাইতেন দেশবাসী বিশেষ করে ছাত্ররা এগুলি মেনে চলুক। এর ফলে ছাত্রদের চরিত্র সুদৃঢ় হবে। ছাত্রদের মিলিটারি ট্রেনিং নিতে উৎসাহিত করতেন। ১৯৩৭-এ লণ্ডনে যান টেরিটোরিয়াল ফোর্সের মেডিকেল বিভাগের প্রতিনিধিরূপে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেনিং কোরের কমাণ্ডিং অফিসার এবং অর্ডার অব সেণ্ট জন-এর কমাণ্ডার হয়ে যুবসমাজের মনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করতেন। এই সব কাজের পুরস্কারস্বরূপ ডাঃ সুরাবর্দিকে সেনাবাহিনীর লেফটানেণ্ট কর্ণেল পদবী দেওয়া হয়।

ডাঃ সুরাবর্দি ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৪ পর্যন্ত ভারতীয় রাজ্যগুলির লণ্ডনস্থ সেক্রেটারির উপদেষ্টা ছিলেন। কলকাতার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল। তিনি সার্ভেণ্ট অব ইণ্ডিয়া সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। কিছুকাল ব্রিটিশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের কলকাতা শাখার সভাপতি ছিলেন।

ব্যক্তিগত জীবনে ডাঃ সুরাবর্দি ছিলেন ধর্মপ্রাণ, অমায়িক ও বন্ধুবৎসল। সকল সম্প্রদায়ের লোকের সঙ্গে তাঁর প্রীতির সম্পর্ক ছিল। তাঁর সান্নিধ্যে যারা এসেছে, তারা তাঁর মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছে। তাঁর আচরণে স্নিগ্ধতা ও স্থৈর্য সদা পরিস্ফুট। জীবনে দুঃখ কম পাননি, কিন্তু তখনো তিনি অচঞ্চল। তাঁর এক পুত্র ও এক কন্যা। মাত্র চোদ্দ বৎসর বয়সে যক্ষ্মারোগে পুত্রের মৃত্যু হয়। ছাত্রদের মধ্যে কিভাবে যক্ষ্মারোগের প্রকোপ কমান যায়, তা নিয়ে তিনি ভাবতেন। যক্ষ্মারোগের কাজে নিযুক্ত কর্মীদের উৎসাহ দেবার জন্য তিনি একটি শীল্ড দান করেন রেড ক্রসকে, যাতে শ্রেষ্ঠ কর্মীকে এটি পুরস্কার দেওয়া হয়। তিনি বহু দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, সেই সব প্রতিষ্ঠান নিয়মিত তাঁর কাছ থেকে অর্থ সাহায্য পেত।

১৯৪৬-এর ১৮ই সেপ্টেম্বর ৬২ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

প্রথম বিলেত ফেরত ডাক্তার

বিলেত যাওয়া আজকাল এতই সাধারণ ঘটনা যে, পাশের বাড়ির তুবার স্কুল ফাইনাল ফেল-করা ছেলে বিলেত যাচ্ছে শুনলেও আমরা অবাক হই না। চিকিৎসাশাস্ত্রে উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য এখন প্রতি বছর বহু তরুণ বাঙালী বিলেত যায়। কিন্তু উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বিলেত যাওয়া অত সহজ ব্যাপার ছিল না। বিলেত যাওয়ায় সামাজিক বাধা তো ছিলই, তার উপর সমুদ্রযাত্রার অনিশ্চয়তা। এই সব বাধা অতিক্রম করে যাঁরা বিলেত যেতেন, তাঁদের দুঃসাহসের এবং ঐকান্তিকতার অবশ্যই প্রশংসা করতে হয়। তাই প্রথম বিলেত ফেরত বাঙালী ডাক্তার কে বা কারা এ প্রশ্ন অনেকেরই মনে আসে।

মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হবার দশ বছব পর ১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দে ঐ কলেজের চারজন ছাত্র ইংল্যাণ্ডে যান। এই চার জন হলেন—ভোলানাথ বসু, দ্বারকানাথ বসু, গোপালচন্দ্র শীল ও সূর্যকুমার চক্রবর্তী। এঁরা লণ্ডনে চিকিৎসাবিদ্যায় উচ্চশিক্ষা লাভ করে দেশে ফিরে আসেন এবং কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। এঁদের মধ্যে সূর্যকুমার চক্রবর্তীর নাম সবচেয়ে বেশি পরিচিত, কারণ তিনিই ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম আই. এম. এস. ('ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিস')।

এই চারজন তরুণ বাঙালীর ইংল্যাণ্ডে ডাক্তারি পড়তে যাওয়ার পিছনে একটুখানি ইতিহাস আছে।

মিশরে এম. ক্লট বে (M. Klot Bey) ডাক্তারি পড়ার জন্য কয়েকজন মিশরীয় ছাত্রকে প্যারিসে নিয়ে গিয়েছিলেন। কলকাতার মেডিকেল কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ ডাঃ এম. জে. ব্রামলি এই দৃষ্টান্তে উদ্বুদ্ধ হয়ে এখানকার কয়েকজন প্রতিভাদীপ্ত ছাত্রকে ইংল্যাণ্ডে পাঠাতে মনস্থ করেন। কিন্তু ব্রামলি সাহেবের আকস্মিক মৃত্যু হওয়ায় তাঁর এই ইচ্ছা কার্যে পরিণত হল না। তাঁর মৃত্যুর পর মেডিকেল কলেজের

প্রখ্যাত অধ্যাপক হেনরী হ্যারি গুডিব ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে ডাঃ ব্রামলির প্রস্তাবটি পেশ করেন। তিনি একথাও জানান যে তাঁর কয়েকটি শর্ত মেনে নিলে তিনিও ছাত্রদের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডে যেতে রাজী। ডাঃ গুডিব এই ব্যাপারে এতই উৎসাহী ছিলেন যে একজন ছাত্রের ইংল্যাণ্ডে থাকাকালীন পুরো খরচ তিনি নিজে বহন করবেন বলে স্থির করলেন। তখনকার যুগে অনেক মহৎ কর্মের উৎসাহ এবং অর্থ আসত দ্বারকানাথ ঠাকুরের কাছ থেকে। মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের তিনি প্রথম থেকেই উৎসাহ দিয়ে আসছিলেন। ১৮৪২-এ তিনি যখন প্রথম বিলাত যান, তখন মেডিকেল কলেজের ছাত্র রাজেন্দ্র-লাল মিত্রকে সঙ্গে নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অভিভাবকদের আপত্তিতে তাঁর আর যাওয়া হয়নি। এবারে দুটি ছাত্রের খরচ চালাতে তিনি স্বীকৃত হলেন। আর একজনের জন্য ডাঃ গুডিব চাঁদা তুললেন। মুর্শিদাবাদের নবাব সৈয়দ মনসুর উল্লা খা বাহাদুর মোটা টাকা চাঁদা দিলেন। কোম্পানি ডাঃ গুডিবের প্রস্তাব মেনে নিল। এল সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত দিন।

১৮৪৫ সালের ১৮ই মার্চ। ডাঃ গুডিব চারজন ছাত্রকে নিয়ে এস. এস. বেন্টিঙ্ক জাহাজে রওনা দিলেন। সূত্রপাত হল ডাক্তারি পড়ার জন্য ইংল্যাণ্ডে যাওয়া। আজও সেই ধারা অব্যাহত আছে। বর্তমানে দেশে এম. ডি, এম. এস. করার সুযোগ যথেষ্ট, তবু এম. আর. সি. পি, এফ. আর. সি. এস-এর আকর্ষণ এখনো যায় নি। এখানে উল্লেখযোগ্য দ্বারকনাথ ঠাকুরও একই জাহাজে ইংল্যাণ্ডে গিয়েছিলেন।

লণ্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজে এই চারজন ভারতীয় ছাত্র ভর্তি হলেন। থাকার ব্যবস্থা হল গুডিব সাহেবের বাসভবনে। ডাঃ গুডিব এঁদের একাধারে বন্ধু, গুরু এবং আত্মীয়। সঙ্গ দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে এই চারজন তরুণ বাঙালীর গৃহকাতরতার যন্ত্রণা তিনি ভুলিয়ে দিতেন। এঁরা গুরুর ঋণ কোনোদিন ভোলেননি।

১৮৪৬ সালের ২৭শে জুলাই আর এক শুভদিন। এইদিন ভোলানাথ বসু, দ্বারকানাথ বসু এবং গোপালচন্দ্র শীল এম. আর.

সি. এস. ('মেম্বর অব রয়েল কলেজ অব সার্জন') পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ভোলানাথ বসু ১৮৪৭ সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ডি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি লণ্ডনের প্রথম ভারতীয় এম. ডি.। বাঙালী ছেলের পক্ষে এটা কম কৃতিত্বের পরিচয় নয়। সূর্য চক্রবর্তী বয়সে সকলের ছোট ছিলেন। তিনি কলকাতা মেডিকেল কলেজে মাত্র একবছর পড়েছিলেন। তাঁর বয়স কম ছিল বলে ১৮৪৮ সালের আগে তাঁকে এম. আর. সি. এস. পরীক্ষা দিতে দেওয়া হয়নি। এই পরীক্ষায় পাশ করার পর ১৮৪৯ সালে তিনি এম. ডি. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হন। তাঁর এই কৃতিত্বে দেশের ও বিদেশের পত্র-পত্রিকায় অজস্র প্রশংসা বর্ষিত হয়। তিনি বহু পদক এবং প্রশংসাপত্র লাভ করেন। লণ্ডনে চারজন বাঙালী ছাত্রেরই পাঠজীবন ছিল কৃতিত্বে সমুজ্জ্বল। সূর্য চক্রবর্তী তাঁর অসাধারণ অধ্যবসায়ের গুণে অধ্যাপকদের খুব প্রিয়পাত্র ছিলেন। তুলনামূলক অ্যানাটমির অধ্যাপক গ্রাণ্ট সাহেব তাঁকে এত স্নেহ করতেন যে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে সারা ইয়োরোপ ভ্রমণ করেছিলেন।

দ্বারকানাথ বসুকে অনিবার্য কারণে সকলের আগে দেশে ফিরে আসতে হয়। ১৮৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে গুডিব সাহেবের সঙ্গে গোপালচন্দ্র শীল ও ভোলানাথ বসু ভারতে ফিরে আসেন এবং আন্-কাভিন্যান্টেড মেডিকেল সার্ভিসে যোগ দেন। দ্বারকানাথ বসু কলকাতার প্রসূতিসদনে প্রথম আবাসিক সার্জন নিযুক্ত হন। ১৮৪০ সালে মেডিকেল কলেজে একশত শয্যাবিশিষ্ট এই হাসপাতাল খোলা হয়। গোপালচন্দ্র শীল প্রথমে পাঞ্জাবে কাজ করেন। পরে আসেন দ্বারকানাথ বসুর জায়গায়। কিন্তু কিছুদিন পরেই তাঁর মৃত্যু হওয়ায় একটি সম্ভাবনাময় জীবনের অবসান ঘটে।

ভোলানাথ বসুর জন্ম ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দে ব্যারাকপুর মহকুমার অন্তর্গত চানকগ্রামে। প্রথমে তিনি গ্রামের পাঠশালায় পড়াশুনা করেন। ১৮৩৫ সালে ভর্তি হন লর্ড অক্ল্যাণ্ড প্রতিষ্ঠিত ব্যারাকপুর বিদ্যালয়ে। অক্ল্যাণ্ড মাঝে মাঝে বিদ্যালয় পরিদর্শন করতেন এবং বালকদের শিক্ষা

ও সদাচারের প্রতি দৃষ্টি দিতেন। ১৮৪০ খ্রীস্টাব্দে লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডই ভোলানাথকে কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করান। শুধু তাই নয়, মাসিক দশ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থাও করেন।

ভোলানাথ যখন ইংল্যাণ্ড থেকে দেশে ফেরেন, সে সময় অক্‌ল্যাণ্ড সরকারী কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করে ইংল্যাণ্ডে বাস করছিলেন। ভোলানাথের কৃতিত্বে আনন্দিত হয়ে অক্‌ল্যাণ্ড তাঁকে একটি সোনার ঘড়ি উপহার দেন। ভোলানাথ দেশে ফিরে এসে সরকারী কার্যে যোগ দেন। দীর্ঘ ত্রিশ বছর বিভিন্ন স্থানে কাজ করেন। তিনি ফরিদপুরে সিবিল সার্জন ছিলেন অনেক দিন। জনকল্যাণমূলক কাজে বহু অর্থ তিনি ব্যয় করেছিলেন। তাঁর সমস্ত সম্পত্তি জনকল্যাণে দান করেন। ব্যারাকপুরের ডাঃ বি. এন. বোস হাসপাতাল তাঁর অর্থে প্রতিষ্ঠিত। ১৮৮২ খৃস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

সূর্যকুমার চক্রবর্তী একা ইংল্যাণ্ডে রয়ে গেলেন। ডাঃ গুডিবের সঙ্গে ফিরলেন না। ১৫-২-১৮৪৮ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরের' সংবাদ নিম্নরূপ :

"গুণ হোয়ে দোষ হলো বিদ্যার বিদ্যায়।"

ডাক্তার গুডিব সাহেব গোপালচন্দ্র শীল এবং ভোলানাথ বসু নামক দুইজন মেডিকেল ছাত্রকে সমভিব্যহারে লইয়া বিলাত হইতে আগমন করিতেছেন, সূর্যকুমার নামক বিপ্রকুলোদ্ভব ছাত্র বিলাতে রহিলেন, হঠাৎ এখানে আসিবেন না, তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, একটি বিলাতি বিবি বিবাহ করিবেন, তবে আসিবেন, নচেৎ যে রহিলেন, সেই রহিলেন। বিবির সহিত বিবাহের লোভে তিনি পাদ্রিদিগের শ্বেতপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানপূর্বক ঈশুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন, অজপূর্ব ব্রহ্মপুত্র নদের পারে পাণ্ডববর্জিত দেশে ওই সূর্যকুমার জন্মগ্রহণ করেন, ঢাকার কলেজে কিছুদিন ইংরাজী পড়িয়া কলিকাতায় আগমন করত চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিবার নিমিত্ত মেডিকেল কলেজে নিযুক্ত হন, এখানে যতদিন ছিলেন, কিছুই মানিতেন না, সংপূর্ণ নাস্তিক ছিলেন,

গলদেশ হইতে যজ্ঞসূত্র ত্যাগ করিয়াছিলেন, কোন ধর্মের প্রতিই বিশ্বাস করিতেন না, পরে মেডিকেল কলেজের গুডিব সাহেবের সহিত বিলাত গমন করেন, সেখানে উত্তমরূপে বিদ্যা শিখিয়া দুর্বুদ্ধিবশতঃ অবশেষে এই অগাধ বিদ্যা প্রকাশ করিলেন, যাহা হউক ধন্য বিধি লোভ, হে খ্রীস্টধর্ম চমৎকার তোমার গুণ, তুমি বিবি পর্যন্ত দিয়া লোককে স্বমতে আকর্ষণ করহ।' ('বিনয় ঘোষ— সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৪)

সংবাদ প্রভাকরের কথাগুলি অপ্রিয় হলেও, সত্যতা অস্বীকার করার উপায় নেই। ইংল্যাণ্ডে যাওয়ার সময় একমাত্র দ্বারকানাথ বসু খ্রীস্টধর্মাবলম্বী ছিলেন।

দেশে ফিরে এসে ডাঃ চক্রবর্তী অন্য তিনজনের মতো আন-কাভিন্যান্টেড মেডিকেল সার্ভিসে যোগ দেন। ইংল্যাণ্ডের অধ্যাপকরা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করেন যেন ডাঃ চক্রবর্তীকে কাভিন্যান্টেড সার্ভিসে নেওয়া হয়। কিন্তু এই সার্ভিস ইয়োরোপীয়দের জন্য সংরক্ষিত ছিল।

যাই হোক, ডাঃ চক্রবর্তী মেডিকেল কলেজে সহকারী-চিকিৎসক নিযুক্ত হন। ১৮৫৪ সালে মেটিরিয়ামেডিকা ও ক্লিনিকেল মেডিসিনের অধ্যাপকের পদে অস্থায়ীভাবে তিনি কাজ করেন। এই বছরটি তাঁর জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এতদিন কাভিন্যান্টেড মেডিকেল সার্ভিস (যা পরে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিস বা আই. এম. এস. নামে পরিচিত হয়), কেবল ইয়োরোপীয়দের মধ্যে সীমিত ছিল, এদেশের চিকিৎসকদের সেখানে প্রবেশাধিকার ছিল না। ১৮৫৪ সালে প্রথমবার এই সার্ভিসে নিয়োগের জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাব্যবস্থার সূচনা হয় এবং ভারতীয়দেরও এই প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার অধিকার দেওয়া হয়। পরীক্ষা হওয়ার কথা লণ্ডনে।

ডাঃ চক্রবর্তীর বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা কাভিন্যান্টেড সার্ভিস। প্রথম সুযোগই তিনি গ্রহণ করলেন। মেডিকেল কলেজের চাকরি ছেড়ে দিয়ে পাড়ি দিলেন তিনি আবার ইংল্যাণ্ডে। এক বন্ধুকে লেখেন: 'যদি আমি

সফল না হই, তবু আমার এই সান্ত্বনা যে, আমার সমস্ত ক্ষমতা আমার দেশের সেবায় নিযুক্ত করেছি। এতদিন আইনের শৃঙ্খল আমাদের পথে বাধা সৃষ্টি করেছে এবং হতাশা ও ক্ষতির কারণ হয়েছে। (যোগেশচন্দ্র বাগল—উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা) মোট ২৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে কৃতকার্য হলেন ২২ জন। ডাঃ চক্রবর্তী পেলেন দ্বিতীয় স্থান। সেই কতদিন আগে প্রমাণিত হল ভারতবাসী এবং বাঙালী বিদ্যায় ও বুদ্ধিতে কোনো দেশের অধিবাসীদের চেয়ে ন্যূন নয়। গৌরবের মুকুট মাথায় চড়িয়ে তিনি দেশে ফিরে এলেন। এই ঘটনার দশ বছর পরে ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম আই. সি. এস. হন।

১৮৫৫ সালের ২৪শে জানুয়ারী ডাঃ চক্রবর্তী অ্যাসিস্টান্ট সার্জন পদে নিযুক্ত হন। পরে তিনি বেঙ্গল আর্মির সার্জন এবং সার্জনমেজর পর্যন্ত হয়েছিলেন। ১৮৬৬ সালে তিনি মেডিসিনের স্থায়ী অধ্যাপক এবং মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রধান চিকিৎসক নিযুক্ত হন। ১৮৭৪ সাল পর্যন্ত এই পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর আগে কোনো ভারতীয়ের এই পদে কাজ করার অধিকার ছিল না। ডাঃ চক্রবর্তী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' হন।

সংগঠক হিসাবে ডাঃ চক্রবর্তী ছিলেন দক্ষ। তাঁরই উদ্যোগে ১৮৬৫ সালে কলকাতায় 'ব্রিটিশ মেডিকেল এসোসিয়েশনে'র বঙ্গদেশীয় শাখা স্থাপিত হয়। এক বছর তিনি এর সভাপতি ছিলেন। ১৮৫১ সালের ১১ ই ডিসেম্বর 'বেথুন সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হলে কলকাতার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এতে যোগ দেন। ডাঃ চক্রবর্তীও এর উৎসাহী সদস্য ছিলেন। বেথুন সোসাইটি সে সময় শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনার প্রধান ক্ষেত্র ছিল। ১৮৫৪ সালে 'শিল্প বিদ্যোৎসাহিনী সভা' স্থাপিত হলে তিনি এরও একজন উৎসাহী সভ্য হলেন। কলকাতার জনস্বাস্থ্য, বাঙালী জাতির শারীরিক ও মানসিক শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে তিনি বহু সভায় বক্তৃতা দেন। তাঁর প্রদত্ত বক্তৃতাগুলি ১৮৭০ সালে *Popular Lectures On Subject of Indian Interest* গ্রন্থে প্রকাশ করেন।

সূর্যকুমার চক্রবর্তীর জন্ম ১৮২৭ সালে ঢাকা জেলার কনকসার গ্রামে। তাঁর বাল্যকাল কেটেছে খুব দুর্ভাগ্যের ভিতর। মাত্র ৬ বৎসর বয়সে তিনি মাতা ও পিতা, দুজনকেই হারান। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হয় গুরুমহাশয়ের পাঠশালাতে। যখন তাঁর বয়স তের, তখন ইংরেজি শিক্ষার উদ্দেশ্যে আসেন কুমিল্লা শহরে। যোগেশচন্দ্র বাগল রচিত 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা' পুস্তকে এই বিষয়ে নীচের কাহিনী লেখা আছে :

'ত্রয়োদশ বৎসর বয়সেই তিনি সর্বপ্রথম একজন শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীর সাক্ষাৎ লাভ করিলেন। এই কর্মচারীটি শাসন-সংক্রান্ত কার্যব্যপদেশে ঐ অঞ্চলে গমন করিলে, অন্যান্য দশজনের মত সূর্যকুমারও কৌতূহল পরবশ হইয়া তাঁহাকে দেখিতে যান। তাঁহার আচরণ ও কথাবার্তায় তিনি মুগ্ধ হন এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেন যে, তাঁহাকেও উক্ত শ্বেতাঙ্গের মত ইংরেজি বলিতে হইবে। সূর্যকুমার এই সঙ্কল্প কার্যে পরিণত না করিয়া ছাড়িলেন না। তিনি ঐ বয়সেই সামান্য বস্ত্র এবং কিছু চিঁড়া লইয়া দীর্ঘ পথ পদব্রজে রওনা হইলেন। তাঁহার গ্রাম হইতে ষাট মাইল দূরে একটি ইংরেজি বিদ্যালয় ছিল। এই বিদ্যালয়টি কুমিল্লার ইংরেজি বিদ্যালয়। ইহাই পরে জেলা স্কুলে পরিণত হইয়াছে। কুমিল্লায় পৌঁছিয়া সূর্যকুমার ঐ বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকের সহিত ইংরেজি পড়ার যে ব্যবস্থা করিয়া লইলেন, তাহা সত্যই অভিনব। সূর্যকুমার জাতিতে ব্রাহ্মণ ; তিনি প্রস্তাব করিলেন—তিনি শিক্ষক মহাশয়ের পাচকের কার্য করিবেন, তদ্‌বিনিময়ে তিনি তাঁহাকে ইংরেজি শিখাইবেন। শিক্ষকমহাশয় এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার পাঠে আশ্চর্য উন্নতি দেখিয়া তাঁহাকে ইংরেজি স্কুলে ভর্তি হইবার সুযোগ করিয়া দিলেন। কুমিল্লা জেলা স্কুলের শতবার্ষিকী (১৮৩৭-১৯৩৭) উপলক্ষে এই বিদ্যায়তনের যে ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহাতে প্রদত্ত বিখ্যাত ছাত্রদের বিবরাংশ হইতে জানা যায়, সূর্যকুমার এই বিদ্যালয়ে ১৮৩৯ সনের

১৯শে এপ্রিল তারিখে ভর্তি হইয়াছিলেন। তাঁহার অধ্যবসায় ও কৃতিত্ব দেখিয়া বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে একটি মাসিক বৃত্তি প্রদান্ করেন।'

কুমিল্লা থেকে সূর্যকুমার আসেন কলকাতায় এবং কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলে পড়েন কিছুকাল। এই সময় আলেকজাণ্ডার নামে একজন ইংরেজ সিবিলিয়ান মেডিকেল কলেজে ভর্তি হলে সূর্যকুমারের কলেজে অধ্যয়নের যাবতীয় ব্যয় বহন করতে স্বীকৃত হন। সূর্যকুমার মেডিকেল কলেজে ভর্তি হলেন ১৮৪৪ সালে।

সূর্যকুমারের খ্রীস্টধর্মগ্রহণ বিষয়ে সংবাদ প্রভাকরের ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। অল্প বয়সে মাতাপিতা দুজনকে হারিয়েছিলেন বলে সম্ভবত পারিবারিক বন্ধন তাঁর কিছুই ছিল না, ধর্ম না মানার অন্তর্নিহিত কারণও বোধ হয় তাই। মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করার পরেই তিনি উপবীত ত্যাগ করেন। লণ্ডনে গিয়ে যখন খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেন, তখন অধ্যাপক গুডিব মেডিকেল কলেজের কর্তৃপক্ষকে লেখেন, এই ধর্মান্তর সূর্যকুমারের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত। খ্রীস্টধর্ম গ্রহণের পর গুরু গুডিবের নাম নিজের নামের সঙ্গে যুক্ত করে নাম গ্রহণ করেন—সূর্যকুমার গুডিব চক্রবর্তী। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় ডাঃ চক্রবর্তী মাইকেল মধুসূদনের সমসাময়িক ছিলেন। মধুসূদনের জন্ম ১৮২৮ সালে।

ডাঃ চক্রবর্তীর পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে ডাঃ প্রতাপচন্দ্র সেনগুপ্ত লিখেছেন—'সম্ভবত ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দে তিনি শ্রীমতী সারা নামে এক খৃস্টান মহিলাকে বিবাহ করেন। তাঁদের চারিটি ছেলে ও তিনটি মেয়ে। তিনি পুত্র-কন্যাদের কলকাতা ও বিলাতে শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। প্রথমা কন্যা লোরেটো কনভেণ্টে নান হন ; এবং পরে ওই প্রতিষ্ঠানের মাদার সুপিরিয়র, মাদার বেনেডিক্টা নামে পরিচিতা হন। জ্যেষ্ঠ পুত্র উইলিয়াম লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। অপর দুই পুত্র আর্থার ও আলফ্রেড আই. সি. এস. হন। আর্থার সেকালের বাংলা প্রেসিডেন্সীতে (২।৩।১৮৮৭) ও আলফ্রেড বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে

(৫।৯।১৮৯১) নিযুক্ত ছিলেন। দ্বিতীয়া কন্যা ললিতা কেম্ব্রিজে গার্টন কলেজের গ্রাজুয়েট এবং তিনি বহু ভাষা জানতেন। এঁর বিবাহ হয় ব্যারিস্টার পি. এল. রায়ের সঙ্গে। এঁদের পুত্র মিঃ পি. এল. রায় অধুনা কলকাতা নিবাসী এবং কনিষ্ঠ পুত্র ইন্দ্রলাল রায়, রয়াল এয়ার ফোর্সের লেফ্টেন্যান্ট, প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানদের সঙ্গে আকাশযুদ্ধে ফ্লাণ্ডার্সে নিহত হন। কনিষ্ঠা কন্যা মার্থার বিবাহ হয় ডাক ও তার বিভাগের অধ্যক্ষ স্যার জি. এন. রায়ের সঙ্গে। কনিষ্ঠপুত্র অস্ট্রেলিয়াবাসী হন— তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। [প্রতাপচন্দ্র সেনগুপ্ত : প্রথম ভারতীয় আই. এম. এস্.—অমৃত, ১৩৭৬, ২রা মাঘ, পৃ ৮৯৩)।

১৮৭৪ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বরে লণ্ডনে ডাঃ চক্রবর্তীর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৪৭ বৎসর। ১৮৭৪ সালে প্রকাশিত রাজনারায়ণ বসু-রচিত 'সেকাল আর একাল' পুস্তক থেকে একটি অংশ উদ্ধৃত করছি :

> 'লোকে যেমন কাশীতে মরিলে আপনাকে কৃতার্থ মনে করে, তেমনি সম্প্রতি বিলাতের ফেরত একজন যুবক ডাক্তার অত্যন্ত পীড়িত হইয়া লণ্ডনে মরিবার ইচ্ছা করিয়া বিলাতে গিয়াছিলেন। তাঁহার মনস্কামনা সিদ্ধ হইয়াছিল, তিনি যেমন কাশীধামে পৌঁছিলেন, অমনি তাঁহার প্রাণত্যাগ হইল।'

কাকে লক্ষ্য করে রাজনারায়ণ বসু এই মন্তব্য করেছিলেন, বইতে তার কোনো উল্লেখ নেই। তবে সন-তারিখ মিলিয়ে বিচার করলে বুঝতে বিশেষ অসুবিধা হয় না।

চিকিৎসক ও শিক্ষক হিসাবে ডাঃ চক্রবর্তী সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। গবেষণাতেও তাঁর উৎসাহ ছিল। কলেরা, বসন্ত, টাইফাস প্রভৃতি রোগবিষয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধ তৎকালীন বিখ্যাত মেডিকেল জার্ণালগুলিতে প্রকাশিত হয়েছিল। অতি অল্পদিনে দেশের ও বিদেশের বিদগ্ধসমাজে যে সম্মান ডাঃ চক্রবর্তী লাভ করেছিলেন, সেযুগে অন্য কোনো ভারতীয় চিকিৎসকের ভাগ্যে তা জোটেনি। উন্নতির মধ্যগগনে আরোহণ করার পরমলগ্নে তাঁর জীবনাবসান ঘটে। তাঁর প্রতিভার

পূর্ণবিকশিত রূপ দেখার সৌভাগ্য দেশবাসীর হল না। তাঁর সম্মানে কলকাতার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের একটি ওয়ার্ড 'চক্রবর্তী ওয়ার্ড' নামে অভিহিত করা হয়।

ডাঃ সূর্যকুমার চক্রবর্তী যে কালের লোক, সেকালের চিকিৎসকদের অসহায় অবস্থা ভাবলে তাঁদের জন্য অনুকম্পা জাগে। আজকের একজন সাধারণ চিকিৎসকও অনেক কঠিন ব্যাধির সফল চিকিৎসা করেন। অতীত যুগে স্বাভাবিক কারণেই প্রাজ্ঞ চিকিৎসকের পক্ষেও তা করা সম্ভব হত না। তার কারণ বর্তমান যুগের বিজ্ঞানের অগ্রগতি এবং অত্যাশ্চর্য ওষুধ আবিষ্কার। ডাঃ চক্রবর্তীর সময়ে না ছিল অ্যান্টিবায়োটিক (Antibiotic), না ছিল করটিকোষ্টিরয়েড (Corticosteroid)। চিকিৎসার মধ্যে তখন জোঁক লাগিয়ে রক্তক্ষরণ করা, নয়ত বিরেচক প্রয়োগ করা। সূর্যকুমারদের উপচার ছিল সামান্য। তবু বর্তমানকালের চিকিৎসকগণ তাঁদের মতো পূর্বসূরীদের সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করেন, কারণ তাঁরা রচনা করে গেছেন ভাবীকালের উর্বর ভূমি, রেখে গেছেন শাশ্বত প্রেরণা।

১৮৭৪ সালের ১৫ই অক্টোবরের 'অমৃতবাজার পত্রিকায়' লেখা হয়—'বঙ্গদেশ আর একটি রত্নচ্যুত হইয়াছেন। ডাক্তার চক্রবর্তী মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। প্রায় চারি মাস হইল, ইনি ইংলণ্ড গমন করেন এবং তথায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ডাক্তার চক্রবর্তী একজন অসাধারণ লোক ছিলেন।...ডাক্তার চক্রবর্তীর প্রকৃত নাম সূর্যকুমার চক্রবর্তী। তিনি একজন বিলাতি মেমকে বিবাহ করেন, কিন্তু যেমন সচরাচর হইয়া থাকে, তাহার সহিত তিনি তত সুখে কাল অতিবাহিত করিতে পারেন নাই। ডাক্তার চক্রবর্তীর অমায়িক স্বভাব ছিল এবং যাহাতে দেশের উপকার হয়, তৎপক্ষে তিনি যত্নশীল ছিলেন। ডাক্তার চক্রবর্তীর ৪৭ বৎসর বয়সে মৃত্যু হইয়াছে।' [যোগেশচন্দ্র বাগল —উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা)

সূর্যকুমার চক্রবর্তীর পর আর একজন বাঙালী আই. এম. এস. মেটেরিয়ামেডিকা ও ক্লিনিক্যাল মেডিসিনের অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। তাঁর নাম রাজেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র। মেডিকেল কলেজে এবং সাধারণ মানুষের কাছে তিনি আর. সি. চন্দ্র নামেই বেশি পরিচিত ছিলেন।

তাঁর জন্ম ১৮৩৪ সালে। কলকাতার স্কটিশ ফ্রি চার্চ ইন্স্টিটিউশনে পড়াশুনা শেষ করে তিনি ভর্তি হন মেডিকেল কলেজে। এখানে দু বছর পড়েছিলেন। অন্নদাচরণ খাঁস্তগিরকে বিলেতে গিয়ে পড়াশুনা করার জন্য মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ মনোনীত করেন, কিন্তু অন্নদাচরণের যাওয়া হল না বলে রাজেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্রকে পাঠানো হল। সেখানে তিনি এম. আর. সি. এস. ডিপ্লোমা লাভ করেন। তিনি ১৮৫৮ সালের ২৭শে জানুয়ারি ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসে যোগ দেন। প্রথম দিকে সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে কাজ করেন বহু জায়গায়। ১৮৭৪ সালে কলকাতার মেডিকেল কলেজে মেটেরিয়ামেডিকা ও ক্লিনিক্যাল মেডিসিনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৯৩ সাল পর্যন্ত তিনি এই পদে কাজ করেন।

১৮৬২ সালে ডাঃ চন্দ্র একজন ইংরেজ মহিলাকে বিবাহ করেন। এই মহিলা ছিলেন সিংহলের এক জজসাহেবের ভগ্নী। ইংলণ্ডে শিক্ষিত, ইংরেজ মহিলার সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ ডাঃ চন্দ্র উদার স্বভাবের ছিলেন সন্দেহ নেই। তবে এক ব্যাপারে তাঁর ছিল ভীষণ গোঁড়ামি।

মহিলাদের মেডিকেল কলেজে ভর্তির জন্য তখন চেষ্টা হচ্ছিল। অধ্যাপক গোষ্ঠীর অনেকেই মহিলাদের ডাক্তার হওয়ার বিরুদ্ধে ছিলেন। ডাঃ চন্দ্রও বিরুদ্ধবাদীদের একজন। ১৮৮৪ সালে যখন কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় মেডিকেল কলেজে ভর্তি হলেন তখন ডাঃ চন্দ্র খোলাখুলি অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর জন্যই কাদম্বিনী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিলাভে বঞ্চিত হলেন।

১৮৯৫ সালের ১৪ই ডিসেম্বর ডাঃ চন্দ্রের মৃত্যু হয়। তিনি একটি উইল করে তাঁর সঞ্চিত অর্থের কিছু অংশ স্কচ মিশন জেনারেল ফাণ্ডে

এবং কিছুটা একটি ছোট চার্চে (যেখানে তিনি প্রায়ই উপাসনা করতেন) দান করেছিলেন। কিন্তু উইলে তাঁর নাম স্বাক্ষর ছিল না। সেজন্য আইন অনুসারে তাঁর সম্পত্তির মালিকানা তাঁর হিন্দু আত্মীয়দের প্রাপ্য হয়। তাঁর কোনো সন্তান ছিল না। তবু হিন্দু আত্মীয়রা ডাঃ চন্দ্রের উইলের শর্ত পালন করেছিলেন। তাঁদের এই মহত্ত্ব তৎকালীন সংবাদপত্রে প্রশংসিত হয়েছিল। মেডিকেল কলেজে তাঁর নামে 'চন্দ্র স্কলারশিপ' এবং পত্নীর নামে 'মেরী স্কলারশিপ' প্রবর্তিত হয়।

প্রথম মহিলা ডাক্তার

আধুনিক শিক্ষায় বঙ্গদেশের মহিলাদের প্রবেশ খুব বেশিদিন আগে-কার ঘটনা নয়। বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠার আগেও স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের কিছু কিছু চেষ্টা হয়েছিল বটে, তবে জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন যখন ১৮৪৯ সনের ৭ই মে মাত্র একুশটি ছাত্রী নিয়ে মেয়েদের জন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন, তখন থেকেই নারীশিক্ষা-প্রসারের সত্যিকার সূচনা হল বলা চলে। বেথুন আর বিদ্যাসাগর দুজনের চেষ্টায় নারী-শিক্ষার প্রসার হতে লাগল। গোড়ায় যেসব মহিলা মেডিকেল কলেজে ভর্তির জন্য আবেদন করতেন, তাঁরা সকলেই বেথুন স্কুল ও কলেজের ছাত্রী। ১৮৮৪ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজের দ্বার মহিলাদের জন্য সর্বপ্রথম উন্মুক্ত হল। প্রথম যে ছাত্রীটি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হলেন তিনি সেযুগের একজন বিখ্যাত মহিলা। তাঁর নাম কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়।

কাদম্বিনী দেবী মেডিকেল কলেজের প্রথম ছাত্রী, তবে তাঁর আগে আরো দুজন ছাত্রী ভর্তির জন্য আবেদন করেছিলেন এবং তাঁদের আবেদন মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক-সভা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। সে দুজন হলেন, এলেন ডি আব্রু এবং অবলা দাস (বসু)। এলেন ডি আব্রু ১৮৭৯ সালে ফ্রি চার্চ নর্মাল স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৮৮২ সালে জানুয়ারি মাসে বেথুন স্কুল থেকে এফ.এ. পাশ করেন। ১৮৮১ সনে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন অবলা দাস। কলকাতা মেডিকেল কলেজের দ্বার মহিলাদের জন্য রুদ্ধ থাকলেও মাদ্রাজ এ বিষয় ছিল অগ্রণী। সেখানে মহিলাদের ভর্তি করা শুরু হয় ১৮৭৫ সালে। এলেন ডি আব্রু এবং অবলা দাস দুজনেই বাংলা সরকারের বৃত্তি নিয়ে ১৮৮২ সালে মাদ্রাজ মেডিকেল কলেজে ভর্তি হলেন।

আমেরিকা এবং ইংলণ্ড বর্তমানে নারীশিক্ষায় যতই অগ্রসর হোক না কেন, সে সব দেশেও মহিলাদের চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করা সহজে সম্ভব হয়নি। আমেরিকার প্রথম মহিলা ডাক্তার এলিজাবেথ ব্ল্যাকওয়েল (Elizabeth Blackwell) আমেরিকার মেডিকেল কলেজগুলির প্রায় সব কটিতে আবেদন করে ব্যর্থ হয়েছিলেন। অবশেষে ১৮৪৭ সালে নিউ-ইয়র্কের উত্তরে একটি ছোট শহর জিনেভার মেডিকেল স্কুল তাঁকে ছাত্রী হিসাবে গ্রহণ করতে রাজী হল। ১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারি এলিজাবেথ শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আমেরিকার প্রথম মহিলা চিকিৎসক হওয়ার গৌরব অর্জন করলেন। গ্রেট ব্রিটেনের প্রথম মহিলা চিকিৎসক এলিজাবেথ গ্যারেট এণ্ডারসন (Elizabeth Garrett Anderson) অনেক চেষ্টা করে, অনেক বাধা অতিক্রম করে ১৮৬৫ সালে এল. এস. এ (L. S. A) ডিপ্লোমা লাভ করেন। কিন্তু তারপর ১৮৬৯ সালে এডিনবরায় যখন সোফিয়া জেক্‌স্ ব্লেইক (Sophia Jex Blake) ও অন্য ছয়জন ছাত্রী ভর্তি হলেন, তখন শুরু হল ছাত্রী ভর্তির বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিরোধিতা। এই ছাত্রীদের মধ্যে সোফিয়া ছিলেন সবচেয়ে উৎসাহী এবং প্রাণোচ্ছল। অন্য একজন ছাত্রী এডিথ পেচি (Edith Pechey) পরে ভারতে এসে বহুদিন কাজ করেছিলেন।

সোফিয়ার দুর্নিবার উৎসাহের ফলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মেয়েদের গ্রহণ করতে রাজী হলেন। সে সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল ফেকালটিতে ছিলেন স্ত্রীশিক্ষায় সহানুভূতিশীল স্যার জেম্‌স সিম্পসন। ইনি এলিজাবেথ গ্যারেটকেও যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। সোফিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন বটে, কিন্তু কয়েকমাস পরে স্যার সিম্পসনের মৃত্যু হল। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিম্পসন-বিহীন মেডিকেল ফেকালটির প্রতিপত্তিশীল সভ্যগণ ছিলেন স্ত্রীশিক্ষার দারুণ বিপক্ষে। তাঁরা ছাত্রীদের বুঝিয়ে দিতে ছাড়লেন না যে তারা এখানে অবাঞ্ছিত। ছাত্রীরা শিক্ষকদের কাছ থেকে সহানুভূতির পরিবর্তে পাচ্ছিলেন অবজ্ঞা ও গঞ্জনা। এই সময়কার একটি ঘটনাকে উপলক্ষ করে অবস্থা গুরুতর

হয়ে ওঠে। রসায়নশাস্ত্রের পরীক্ষায় এডিথ পেচি ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করলেন এবং বৃত্তি পাওয়ার অধিকারী হলেন। কিন্তু রসায়নের অধ্যাপক একজন মহিলাকে এই বৃত্তি দিতে অস্বীকার করলেন এবং দিলেন পেচির নিচে দ্বিতীয় স্থান অধিকারী একটি পুরুষকে। এই ঘটনায় ছাত্রীরা ক্রুদ্ধ এবং ক্ষুব্ধ হলেন। ভাবপ্রবণ সোফিয়া অনুভব করলেন, তাঁরা এক হীন চক্রান্তের বলি হচ্ছেন। সাময়িকপত্রে এই বিষয়টি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিন্দা করা হল। ফেকালটির অধ্যাপকগণ এর ফলে মেয়েদের উপর আরো বিরক্ত হলেন এবং তাঁদের অনেকেই মেয়েদের পড়াতে অস্বীকার করলেন।

এরপর ঘটল আরো একটি লজ্জাকর ঘটনা। প্রায় দু'শত ছাত্র লেক্চার-ক্লাসের সামনে জমায়েত হয়ে মেয়েদের পথ অবরোধ করে দাঁড়ালো। তারপর শুরু হল মেয়েদের উপর কাদা ছোঁড়া, টিটকারি দেওয়া ইত্যাদি। সোফিয়া বুঝলেন একটা কিছু করতে হবে, না হলে অত্যাচার বেড়েই চলবে, এর অবসান হবে না। তিনি আশ্রয় নিলেন কোর্টের। ১৮৭২ সালে কোর্টের রায় বের হল। সে রায়ে বলা হল, ছাত্রীদের ট্রেনিং শেষ করার এবং পরীক্ষায় বসার অধিকার রয়েছে। সোফিয়া এবং তাঁর সঙ্গিনীরা ভাবলেন, তাঁদের জয় হয়েছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে উচ্চতর কোর্টে আপিল করা হল। এবারের রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে। এই রায়ে বলা হল, মেয়েদের গ্রহণ করে বিশ্ববিদ্যালয় সীমাবহির্ভূত কাজ করেছে, অতএব মেয়েদের পড়ানো বা পরীক্ষা নেওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে বাধ্যতামূলক নয়। এই রায় বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে এডিনবরায় চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করার দরজা স্ত্রীলোকদের কাছে একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। ছাত্রীদের কেউ কেউ চলে গেলেন বিদেশে। কিন্তু সোফিয়া অন্য চরিত্রের মেয়ে। অপমানে এবং পরাজয়ে তাঁর প্রতিজ্ঞা আরো দৃঢ় হল। তিনি এক নতুন পরিকল্পনা প্রস্তুত করলেন। এবার আর এডিনবরা নয়, এবারের কর্মক্ষেত্র লণ্ডন। লণ্ডনে শুধু মেয়েদের জন্য তিনি একটি মেডিকেল স্কুল স্থাপনের পরিকল্পনা করলেন। এ ব্যাপারে সোফিয়ার অফুরন্ত কর্মক্ষমতা এবং সংগঠন-

শক্তির পরিচয় পাওয়া গেল। স্কুলের অধ্যাপক যোগাড় করা, অর্থ সংগ্রহ করা, পার্লামেন্টে বিল পাশ করানো, বাড়ি ক্রয় করা প্রভৃতি ব্যাপারে সোফিয়া একাই একশো। ১৮৭৪ সালে সোফিয়ার কল্পনা বাস্তবে রূপ নিল। চোদ্দজন ছাত্রী নিয়ে ৮ নম্বর হাণ্টার ষ্ট্রীটে 'লণ্ডন স্কুল অব মেডিসিন ফর উইমেন' স্থাপিত হল।

ভারতে ইংরেজ শাসনকালের প্রথম দিকে কয়েকজন মহিলা চিকিৎসক এসেছিলেন আমেরিকা এবং গ্রেট ব্রিটেন থেকে। ক্লারা সোয়েইন (Clara Swain) প্রথম বিদেশী মহিলা চিকিৎসক যিনি ১৮৭০ সালের ২রা জানুয়ারি নিউ ইয়র্ক থেকে বেরিলিতে আসেন।

আগেই বলা হয়েছে, ভারতে প্রথম মহিলা ভর্তি করা হয় মাদ্রাজ মেডিকেল কলেজে। ১৮৭৫ সালে মাদ্রাজের বিখ্যাত সাহেব ব্যারিস্টারের স্ত্রী মেরী সোয়ারলিয়েব (D Mary Scharlieb) এবং আরো তিনজন মহিলা মাদ্রাজ মেডিকেল কলেজে ভর্তি হলেন। অধ্যাপকদের অনিচ্ছা ও ভ্রূকুটি সত্ত্বেও এঁরা শেষ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। শ্রীমতী সোয়ারলিয়েব ১৮৭৮ সালে লণ্ডনে যান এবং ভর্তি হন 'লণ্ডন স্কুল অব মেডিসিন ফর উইমেন'-এ। ১৮৮২ সালে এই স্কুল থেকে পাশ করে বেরোন। মহারানী ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন সোয়ারলিয়েব এবং ভারতের নারী সমাজের করুণ অবস্থা বর্ণনা করেন। ভিক্টোরিয়া মহিলাদের চিকিৎসাবৃত্তি গ্রহণ করা পছন্দ করতেন না, কিন্তু সোয়ারলিয়েবের কাছে ভারতের নারীদের অবস্থার কথা শোনার পর তাঁর ধারণা পালটে গেল। সোয়ারলিয়েব ১৮৮৩ সালে মাদ্রাজে ফিরে আসেন। ১৮৭৫ সালে যাঁরা মাদ্রাজ মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন তাঁরা ছিলেন ইয়োরোপীয় বা অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। এদের পরে কয়েক বৎসর মাদ্রাজে আর কোনো ছাত্রী ভর্তি হয়নি। ১৮৮১-৮২ সালে আবার ছয়জন মহিলা ভর্তি হন। খাঁটি ভারতীয় মহিলাদের চিকিৎসাবৃত্তি গ্রহণ তখন থেকেই শুরু।

নারী সমাজের উন্নতির জন্য লেডি ডাফরিনের অবদান উল্লেখ-যোগ্য। তিনি ১৮৮৫ সালে 'ডাফরিন ফণ্ড' নামে একটি ভাণ্ডার খোলেন

এবং তাতে প্রচুর চাঁদা ওঠে। এই ফণ্ড থেকে নারীপ্রগতিমূলক অনেক প্রচেষ্টার সূচনা হয়। বস্তুত এঁরই উদ্যোগে বোম্বাইতে গ্র্যাণ্ড মেডিকেল কলেজে ১৮৮৩ সালে মহিলাদের ভর্তি করা শুরু হয়। অবশ্য এর কিছু আগে ১৮৮৩ সালেই ভারত থেকে যে মহিলা চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে প্রথম বিদেশে যান, তিনি এই বোম্বাই শহর থেকেই গিয়েছিলেন। গোপাল বিনায়ক যোশীর স্ত্রী আনন্দিবাঈ যোশী ঐ বছর আমেরিকায় যান পেনসিলভিনিয়া উইমেন মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করার জন্য। ১৮৮৬ সালের ১১ই মার্চ ঐ বিদ্যালয় থেকে তিনি এম. ডি. উপাধি লাভ করেন। দেশে ফিরে বেশি দিন তাঁর পক্ষে কাজ করা সম্ভব হয়নি, কারণ ১৮৮৭ সালে ক্ষয় রোগে তাঁর মৃত্যু হয়।

অ্যানি জগনাথন মাদ্রাজ মেডিকেল কলেজে পড়া শেষ করে ১৮৮৮ সালে এডিনবরায় যান এবং সেখানে ১৮৯২ সালে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। দেশে ফিরে এসে তিনিও আনন্দিবাঈ-এর মত ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হন এবং ১৮৯৪ সালে মারা যান।

এবারে আসা যাক কলকাতার কথায়। কাদম্বিনী বসু কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্রথম ছাত্রী। তাঁর পিতার নাম ব্রজকিশোর। পৈতৃক বাসভূমি ছিল বরিশালের চাঁদসীতে। পরে তিনি চলে আসেন ভাগলপুরে। সেখানেই কাদম্বিনীর জন্ম হয়। ব্রজকিশোর বসু ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী ছিলেন। অভয়চরণ মল্লিক ও ব্রজকিশোর বসুর নেতৃত্বে ভাগলপুরে নারীমুক্তি আন্দোলনের সূচনা হয় এবং ১৮৬৩ সালে ভারতের প্রথম মহিলা সমিতি স্থাপিত হয়। শ্রীঅরবিন্দের পিতা ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষ ভাগলপুরে আসার পর সমাজ-সংস্কার-মূলক কাজে দারুণ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। জন্মের পর থেকেই কাদম্বিনী এক প্রগতিশীল পরিবেশে বড় হতে লাগলেন।

কাদম্বিনীর স্কুলের পাঠ শুরু হয় বালিগঞ্জের হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়ে। দুর্গামোহন দাস, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ ব্রাহ্মসমাজের উৎসাহী কর্মীদের দ্বারা এই স্কুল পরিচালিত হত। কুমারী

অ্যাকরয়েড এই বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ছিলেন। বিচারপতি ফিয়ারের পত্নী ও দ্বারকানাথ এই স্কুলের অপর দুই শিক্ষক। কাদম্বিনীর সহপাঠিনী ছিলেন দুর্গামোহন দাসের কন্যা সরলা দাস। দুর্গামোহনের অপর কন্যা অবলা দাসও এখানেই পড়তেন। পরে ঐতিহাসিক বেভারিজের সঙ্গে অ্যাকরয়েডের বিবাহ হয় এবং অ্যাকরয়েড বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা ত্যাগ করেন। 'হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়ে'র নাম পরিবর্তিত করে 'বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়' রাখা হয়। দ্বারকানাথ ছিলেন এই বিদ্যালয়ের প্রাণস্বরূপ। তিনি ছিলেন 'স্ত্রীশিক্ষায় উৎসর্গচিত্ত'। কাদম্বিনীর বুদ্ধিমত্তা ও পাঠানুরাগ প্রথম থেকেই দ্বারকানাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শিক্ষাবিভাগের গ্রাণ্ট-সাহেব এই বিদ্যালয় পরিদর্শনকালে সরলা দাস ও কাদম্বিনীকে নানা প্রশ্ন করেন এবং তাঁদের উত্তর শুনে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার তখনও নারীজাতির জন্য উন্মুক্ত হয়নি। কাদম্বিনী ও সরলা যাতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে পারেন, সেজন্য দ্বারকানাথ রীতিমতো আন্দোলন শুরু করলেন। ১৮৭৬ সালে দেরাদুন-নিবাসী বাঙালী খ্রীস্টান ভুবনমোহন বসুর কন্যা 'দেরা স্কুল ফর নেটিব খ্রীস্টান গার্ল'স্' স্কুলের ছাত্রী চন্দ্রমুখী বসু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে এক বিশেষ অনুমতি পেলেন—প্রবেশিকা পরীক্ষার সমতুল একটি পরীক্ষা দেবার। মুসৌরী স্কুলের প্রধান শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে পরীক্ষা হবে। কিন্তু তিনি নিয়মিত পরীক্ষার্থী বলে গণ্য হবেন না এবং নম্বর সন্তোষজনক হলেও উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের তালিকায় তাঁর নাম প্রকাশিত হবে না বলে স্থির হয়।

চেষ্টা করলে সরলা কাদম্বিনীর বেলাতেও বিশ্ববিদ্যালয় এই ব্যবস্থায় রাজী হত, কিন্তু দ্বারকানাথ এ ব্যবস্থা মানতে রাজী নন। প্রভাবশালী ব্যক্তিদের এবিষয়ে তৎপর করার জন্য তিনি সচেষ্ট হলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার আর্থার হবহাউস নারীহিতৈষী ছিলেন। দ্বারকানাথের আবেদনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিল। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া

হল যে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়ার যোগ্যতা আছে কিনা, তা বিচারের জন্য এক প্রারম্ভিক পরীক্ষা নেওয়া হবে। পোপ ইংরেজির, গ্যারেট অঙ্কের, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিহাসের এবং পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার বাংলার পরীক্ষক নিযুক্ত হলেন।

এই পরীক্ষায় সরলা দাস ও কাদম্বিনী বসু দুজনেরই যোগ্যতা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হল। ১৮৭৮ সালের ২৭শে এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সভায় প্রস্তাব নেওয়া হয় কতকগুলি বিধিসাপেক্ষে মহিলা প্রার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে। এই সময় বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় বেথুন স্কুলের সঙ্গে মিলিত হয়। সরলা দাসের বিবাহ হওয়ায় প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়ার সংকল্প তিনি ত্যাগ করেন। কাদম্বিনী একা ১৮৭৮ সনে বেথুন স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিলেন। পরীক্ষার ফল বেরুলে দেখা গেল তিনি দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছেন। মাত্র এক নম্বরের জন্য প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হতে পারেন নি। ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই মার্চ-এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে উপাচার্য স্যার আলেকজাণ্ডার আরবুথনট বলেন: 'একটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ না করে পারছি না। ঘটনাটি যেমনি কৌতূহলজনক, তেমনি গুরুত্ব-পূর্ণ। এই বছর সিনেট প্রথম মহিলা প্রার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিতে অনুমতি দেয়। তদনুসারে বেথুন স্কুল থেকে একজন হিন্দু মহিলা প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন এবং কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। কাদম্বিনী বসু বাংলাতে বেশ ভাল নম্বর পান, সংস্কৃতের নম্বরও মোটামুটি ভাল, এমন কি বিজ্ঞান, যা মহিলাদের পক্ষে দুরূহ বিষয় বলে মনে করা হয়, তাতেও তিনি কৃতিত্ব দেখান। মাত্র এক নম্বরের জন্য তিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হবার গৌরব থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।' (প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় —বাংলার নারী জাগরণ)

বাংলার ছোটলাট কাদম্বিনীকে মাসিক পনের টাকার একটি বৃত্তি দিলেন এবং ষাট টাকা মূল্যের গ্রন্থ উপহার দিলেন। বৃত্তির একটি শর্ত রইল যে কাদম্বিনীকে এফ.এ. পড়তে হবে। ভাওয়ালের কুমার রাজেন্দ্র-নারায়ণ রায় উপহার দিলেন একটি স্বর্ণপদক এবং মূল্যবান গ্রন্থ।

কাদম্বিনীর জন্যই বেথুন স্কুলে এফ. এ. ক্লাস খোলা হল। ১৮৮০ সালে তিনি এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন তৃতীয় বিভাগে। একই সময়ে চন্দ্রমুখী বসুও ফ্রী চার্চ নর্মাল স্কুল থেকে এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন দ্বিতীয় বিভাগে। ১৮৮১ সনে বেথুন স্কুলে বি. এ. ক্লাস খোলা হল। এবার সেখানে চন্দ্রমুখীও যোগ দিলেন কাদম্বিনীর সঙ্গে। ১৮৮৩ সালে এঁরা দুজনেই বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বাংলার নারী সমাজের পক্ষে এটি একটি বিশিষ্ট দিন। চতুর্দিকে এক বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হল। অজস্র আশীর্বাদ বর্ষিত হতে লাগল তাঁদের উপর। বিদ্যাসাগর মহাশয় চন্দ্রমুখী বসুকে উপহার দিলেন এক সেট শেক্‌স্‌পিয়র গ্রন্থ। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একটি বড় কবিতা লিখলেন। তার একটি স্তবক এই :

হরিণ-নয়না শুন কাদম্বিনী বালা,
শুন ওগো চন্দ্রমুখী কৌমুদীর মালা,
তোমাদের অগ্রপাঠী আমি একজন,
অই বেশ, ও উপাধি করেছি ধারণ।
যে ধিক্কারে লিখিয়াছি বাঙালীর মেয়ে,
তারি মত সুখ আজ তোমা দোঁহা পেয়ে॥
বেঁচে থাক, সুখে থাক, চিরসুখে আর!
কে বলেরে বাঙালীর জীবন অসার।—
কি আশা জাগালি হৃদে কে আর নিবারে?
ভাসিল আনন্দভেলা কালের জুয়ারে ;
ধন্য বঙ্গ নারী, ধন্য, সাবাসি তুহারে।

বি. এ. পাশ করার পর দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে কাদম্বিনীর বিবাহ হয়। দ্বারকানাথের প্রথম স্ত্রীর কিছুদিন আগে মৃত্যু হয়েছিল। বলাবাহুল্য, বয়সে কাদম্বিনী ছিলেন দ্বারকানাথের চেয়ে অনেক ছোট। তবে সেযুগে এমন অসমবয়সের বিবাহ অপ্রচলিত ছিল না। শিবনাথ শাস্ত্রী দ্বারকানাথকে 'আমাদের হীরো' বলেছেন, কারণ ঢাকা থেকে 'অবলাবান্ধব' সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করে নারীজাতির উন্নতির নানা

চেষ্টা তিনি করেছেন। কলকাতাতে এসেও তিনি ব্রাহ্মসমাজের বন্ধুদের সহযোগিতায় নারীজাতির কল্যাণের প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন। কেশব সেনের বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে তিনি ছিলেন প্রধান। সেই দ্বারকানাথ কাদম্বিনীকে নিজের মনের মতো করে গড়ে তুলেছেন।

দ্বারকানাথ পত্নীকে মেডিকেল কলেজে পড়ার জন্য উৎসাহিত করলেন। মহিলারা যাতে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে পারেন, সেজন্য দ্বারকানাথ আবার আন্দোলন শুরু করেন। মেডিকেল কলেজের অধ্যাপকসভার মনোভাব কঠোর। তাঁরা মহিলাদের মেডিকেল কলেজে পড়ার বিপক্ষে যুক্তি দেখালেন—ছাত্র ও ছাত্রীদের একসঙ্গে ক্লাস নেওয়ার অসুবিধা এবং তা ছাড়া চিকিৎসাবিদ্যা আয়ত্ত করা মহিলাদের পক্ষে দুঃসাধ্য! কিন্তু বাংলার ছোটলাট স্যার রিভার্স অগস্টাস টমসন মেডিকেল কলেজের অধ্যাপকসভার আপত্তিগুলি অগ্রাহ্য করে আদেশ দিলেন, যোগ্যতা থাকলে মহিলাদেরও ভর্তি করতে হবে। এই আদেশ-বলে ১৮৮৪ সালে কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে সক্ষম হলেন।

সেযুগের চিকিৎসক-সমাজ, বিশেষ করে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসের অফিসাররা মহিলাদের চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন না। ১৮৮৪ সালের ইণ্ডিয়ান মেডিকেল গেজেটের মন্তব্য : আমরা এই প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করি। তবে আমাদের অভিমত এই যে মহিলারা ডাক্তারির চেয়ে নার্সের কাজেই অধিকতর যোগ্য এবং দেশের প্রয়োজন মেটাতে দরকার মহিলা ডাক্তারের পরিবর্তে একদল সুশিক্ষিত নার্সের।

কিন্তু বঙ্গদেশের শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের এ ব্যাপারে উৎসাহ ছিল প্রচুর। ১৮৮৪ সালে কাশিমবাজারের মহারানী স্বর্ণময়ী দেবী মহিলাদের পৃথক ছাত্রী নিবাসের জন্য দেড় লক্ষ টাকা দান করলেন মেডিকেল কলেজে। মেয়েদের জন্য আলাদা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে আরো আট লক্ষ টাকা দান করবেন বলেও তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন।

কাদম্বিনী মেডিকেল কলেজে ভর্তি হলেন বটে, তবে অধ্যাপকদের কেউ কেউ ব্যাপারটাতে খুশী হলেন না। তাঁরা তাঁদের অসন্তোষ প্রকাশ করতে দ্বিধা করলেন না। কতকগুলি অসুবিধা অধ্যাপকদেরও ছিল। যেমন শারীরস্থান পড়াতে গেলে শরীরের প্রতিটি অঙ্গের বর্ণনা দিতে হয়। একটি ছাত্রীর সামনে অনভ্যস্ত অধ্যাপকদের পক্ষে পুরুষ ও নারীর বিভিন্ন অঙ্গের বর্ণনা দেওয়া সহজ নয়, আবার ছাত্রদের পক্ষেও সেসব শোনা লজ্জার কারণ হয়। ছাত্রীটির অবস্থা যে কত শোচনীয় হতে পারে, তা সহজেই অনুমান করা যায়। মাদ্রাজ মেডিকেল কলেজে যখন প্রথম মহিলা ভর্তি হলেন, তখন শল্য চিকিৎসক প্রথমদিন ক্লাসের মধ্যে মহিলাদের উপস্থিতিতে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। বোম্বাই-এর গ্রাণ্ট মেডিকেল কলেজে ১৮৮৩ সালে প্রথম মহিলা ভর্তি হবার পর কয়েকটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। মহিলাদের প্রতি অপমান-সূচক মন্তব্য করা, শিস্ দেওয়া, এমনকি পাথরের নুড়ি ছোঁড়া ইত্যাদি ঘটনা ঘটতে থাকে। একটি ছাত্রকে মেয়েদের অপমান করার অভিযোগে কলেজ থেকে বহিষ্কৃতও করা হয়। কলকাতায় তেমন কোনো বিসদৃশ ব্যাপার ঘটেনি। কাদম্বিনী ছেলেদের সঙ্গে পূর্ণ আত্মমর্যাদা নিয়ে পড়তে থাকেন। ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলে ১৮৮৮ সাল থেকে ছাত্রী নেওয়া শুরু হয়। তারা যখন ক্লাসে ঢুকতেন, তখন সঙ্গে থাকতেন একজন বর্ষীয়সী মেট্রন। তারা বসতেন পর্দার আড়ালে। ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে কাদম্বিনী দেবী মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষা দিলেন। এতদিন পর্যন্ত কাদম্বিনী পর পর সাফল্য অর্জন করেছেন। বিফলতার ব্যথা যে কী, তা তিনি জানতেন না। কিন্তু এই পরীক্ষাতে তাঁর জীবনের সর্বপ্রথম ব্যর্থতা। অন্য সব বিষয়ে কৃতকার্য হলেও মেডিসিনে উত্তীর্ণ হতে পারলেন না। এর কারণ সম্পর্কে কাদম্বিনীর পুত্র প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় 'বাংলার নারী জাগরণ' এ লিখেছেন—"মেডিকেল কলেজে সে সময়ে এক বাঙালী অধ্যাপক ছিলেন। তিনি নারীশিক্ষার ঘোর বিরোধী ছিলেন। অধীত বিষয়ের কার্যকরী জ্ঞানের পরীক্ষার (Practical examination) সময় তিনি একটি বিষয়ে

প্রয়োজনীয় নম্বর দিলেন না। মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ বেশ জানিতেন যে ওই বিষয়ে কাদম্বিনীর বেশ দক্ষতা আছে, কিন্তু পরীক্ষকের অভিমতের বিরুদ্ধে কিছু করিবার ক্ষমতা না থাকায় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. বি. উপাধি এক্ষেত্রে প্রদান করিতে পারিলেন না, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন হইবার পূর্বে মেডিকেল কলেজের ছাত্রদিগকে গ্র্যাজুয়েট অফ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজ (জি. বি. এম. সি.) উপাধি অধ্যক্ষই দিতেন, সে অধিকার বন্ধ করিয়া কোনও আইননামা হয় নাই। সে জন্য যদিও বহুদিন ওই উপাধি কাহাকেও দেওয়া হয় নাই, তবুও এক্ষেত্রে তিনি কাদম্বিনীকে উহা প্রদান করিয়া তাঁহাকে চিকিৎসা করিবার অধিকার দিলেন ও মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট ইডেন হাসপাতালের চিকিৎসক নিযুক্ত করিলেন।'

এই বাঙালী অধ্যাপক হলেন ডাঃ আর. সি. চন্দ্র। মেডিকেল কলেজের প্রথম ছাত্রী হওয়ার সৌভাগ্য কাদম্বিনীর, কিন্তু প্রথম মহিলা মেডিকেল গ্র্যাজুয়েট হওয়ার কৃতিত্ব থেকে তিনি বঞ্চিত। সে কৃতিত্ব বেথুন স্কুলেরই অন্য দুই প্রাক্তন ছাত্রীর। তাঁরা হলেন বিধুমুখী বসু এবং ভার্জিনিয়া মেরী মিত্র। বিধুমুখী বসু চন্দ্রমুখী বসুর ভগ্নী। ১৮৮১ সালে দেরা স্কুল থেকে এন্ট্রাস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ভার্জিনিয়া মেরী মিত্রও ঐ বছর কানপুর বালিকা বিদ্যালয় থেকে এন্ট্রাস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এঁরা দুজনেই ১৮৮৯ সালে মেডিকেল কলেজ থেকে এম. বি. উপাধি লাভ করেন। ভার্জিনিয়া পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করেন। পরে তাঁর বিবাহ হয় ডাক্তার পি.সি. নন্দীর সঙ্গে।

কাদম্বিনী কিন্তু এই ব্যর্থতায় দমলেন না। দ্বারকানাথও নিরাশ হওয়ার পাত্র নন। ১৮৯২ সালে কাদম্বিনী পাড়ি দিলেন ইংল্যাণ্ডে। ইতিমধ্যে তিনি সন্তানের জননী হয়েছেন। তারা তখন শিশু। যাই হোক, কাদম্বিনী এডিনবরা ও গ্লাসগো থেকে এল. আর. সি. পি. ও এল. আর. সি. এস. এবং ডাবলিন থেকে এল. এফ. পি. এস. উপাধি নিয়ে দেশে ফিরে এলেন। ফিরে এসে তিনি কিছুদিন কাজ করেন কলকাতার লেডি ডাফরিন হাসপাতালে। পরে শুরু করেন স্বাধীন

ব্যবসা। কিছুদিনের মধ্যেই স্ত্রীরোগের চিকিৎসক হিসাবে তাঁর নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। নেপালের রাজ পরিবারে চিকিৎসা করার জন্য তাঁকে ডাকা হত। একবার সেখানে মরণাপন্ন রানীকে চিকিৎসা করে সুস্থ করে তোলার জন্য পুরস্কারস্বরূপ উপহার পেলেন প্রচুর সোনাদানা এবং একটি টাট্টু ঘোড়া। পরে কুমারী যামিনী সেনের উপর তিনি রাজ পরিবারের চিকিৎসার দায়িত্ব অর্পণ করেন। এই যামিনী সেন ১৯১২ সালে গ্লাসগোর 'রয়াল ফেকালটি অব ফিজিসিয়ন এণ্ড সার্জন'-এর ফেলো হয়ে মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম এই ডিপ্লোমা অর্জনের কৃতিত্ব অর্জন করেন।

১৮৯৮ সালে দ্বারকানাথের মৃত্যু হয়। কাজ করার অফুরন্ত শক্তি ছিল তাঁর। সমাজ সংস্কারে যেমন, রাজনীতিতেও তেমনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন তিনি। কাদম্বিনী দেবীর মধ্যেও স্বামীর অনেক গুণই বিকশিত হয়ে উঠেছিল। ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে বোম্বাই শহরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশনে বঙ্গদেশ থেকে দুইজন মহিলা প্রতিনিধি যোগদান করেন। বঙ্গদেশ থেকে মহিলাদের কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দেওয়া এই প্রথম। এই দুইজন মহিলার একজন হলেন রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগ্নী স্বর্ণকুমারী দেবী এবং অন্যজন কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়।

পরের বছর কংগ্রেস অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় কলকাতায়। এবারেও এই দুজন মহিলা অধিবেশনে যোগ দেন প্রতিনিধি হিসাবে। অধিবেশন-শেষে কাদম্বিনী সভাপতিকে ধন্যবাদ দান প্রসঙ্গে একটি বক্তৃতা দেন। অ্যানি বেসান্ত এই ঘটনার উল্লেখ করে বলেন, 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যে ভারতীয় নারী জাতিরও উন্নতির দ্যোতক, এ ব্যাপারে তাই সূচিত হল।' ১৯০৬ সালে কলকাতা কংগ্রেসের সময় যে মহিলা সম্মেলন হয়, কাদম্বিনী ছিলেন তার প্রধান উদ্যোক্তা।

দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভালে গান্ধীজীর নেতৃত্বে ১৯০৮ সনে সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ হলে এর সমর্থনে কলকাতায় 'ট্রান্সভাল

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠিত হয়। কাদম্বিনী দেবীকে এর প্রথম সভানেত্রীরূপে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়।

মহিলা-সংক্রান্ত সকল শুভ কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কাদম্বিনী। পূর্ব-ভারতের কয়লা খনির নারী শ্রমিকদের অবস্থা অনুসন্ধানের জন্য সরকার ১৯২২ সালে কবি কামিনী রায় ও ডাক্তার কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়কে নিয়ে একটি কমিটি নিযুক্ত করেন। তাঁরা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে নারী-শ্রমিকদের অবস্থা নিজেদের চোখে দেখেন।

১৯২৩ খ্রীস্টাব্দের ৩রা অক্টোবর তারিখে এই অক্লান্ত মহিলা চিকিৎসকের মৃত্যু হয়। আটটি সন্তানের জননী হিসাবে একদিকে সংসারের সকল দায়িত্ব পালন করা, তার উপর রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করা—প্রচুর প্রাণশক্তি থাকলেই কোন নারীর পক্ষে এত সব কাজ করা সম্ভব। সাংসারিক কাজকর্ম তো তিনি করতেনই, নানারকম সূচিশিল্পেও তাঁর অদ্ভুত হাত ছিল। ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে যখন তিনি রোগী দেখতে যেতেন, তখনও তাঁর হাতে থাকত 'ডিজাইনের' কাজ।

কাদম্বিনীর কন্যা জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিতা স্বনামধন্যা নারী। শিক্ষাব্রতীরূপেও তিনি পরিচিতা। পুত্র প্রভাতচন্দ্র সাংবাদিক ছিলেন। কিছুকাল আগে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

নতুন দিনের সূচনায়

আমাদের দেশে পারদর্শী চিকিৎসকের অভাব কোনোকালেই ছিল না। তাঁরা চিকিৎসা-ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন, জীবদ্দশায় প্রচুর সম্মানও পেয়েছেন। কিন্তু মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের অনেকের নাম মুছে গেছে মানুষের মন থেকে। হয়তো তার কারণ, তাঁরা এমন কোনো স্থায়ী চিহ্ন রেখে যেতে পারেননি, যার জন্য ভবিষ্যতের লোকে তাঁদের কথা মনে রাখতে পারে।

আবার এমন চিকিৎসকও দু-চারজন ছিলেন, যাঁরা নিজেদের নৈপুণ্যে চিকিৎসার মান অতি উচ্চে স্থাপন করেছিলেন এবং যাঁরা চিকিৎসার বাইরে বহু সমাজহিতকর কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন। তাঁদের নাম মৃত্যুর পরও দেশবাসীর স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। স্যার নীলরতন সরকার, লেফটান্যাণ্ট কর্ণেল সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারী এবং স্যার কেদারনাথ দাস এমনি তিনটি নাম, যা বাংলার তথা ভারতের চিকিৎসক-সমাজের স্মৃতিতে চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে আছে। এই তিনজন কেবল যশস্বী চিকিৎসকই ছিলেন না—প্রজ্ঞায়, কর্মকুশলতায়, চারিত্র-বৈশিষ্ট্যে চিকিৎসকদের মর্যাদা এমন উচ্চস্তরে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন যে তখন থেকে দেশীয় চিকিৎসকগণ দেশবাসীর কাছে ইয়োরোপীয় চিকিৎসকদের সমকক্ষ বলে স্বীকৃত হলেন। বলা চলে, এঁরা ছিলেন পরবর্তী চিকিৎসকদের গুরু।

নীলরতন-সুরেশপ্রসাদ সরকারী চাকরি গ্রহণ করেননি। কেদারনাথ সরকারী চাকরিতে যোগ দিয়েছিলেন। সেজন্য নীলরতন-সুরেশ প্রসাদের চিন্তাধারা ছিল স্বাধীন এবং ইচ্ছামতো কাজ করার সুযোগ ছিল তাঁদের। সে সময়ে ডাক্তারি পাশ করার পর অনেকেই সরকারী চাকরিতে যোগ দিতেন সাব-অ্যাসিস্টাণ্ট সার্জন হিসাবে। যাঁদের সুযোগ হত তাঁরা যোগ দিতেন আই. এম. এস-এ। নীলরতন-সুরেশপ্রসাদ

সেযুগে স্পর্ধিত ব্যতিক্রম। এঁরা সরকারী চাকরিতে যোগ দিলেন না;
আই. এম. এস-ও হলেন না; কিন্তু আই. এম. এস. ডাক্তারদের ফি-র
সমান ফি ধার্য করলেন। যদি কেউ মনে করেন তাঁরা অর্থলোভী ছিলেন,
তাহলে ভুল করবেন। তাঁরা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন, ভারতীয়েরা
কোনো অংশে বিদেশীদের চেয়ে কম নয়।

১৮৫৪ সালের আগে আই. এম. এস-এ ভারতীয়দের প্রবেশাধিকার
ছিল না। পরে যেসব ভারতীয় আই. এম. এস-এ নিযুক্ত হয়েছিলেন,
তাঁদের আচার-ব্যবহারও ছিল প্রায় সাহেবদেরই মতো। সাহেব মহলে
তাঁদের যতই ঘনিষ্ঠতা থাক না কেন, তাঁরা ছিলেন পরনির্ভর, অনুগত
ও আজ্ঞাবাহী। বেসরকারী দেশীয় ডাক্তাররা আই. এম. এস ডাক্তার-
দের তুলনায় ছিলেন অনেক নিষ্প্রভ। কিন্তু নীলরতন-সুরেশপ্রসাদ
রাতারাতি অবস্থা পালটে দিলেন। যারা আগে আই. এম. এস. ডাক্তার
ছাড়া আর কাউকে দিয়ে চিকিৎসা করাবার কথা ভাবতে পারতেন না,
এখন তাঁরাও দেশীয় ডাক্তারদের ডাকতে লাগলেন। সুরেশপ্রসাদের
পিতা লব্ধ প্রতিষ্ঠ ডাক্তার সূর্যকুমার পুত্রকে বলেছিলেন: 'তুমি কোন
সাহসে ষোল টাকা ফি চাও? ষোল টাকায় আই.এম. এস. ডাক্তার
পাওয়া যায়, তাদের ছেড়ে লোকে তোমায় কেন ডাকবে? এই বৃদ্ধ
বয়সে এত অভিজ্ঞতার পরও আমি আট টাকা ফি নিই, তা জান?'

সুরেশপ্রসাদ পিতার সঙ্গে তর্ক করলেন না বটে, তবে নিজ সিদ্ধান্তে
অটল রইলেন।

নীলরতন সরকার এবং সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারীর মধ্যে সখ্যতা
ছিল, আদর্শগত মিল ছিল। দুজনেরই উদ্দেশ্য ছিল দেশীয় ডাক্তারদের
ইয়োরোপীয় ডাক্তারদের সমান আসনে প্রতিষ্ঠিত করা। আবার দুজনের
আকৃতি ও প্রকৃতিতে বৈসাদৃশ্যেরও অন্ত ছিল না। নীলরতনের জন্ম
দরিদ্রের ঘরে, দেহ বলিষ্ঠ, আয়ু দীর্ঘ, আচরণ অতি মার্জিত; অন্যদিকে
সুরেশপ্রসাদের জন্ম সম্ভ্রান্ত ধনীর গৃহে, দেহ অতি ক্ষীণ, আয়ু স্বল্প,
ব্যবহারে রূঢ়তার প্রকাশ। নীলরতন সরকার নিজেই বন্ধু সম্বন্ধে
বলেছেন, 'তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে অনেকেরই হৃৎকম্প হত।'

নীলরতন সরকারের জন্ম ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে ডায়মণ্ড হারবারের নেত্রা গ্রামে। তাঁর পিতা নন্দলাল সরকারের অবস্থা বিশেষ সচ্ছল ছিল না। নীলরতন ১৮৭৬-এ জয়নগর স্কুল থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। স্কুল-জীবনে যন্ত্রবিদ্যার প্রতি তাঁর বিশেষ কৌতূহল দেখে সবাই ভাবতেন, নীলরতন ইঞ্জিনিয়ার হবেন। কিন্তু এণ্ট্রান্স পরীক্ষার আগে দুরারোগ্য ব্যাধিতে তাঁর মাতার মৃত্যু হওয়ায় তিনি চিকিৎসা-বিদ্যার প্রতি আকৃষ্ট হলেন। রোগীর প্রতি নীলরতনের যে সীমাহীন সমবেদনা ছিল, তার কারণ বোধ হয় মাতার সেই রোগযন্ত্রণার স্মৃতি।

আর্থিক অবস্থার জন্য তাঁকে ভর্তি হতে হল ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলে। এই সময়ে ক্যাম্পবেল স্কুলে বাংলাভাষায় শিক্ষা দেওয়া হত। ১৯০৪ সাল পর্যন্ত এই স্কুলে শুধু বাংলা ভাষার ব্যবহারই চলে। ১৮৮০ সালে নীলরতন মেডিকেল স্কুলের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। স্কুলের শিক্ষায় তাঁর জ্ঞানস্পৃহা তৃপ্ত হওয়ার কথা নয়। স্কুল থেকে পাশ করলে সাব অ্যাসিস্টাণ্টের চাকরি পাওয়া যেতো। কিন্তু নীলরতন চাকরি নিলেন না। ক্রমে এল. এ. এবং বি. এ. পাশ করলেন। কিছুদিন স্কুলে শিক্ষকতাও করলেন। ১৮৮৫ সালে ভর্তি হলেন মেডিকেল কলেজে। ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মেকেঞ্জির সুপারিশে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হতে সক্ষম হলেন তিনি। তখন থেকে শুরু হল তাঁর জীবনের এক নতুন অধ্যায়। তাঁর প্রতিভা ক্রমে বিকশিত হতে লাগল। তিনি 'গুডিভ' বৃত্তি লাভ করলেন। ১৮৮৮ সালে কয়েকটি বিষয়ে অনার্স পেয়ে এম. বি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। এরপর মেয়ো হাসপাতালে 'হাউসস্টাফ' হিসাবে কাজ করেন। এই সময়ই ১৮৮৯ সালে এম. এ পাশ করেন। এম. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন ১৮৯০ সালে। তাঁর আগে মাত্র ছয়জন এম. ডি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁরা হলেন চন্দ্রকুমার দে (১৮৬২), মহেন্দ্রলাল সরকার ও জগবন্ধু বসু (১৮৬৩), আর. ডবলু. কার্টার (১৮৬৫), ভাগবতচন্দ্র (১৮৮০), রামপ্রসাদ বাগচি (১৮৮৭)। এবার নীলরতন স্বাধীন ভাবে চিকিৎসা ব্যবসায় শুরু করেন। প্রথম দিকে প্রখ্যাত ডাক্তার

বৌবাজারের জগবন্ধু বসুর কাছ থেকে তিনি পেয়েছিলেন অকুণ্ঠ উৎসাহ ও সহযোগিতা। অতি অল্পদিনেই নীলরতন নিজ প্রতিভায় ভাস্বর হয়ে উঠলেন। তাঁর খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। চিকিৎসক-সমাজ বিনা দ্বিধায় তাঁকে নেতা বলে স্বীকার করে নিল। প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে তিনি ছিলেন চিকিৎসক-সমাজের অবিসংবাদিত নেতা। দু-টাকা দর্শনী দিয়ে শুরু হয়েছিল তাঁর চিকিৎসা ব্যবসা, পরে তাঁর দর্শনী চৌষট্টী টাকা পর্যন্ত উঠেছিল।

নীলরতন রোগীদের কাছে ছিলেন ধন্বন্তরি, আশার প্রতীক। চিকিৎসায় তাঁর এমনই যশ ছিল যে তাঁর নাম শোনামাত্র মৃত্যুপথ যাত্রীরও মনে আশার সঞ্চার হত।

নীলরতন যখন প্র্যাক্‌টিস শুরু করেন, তখন চিকিৎসা-বিজ্ঞানের আরো উন্নতি হচ্ছে। পাস্তুর আগেই জীবাণুর অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন। কিছু দিন আগে রবার্ট কক যক্ষার এবং কলেরার জীবাণু আবিষ্কার করেছেন। লিস্টার বীজবারক (antiseptic) অস্ত্রোপচার চালু করে অস্ত্রোপচারের ভয়াবহতা দূর করলেন। নীলরতন এই সব চাঞ্চল্যকর আবিষ্কারে উদ্‌বুদ্ধ হয়েছিলেন। শেষ জীবনে তিনি অ্যান্টি-বায়োটিক বা বীজঘ্নের ব্যবহারও করতে পেরেছিলেন।

নীলরতন রোগীকে অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করতেন। কোনো কোনো রোগী উপসর্গের কথা বলতে গিয়ে যখন বিরাট ইতিহাস ফেঁদে বসে, তখন অনেক চিকিৎসক বিরক্তি বোধ করেন, কিন্তু নীলরতন রোগীর সব কথা শুনতেন। রোগীর প্রতি গভীর সহানুভূতিই এর কারণ। তাঁর মতো এত দরদী চিকিৎসকের সংখ্যা খুবই কম। তাঁর ফি বেশি ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু অর্থের প্রতি তাঁর লোভ ছিল না। কত দরিদ্র রোগীকে তিনি বিনা দর্শনীতে দেখেছেন, কত রোগীর ওষুধপথ্য কিনে দিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। তাই নীলরতনের নাম রাজা-মহারাজা থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের কাছেও অতি প্রিয়।

সহকর্মী চিকিৎসকদের প্রতি তাঁর বিনম্র আচরণ চিকিৎসকদের কাছে চিরকালের আদর্শ হয়ে আছে। তিনি বিশ্বাস করতেন এবং নিজে

প্রমাণ করেছেন, ভারতীয় চিকিৎসকরা বিদেশী চিকিৎসকদের চেয়ে কোনো দিক দিয়ে ছোট নয়। কোনো সহকর্মীকে হেয় প্রতিপন্ন করা ছিল তাঁর নীতিবিরুদ্ধ। প্রতিযোগিতায় কদর্যতা বা নিন্দাবাদ তিনি আন্তরিক ঘৃণা করতেন।

চিকিৎসকদের সঙ্ঘবদ্ধ করার জন্য ১৯০১ সালে প্রধান উদ্যোক্তা হয়ে তিনি 'ক্যালকাটা মেডিকেল ক্লাব' প্রতিষ্ঠা করেন। বস্তুত এই ক্লাবের কাজ প্রথম কয়েক বছর তাঁর ৬১ নম্বর হ্যারিসন রোড়ের বাড়ি থেকেই চলে। দীর্ঘ ১৭ বছর তিনি এই ক্লাবের সভাপতি ছিলেন। মৃত্যুর আগে তাঁর মূল্যবান লাইব্রেরিটি তিনি এই ক্লাবকে দান করে যান। ইণ্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েসন গঠনেও তিনি ছিলেন উদ্যোগী। বহুবছর তিনি আই. এম. এ-র বিখ্যাত জার্নালের প্রধান সম্পাদক ছিলেন। ১৯১৮ এবং ১৯৩২ সালে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত চিকিৎসক সম্মেলনে তিনি সভাপতিত্ব করেন।

নীলরতন সারাজীবন দেশের উন্নতির স্বপ্ন দেখেছেন আর সেই সব স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত করার চেষ্টা করেছেন। তা করতে গিয়ে অনেক সময় আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে, তবু তিনি হতাশ হননি বা অনুতপ্ত হননি। স্বপ্ন দেখেছেন, বিদেশী চিকিৎসকদের প্রভাব থেকে এদেশকে মুক্ত করার। রয়েল কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দেবার সময় তিনি পরিষ্কার বলেন, সমস্ত কাজে বিদেশীদের পরিবর্তে যোগ্য দেশীয় ব্যক্তিকে নিযুক্ত করতে হবে। নীলরতন স্বপ্ন দেখেছিলেন, দারিদ্র্য ও অশিক্ষা দূর করার। আচার্য প্রফুল্ল রায়ের মতো তিনিও বাঙালীদের শিল্প-বাণিজ্যের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন। বাধা-বিপত্তি অগ্রাহ্য করে তিনি ট্যানারি ব্যবসা শুরু করলেন। বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে ট্যানারির কাজে তিনিই পথিকৃৎ। সাবান তৈরির কারখানাও তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। বেঙ্গল কেমিকেল, বেঙ্গল ইমিউনিটি প্রভৃতি ওষুধ তৈরির প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি প্রথম থেকে জড়িত। জলপাইগুড়ি অঞ্চলে কয়েকটি চা বাগানও তিনি প্রতিষ্ঠা করেন।

'শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে তাঁর তুলনা একমাত্র স্যার আশুতোষের সঙ্গে

হতে পারে।' চিকিৎসা-বিদ্যার কথাই ধরা যাক। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন সরকারী কলেজগুলিতে ইয়োরোপীয় চিকিৎসকদের এতই প্রভাব যে দেশীয় চিকিৎসকদের প্রতিভা বিকাশের সেখানে নানা অন্তরায়। সেজন্য ১৮৯৫ সালে সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারী ও আরো কয়েকজন সহকর্মীর সহায়তায় 'কলেজ অব ফিজিসিয়ন অ্যাণ্ড সার্জন' প্রতিষ্ঠা করেন। এটিই হল ভারতে প্রথম বেসরকারী কলেজ।

১৯০৪ সালে এই কলেজ ক্যালকাটা স্কুল অব মেডিসিনের সঙ্গে মিলে গিয়ে 'ক্যালকাটা মেডিকেল স্কুল ও কলেজ অব ফিজিসিয়নস্ এণ্ড সার্জনস অব বেঙ্গল' নামে পরিচিত হয়। এখানে শিক্ষা দেওয়া হত দুটি বিভাগে। একটিতে স্কুলের মান অনুযায়ী চার বৎসরের পাঠক্রম চালিত হত বাংলা ভাষায়, অন্যটিতে কলেজের মান অনুসারে পাঁচ বৎসরের পাঠক্রম চলত ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে। এই প্রতিষ্ঠানটি কলেজের রূপ নেয় ১৯১৬ সালে। ঐ বছর ৫ই জুলাই লর্ড কার্মাইকেল কলেজটির উদ্বোধন করেন। ১৯১৭ সালে কলেজটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করে। এই কলেজ পরিচালনা করার জন্য ১৯১৮ সালে একটি পরিচালক-সমিতি গঠিত হয়। এর নাম 'মেডিকেল এডুকেশন সোসাইটি'।

এই সমিতির প্রথম সভাপতি সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারী। দ্বিতীয় সভাপতি স্যার কৈলাসচন্দ্র বসু। তৃতীয় সভাপতি নীলরতন সরকার। নীলরতন ১৯২২ সাল থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত দীর্ঘকাল সভাপতি পদে থেকে কলেজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির চেষ্টা করেন। ১৯৪২ সালে এই কলেজে তাঁর নামে একটি গবেষণাগার তৈরি হয়। আই. এম. এস. অফিসারদের বিরোধিতা সত্ত্বেও যে এই কলেজের উন্নতি হয়েছিল, তার কারণ সুরেশপ্রসাদ, নীলরতন, রাধাগোবিন্দ কর প্রমুখ প্রতিপত্তিশালী ও কর্মনিষ্ঠ চিকিৎসকদের ঐকান্তিক চেষ্টায়। ১৯৪৮ সালে কলেজের নতুন নামকরণ হয় আর. জি. কর. মেডিকেল কলেজ। ১৯৫৮ সালে কলেজটির পরিচালনাভার সরকার গ্রহণ করেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-কলেজ স্থাপনে নীলরতন ছিলেন

প্রধান উদ্যোক্তাদের অন্যতম। যাদবপুরের জাতীয় শিক্ষাপরিষদ ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপনেও তাঁর অবদান যথেষ্ট। 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর কালটিভেশন অব সায়েন্স' এবং 'বসু বিজ্ঞান মন্দিরে'র সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ট্রাস্টের তিনি ছিলেন সভাপতি এবং 'চিত্তরঞ্জন সেবাসদন' প্রতিষ্ঠায় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের প্রধান উপদেষ্টা।

আধুনিক চিকিৎসা-পদ্ধতিতে শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও ভারতের প্রাচীন আয়ুর্বেদকে নীলরতন কখনো অবজ্ঞা করেননি। বস্তুত তিনি অনুভব করেছিলেন প্রতিটি চিকিৎসা-পদ্ধতিরই কিছু না কিছু বৈজ্ঞানিক ভিত্তি রয়েছে এবং আমাদের দেশের বহু লোক আয়ুর্বেদ এবং হোমিওপ্যাথির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু অযোগ্য এবং অল্পশিক্ষিত লোকের হাতে এই সব চিকিৎসাপদ্ধতি এমন এক অবস্থায় পড়েছে যে হাতুড়ে চিকিৎসার সঙ্গে এদের কোনো পার্থক্য নেই। নীলরতনের মতে, যে পদ্ধতিরই হোক না কেন, চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ছাত্রকে রসায়নশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা প্রভৃতি মৌল বিজ্ঞানগুলি অবশ্যই শিক্ষা করতে হবে। এইসব বিষয়ে সম্যক ধারণা না থাকলে চিকিৎসা-বিদ্যায় প্রকৃত জ্ঞানলাভ করা অসম্ভব।

সাধারণ চিকিৎসক ভাবেন রোগীর চিকিৎসা করাই তার একমাত্র দায়িত্ব। রোগীর চিকিৎসা ছাড়া যে আরো কিছু দায়িত্ব তার আছে সে কথা তার মনে আসে না। নীলরতন ব্যস্ত চিকিৎসক হওয়া সত্ত্বেও জনস্বাস্থ্যের জন্য চিন্তা করেছেন। তিনি বুঝেছিলেন দারিদ্র্য এবং ব্যাধি অঙ্গাঙ্গি জড়িত। যেখানেই দারিদ্র্য, সেখানেই দূষিত, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ; সেখানেই ব্যাধি। নোংরা আবর্জনা দূর না করলে, শোধিত জল সরবরাহ না করলে এবং অন্যান্য জনস্বাস্থ্যমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন না করলে দেশে রোগহ্রাসের সম্ভাবনা নেই। বহু প্রবন্ধে এবং ভাষণে (যেমন অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ ১৯৩৯ সন) এই সব বিষয়ের উপর জোর দেন।

নীলরতন যে সময়কার লোক সে সময়ে সারা দেশ দেশাত্মবোধের তরঙ্গে উদ্বেলিত। তাঁর মতো অনলস কর্মীর পক্ষে রাজনীতি থেকে দূরে

সরে থাকা সম্ভব ছিল না। জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে প্রতিনিধি হিসাবে তিনি কয়েকবার যোগ দিয়েছেন। ১৯১২ সাল থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত বঙ্গীয় আইন-পরিষদের সদস্য ছিলেন তিনি। তবে রাজনীতির উগ্রতা তাঁর মানসিকতার প্রতিকূল ছিল। তাই যোগ দিলেন মডারেটদের সঙ্গে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলেন মডারেটদের প্রতি দেশবাসীর শ্রদ্ধা নেই। ক্রমে প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে তিনি সরে এলেন।

ডাঃ সরকার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন। ১৯১৯ সাল থেকে ১৯২১ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। বহুদিন ফেকালটি অব মেডিসিন এবং ফেকালটি অব সায়েন্সের ডীন ছিলেন। এমনকি কলাবিভাগের স্নাতকোত্তর পরিষদেরও সভাপতি ছিলেন। এম্পায়ার ইউনিভার্সিটি কনফারেন্সে যোগ দেওয়ার জন্য ডাঃ সরকার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসাবে ১৯২০ সালে ইংল্যাণ্ডে যান। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডি. সি. এল. এবং এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় এল. এল. ডি. উপাধিতে ভূষিত করে। ১৯৩৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানসূচক ডি এস. সি. উপাধি দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করে। তিনি 'নাইট' উপাধি লাভ করেন ১৯১৮ সালে।

নীলরতনের এক পুত্র ও পাঁচ কন্যা। পুত্র অরুণপ্রকাশ ব্যবসা করতেন। জামাতাদের সকলেই কৃতী পুরুষ। তাঁরা হলেন দেবেন্দ্রমোহন বসু, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, ভূপতিমোহন সেন, সুধীর সেন এবং অশোক চট্টোপাধ্যায়। নীলরতনের ভ্রাতা বিখ্যাত শিশুসাহিত্যিক যোগীন্দ্রনাথ সরকার। ভাবলে আশ্চর্য লাগে, পাড়াগাঁয়ের দরিদ্র গৃহস্থের ছেলে নীলরতন দারিদ্র্যের জন্য প্রথম দিকে মেডিকেল কলেজে পড়তে পারেননি, স্কুলমাস্টারি করে তাঁকে অর্থ সঞ্চয় করতে হয়েছিল। অনেক আঘাতও পেয়েছেন তিনি জীবনে কিন্তু কখনো দমে যাননি। অদম্য আকাঙ্ক্ষা আর প্রবল আত্মপ্রত্যয়ের জোরে একটির পর একটি বাধা অতিক্রম করেছেন।

নীলরতনের মধ্যে দম্ভের লেশমাত্র ছিল না। তাঁর চরিত্র-মাধুর্য, মানসিক স্থৈর্য ও প্রশান্তি ছিল অনন্যসাধারণ। উপার্জন করেছিলেন রাজার ঐশ্বর্য, কিন্তু সবই তিনি ব্যয় করেছেন দেশের ও দশের কাজে। নানা পরীক্ষামূলক ব্যবসায়ে হাত দিয়ে লোকসান দিতে দিতে তিনি সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন। দেনার দায়ে তাঁর বাড়ি পর্যন্ত বিক্রি হয়ে যায়। সে সময়েও তাঁর ধৈর্য ছিল অটুট। তিনি বলতেন, 'কলকাতায় কুড়ি টাকায় ঘর ভাড়া পাওয়া যায়, তাতেই আমার চলে যাবে।' অল্পবয়স থেকেই ব্রাহ্ম-সমাজভুক্ত হয়েছিলেন। তিনি সমাজের সম্পাদক ও পরে সভাপতিও হয়েছিলেন।

নীলরতন রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ সুহৃদ ছিলেন। উভয়ের প্রতি উভয়েরই ছিল শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। রবীন্দ্রনাথ 'সেঁজুতি' গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন নীলরতনের নামে। রবীন্দ্রনাথের জীবনের অন্তিম পর্বে অস্ত্রোপচার করার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়। ডাঃ রায় তখন স্বীয় দীপ্তিতে ভাস্বর এবং নীলরতনের যোগ্যশিষ্য হিসাবে স্বীকৃত। শল্যচিকিৎসক ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় অস্ত্রোপচার করবেন। ললিতমোহন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এম. এস.। আবার এফ. আর. সি এস-ও। নীলরতন এই অস্ত্রোপচারে সায় দেননি। অস্ত্রোপচারের ফল কি হয়েছিল, তা সকলেরই জানা। কবিকে আর সুস্থ করে তোলা সম্ভব হয়নি। কবির শেষ সময়ে নীলরতনের ডাক পড়ে। বন্ধুর পাশে গিয়ে বসলেন নীলরতন। প্রশান্ত চন্দ্র মহালানবিশ লিখেছেন, 'বন্ধুশ্রেষ্ঠ কবিসম্রাটের পাশে গিয়ে বসলেন। কতবার এঁকে তিনি মৃত্যুমুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছেন। কিন্তু এখন আর সময় নেই, সব্যসাচীর হাত থেকে তখন গাণ্ডীব পড়েছে খসে। দুই চোখ তাঁর জলে ভরে এল।' ১৯৩৯ সালে নীলরতনের স্ত্রী নির্মলা দেবীর মৃত্যু হয়। ফলে তাঁর শরীর ও মন দুই-ই ভেঙে পড়ে। শেষ সময় নিজেকে বড় নিঃসঙ্গ মনে করতেন।

১৯৪৩ সালের ১৮ই মে ৮২ বছর বয়সে গিরিডিতে স্যার নীলরতনের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যু সংবাদ কলকাতায় পৌঁছামাত্র সকল শ্রেণীর

মানুষের মন গভীর শোকে আচ্ছন্ন হল। আর চিকিৎসক-সমাজ অনুভব করলেন আত্মীয়-বিয়োগের ব্যথা।

সুরেশ প্রসাদ সর্বাধিকারীর জন্ম হয়েছিল বঙ্গদেশের এক সম্ভ্রান্ত বংশে। রাধানগরের সর্বাধিকারীরা তাঁর জন্মের আগেই বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। পিতা ডাঃ সূর্যকুমার, পিতৃব্য প্রসন্নকুমার ও রাজকুমার ভারত-বিখ্যাত। সূর্যকুমারের আট পুত্রের মধ্যে সুরেশপ্রসাদ চতুর্থ। তাঁর জন্ম ১৮৬৫ সালে হাওড়া জেলার বামুন পাড়ায় মাতামহের বাড়িতে। তাঁর জন্মবৃত্তান্ত সুবল মিত্রের অভিধানে এই রকম লেখা আছে: 'অষ্টম মাসে মৃতবৎ ভূমিষ্ঠ হন। পল্লীবাসিনী ধাত্রী শিশুকে মৃতজ্ঞানে পরিত্যাগ করিবার উপক্রম করে। শেষে অনেক চেষ্টায় ইনি রক্ষা পান, কিন্তু বাল্যকাল হইতে অতি দুর্বল।'

স্কুলের পড়াশুনা শুরু হয় কলকাতার বৌবাজার স্কুলে। সূর্যকুমারের বাড়ি ছিল ৫৩ নম্বর ওয়েলিংটন স্ট্রীটে। বৌবাজার স্কুলের পর হেয়ার স্কুলে এবং পরে প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁর লেখাপড়া চলে। এরপর ভর্তি হলেন মেডিকেল কলেজে। ডাক্তারি পড়ায় পিতার আপত্তি ছিল, কারণ তাঁর ধারণা রুগ্ন পুত্রের পক্ষে ডাক্তারি পড়া সম্ভব হবে না। তিনি আইন পড়াতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সুরেশপ্রসাদ চিরকালই ছিলেন একগুঁয়ে। একবার যা স্থির করেছেন, তাতে তিনি অটল থাকতেন।

তাঁর অসাধারণ অধ্যবসায়ের জন্য মেডিকেল কলেজের শিক্ষকগণ তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। প্রতিদিন সকাল ৭টা থেকে ১০টা পর্যন্ত এবং বিকাল ৫টা থেকে ৭টা পর্যন্ত হাসপাতালে কাজ করতেন। দিনের বেলায় অবসর সময়ে একা একা প্যাথলজি মিউজিয়মে কাটাতেন। বৃথা গল্পগুজবে সময় নষ্ট করা তাঁর ধাতে ছিল না। আড্ডা মেরে সময় নষ্ট করতে তাঁকে কেউ কখনো দেখেনি। এই সময়ে শস্ত্রচিকিৎসার অধ্যাপক ছিলেন বিখ্যাত কেনেথ ম্যাকলিয়ড। সুরেশপ্রসাদ তাঁর

খুব প্রিয় ছাত্র ছিলেন। অধ্যাপকের বুঝতে অসুবিধা হয়নি, ক্ষীণদেহী এই ছাত্রটি একদিন বড় সার্জন হবে। ১৮৮৯ সালে মেডিসিন ও সার্জারিতে অনার্সসহ এম. বি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কলেজের প্রায় সব পদক ও পুরস্কার তিনি পেয়েছিলেন। মেডিকেল কলেজে পড়ার সময়ই তিনি মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন থেকে বি. এ. পাশ করেন। এরপর মেয়ো হাসপাতালে হাউসস্টাফ হিসাবে কাজ করেন। এই সময় ডাঃ নীলরতন সরকারও সেখানে ছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে এক নিবিড় বন্ধুত্বের সৃষ্টি হয়। ১৮৯১ সালে তিনি এম. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন।

নীলরতনের মতো তিনিও স্বাধীনভাবে প্র্যাক্‌টিস শুরু করলেন। চাকরিতে ঢুকলে পরনির্ভর হতে হয়। সুরেশপ্রসাদের মতো স্বাধীনচেতা লোকের পক্ষে অন্যের অধীনতা স্বীকার করে থাকা অসম্ভব। অতি অল্পদিনেই শস্ত্রচিকিৎসক হিসাবে তিনি খ্যাতি লাভ করেন। ১৮৯৩ সালে তিনি এমন একটি অস্ত্রোপচার করেন, যার জন্যে চিকিৎসক মহলে তাঁর সম্মান ও প্রতিপত্তি খুব বেড়ে যায়। সেই অস্ত্রোপচারটি হল ওভ্যারিও হিস্টেরেক্‌টমি অর্থাৎ স্ত্রীলোকের জরায়ু ও ডিম্বাশয় কেটে বাদ দেওয়া। বাঙালী ডাক্তারদের মধ্যে সুরেশপ্রসাদই প্রথম এই কঠিন অপারেশন করতে সাহসী হলেন। আগে নামকরা সাহেব ডাক্তাররাই এই অপারেশন করতেন এবং অপারেশনের পর মৃত্যুর হার ছিল শতকরা ৭০ বা তারও বেশি। সুরেশপ্রসাদ এই অপারেশন করেন বাগবাজারের ২৫ বৎসর বয়স্কা একটি মহিলার উপর। রোগীকে ক্লোরোফর্ম দিয়ে অজ্ঞান করেন মেয়ো হাসপাতালের ডাঃ রাধাগোবিন্দ চৌধুরী। সুরেশপ্রসাদের নৈপুণ্যে এবং সাহসিকতায় চিকিৎসক-সমাজ তাঁকে স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন জানান। তিনি গৌরবের উচ্চশিখরে প্রতিষ্ঠিত হলেন।

প্রতিভাবান ব্যক্তি মাত্রেরই কর্মক্ষেত্র কোনো একটি বিষয়ে সীমিত থাকে না, নানা দিকে বিস্তৃত হয়। নীলরতনের মতো সুরেশপ্রসাদও চেয়েছিলেন দেশীয় চিকিৎসকদের ইয়োরোপীয় চিকিৎসকদের সমান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে। অন্যদিকে তিনি চাইতেন দেশীয় চিকিৎসকরা

নিজেদের মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন হোন। চিকিৎসকদের পেশাগত নীতিতে কোনোরকম ত্রুটিবিচ্যুতি তাঁর অসহ্য ছিল।

সুরেশপ্রসাদের সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল বাঙালী ছেলেরা তেজস্বী ও সাহসী হয়ে উঠুক। বাঙালী জাতি হিসাবে দুর্বল, বাঙালী যুদ্ধবিমুখ, সৈন্য হবার দৈহিক ও মানসিক শক্তি তার নেই—এসব অভিযোগ বহুদিনের। ডাঃ সুরেশপ্রসাদ এই অভিযোগ অযৌক্তিক প্রমাণ করার জন্য বেঙ্গল অ্যাম্বুলেন্স কোর গঠন করতে প্রয়াসী হলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যাতে বাঙালী ছেলেরা কোন ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে, সেজন্য তিনি কিছু বাঙালী যুবক সংগ্রহ করেন। সুরেশপ্রসাদ সামরিক শিক্ষাকেন্দ্রে গিয়ে যখন বক্তৃতা দিতেন, তখন যুবকদের মনে প্রবল উদ্দীপনার সৃষ্টি হত। প্রফুল্লচন্দ্র সেন লিখেছেন :

'আমি এই দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।······৬ই মার্চ (১৯১৫) ডাক্তার সর্বাধিকারীর আমহার্স্ট স্ট্রীটের ভবনে Enrolment আরম্ভ হয়। সৌম্যদর্শন কর্নেল এ. এইচ. নট (A. H. Nott, I.M.S.) উপস্থিত হইলে মাননীয় সর্বাধিকারী মহাশয় ইহাকেই আমাদের ভবিষ্যৎ নেতা বলিয়া পরিচিত করাইয়া দিলেন।' (মানসী ও মর্মবাণী, পৌষ ১৩২৯) মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার জন্য বেঙ্গল অ্যাম্বুলেন্স কোরের যুবকরা 'বাঙালী' জাহাজে ডায়মণ্ড হারবার থেকে রওনা দেয়। বঙ্গোপসাগরে এই জাহাজে আগুন লাগে এবং তা নষ্ট হয়ে যায়। কিছুদিন পর যুবকরা ট্রেনে বোম্বাই যায়। সুরেশপ্রসাদকে আই. এম. এস-এর লেফটানেন্ট কর্নেল উপাধি দেওয়া হয়। তিনিই একমাত্র বেসরকারী ব্যক্তি যিনি এই উচ্চ উপাধি লাভ করেন। কলকাতা ইউনিভার্সিটি কোরও তাঁর হাতে গড়া।

সুরেশপ্রসাদ কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের পরিচালন-সমিতির প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন। প্রথম সর্বভারতীয় চিকিৎসক সম্মেলনে তিনি ছিলেন সহ-সভাপতি। দীর্ঘ পঁচিশ বছর তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ছিলেন এবং বহু বছর সার্জারির পরীক্ষক ছিলেন।

নীলরতন সরকার সুরেশপ্রসাদ সম্বন্ধে বলেছেন, 'তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে অনেকেরই হৃৎকম্প হত।' সন্দেহ নেই, তাঁর স্বভাব ছিল খুব রুক্ষ, অল্পেতেই রেগে যেতেন। সিনেটের সভায় তিনি যখন বক্তৃতা দিতে উঠতেন, তখন সকলেই সচকিত হয়ে উঠতেন। স্যার আশুতোষকে পর্যন্ত তিনি সমালোচনা করতে ছাড়তেন না। সরকার একটি মেডিকেল বিল আনার চেষ্টা করেন, যা দেশীয় চিকিৎসকদের স্বার্থের পরিপন্থী। কিন্তু সুরেশপ্রসাদ এমনি তীব্র সমালোচনা করেন, যে ঐ বিলের অনেকগুলি ধারাই বাদ দিতে হয়।

১৯২১ সালের ১০ই মার্চ মাত্র ৫৪ বছর বয়সে সুরেশপ্রসাদের মৃত্যু হয়। তাঁর পুত্র ডাঃ কনকচন্দ্র সর্বাধিকারী কলকাতা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং পরে পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য-দপ্তরের নির্দেশক পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

কে.পি. থমাসের লেখা ডাঃ বি. সি. রায় গ্রন্থ থেকে একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করি :

মৃত্যুর কয়েকদিন আগে সুরেশপ্রসাদ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে বলেছিলেন, তাঁর জীবনের তিনটি আকাঙ্ক্ষা ছিল। প্রথম আকাঙ্ক্ষা, ক্যালকাটা মেডিকেল স্কুলকে কলেজে পরিণত করা। গভর্নমেণ্ট চেয়েছিল, কলেজ করতে হলে স্কুল কর্তৃপক্ষকে ২,৫০,০০০ টাকা যোগাড় করতে হবে ১৯১৬ সালের ৩১শে মার্চের মধ্যে। এক ভদ্রলোক ১০, ০০০ টাকা দিতে রাজী হলেন কিন্তু শর্ত দিলেন আগে কর্তৃপক্ষকে ২,৪০,০০০ টাকা সংগ্রহ করতে হবে। ৩০শে মার্চ সকালে দেখা গেল ২,২০,০০০ টাকা চাঁদা উঠেছে। কী করা যাবে, সকলেই খুব চিন্তিত। ডাঃ সর্বাধিকারী তাঁর ২০, ০০০ টাকার কোম্পানি কাগজ দান করলেন। যে ভদ্রলোক ১০, ০০০ টাকা দেবেন বলে অঙ্গীকার করেছিলেন, এখন তিনিও তা দান করলেন। ৩১শে মার্চের মধ্যে ২,৫০,০০০ টাকা সংগৃহীত হল এবং গভর্নমেণ্টের পূর্বশর্ত অনুযায়ী গ্রাণ্ট পাওয়া গেল। ডাঃ সর্বাধিকারীর দ্বিতীয় আকাঙ্ক্ষা, আইনজ্ঞ ও চিকিৎসকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দর্শনী নেবেন। একটি রোগীর

চিকিৎসা করে একদিনে তিনি পাঁচ হাজার টাকা ফি নিয়েছিলেন। তৃতীয় আকাঙ্ক্ষা, বাঙালীর সৈন্যবাহিনীতে যোগ না দেওয়ার যে দুর্নাম আছে, তা অপনোদন করা এবং সেনা বাহিনীতে বাঙালী ছেলেদের প্রতিষ্ঠিত করা।

বলা বাহুল্য তাঁর প্রতিটি আকাঙ্ক্ষাই পূর্ণ-হয়েছিল। যার জীবনের সব আকাঙ্ক্ষাই পূর্ণ হয়েছে, তাঁর মতো ভাগ্যবান মানুষ এ সংসারে বিরল।

ভেষজচিকিৎসায় যেমন স্যার নীলরতন, শল্যচিকিৎসায় যেমন লেফটান্যাণ্ট কর্নেল সুরেশপ্রসাদ, স্ত্রীরোগে তেমনি স্যার কেদারনাথ দাস সারা বঙ্গদেশে তথা ভারতে শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক হিসাবে পরিগণিত হয়েছিলেন। নীলরতন-সুরেশপ্রসাদ কর্মজীবনের প্রথম দিকে যদিও স্ত্রীরোগের চিকিৎসা করেছিলেন, কিন্তু পরবর্তী যুগে তাঁরা স্ব স্ব ক্ষেত্রে চিকিৎসা সীমিত রেখেছিলেন। এঁরা তিনজন চিকিৎসাশাস্ত্রের তিনটি প্রধান বিভাগে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে গেছেন। আগেই বলা হয়েছে নীলরতন-সুরেশপ্রসাদের সঙ্গে ডাঃ দাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পার্থক্য ছিল। ডাঃ দাস সরকারী চাকরিতে যোগ দিয়েছিলেন। তবু স্ত্রীরোগের চিকিৎসায় তিনি এমনি নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছিলেন যে নূতন যুগের সূচনায় অর্থাৎ দেশীয় চিকিৎসকদের স্থান ইয়োরোপীয় চিকিৎসকদের সমান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করায় তাঁর অবদানও যথেষ্ট।

অপারেশনে ডাঃ দাসের খুব সুনাম ছিল। দেশের ও বিদেশের বহু চিকিৎসক তাঁর অপারেশন দেখতে আসতেন। খুব দ্রুত অপারেশন করতেন। দ্রুত অপারেশনে সাধারণতঃ নানা জটিলতার সৃষ্টি হয়। ডাঃ দাস দ্রুত অস্ত্রোপচার করতেন বটে, কিন্তু জটিলতা হত খুব কম। অস্ত্রোপচারের আগে কনুই পর্যন্ত হাত সাবান জলে ভাল করে ধুয়ে নিতেন। পরিষ্কার জীবাণুমুক্ত তোয়ালে দ্বারা হাত মুছতেন। কোনোরকম লোশন দিয়ে হাত ধুতেন না। হাতে দস্তানা ব্যবহার

করতেন খুব কম। নিজের দীর্ঘ আঙুলগুলির উপর ছিল তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস।

ডাঃ দাস এক রকমের ফরসেপ্স (Forceps) প্রস্তুত করেছিলেন। সন্তান প্রসবের সময় কখনো কখনো ফরসেপ্স ব্যবহার করতে হয়। পশ্চিম দেশে যেসব ফরসেপ্স প্রচলিত, আমাদের দেশেও সেগুলিই চলত। ডাঃ দাস লক্ষ্য করলেন, সেসব ফরসেপ্স এদেশের নারীদের শরীরের সম্পূর্ণ উপযোগী নয় এবং এতে জননতন্ত্রে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়। সেজন্য তিনি প্রচলিত 'ফরসেপ্স'-এর কিছুটা পরিবর্তন করে তৈরি করলেন নতুন ধরনের 'ফরসেপ্স' যা 'বেঙ্গল ফরসেপ্স' নামে বিখ্যাত। এ ছাড়া তিনি প্রস্তুত করেছিলেন দুরকমের ছুরি, এক রকমের চিমটা এবং ডাইলেটর (Dilator)। ডাইলেটরগুলি 'কে. ডি. ডাইলেটর' নামে পরিচিত।

কেদারনাথের জন্ম ১৮৬৭ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি। তাঁর পিতা যাদবকৃষ্ণ দাস হিন্দুস্কুলের শিক্ষক ছিলেন। কেদারনাথের ছাত্রজীবন কৃতিত্বে উজ্জ্বল। হিন্দু স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ১৮৮৫ সালে। এতে তিনি বৃত্তি লাভ করেন। জেনারেল এসেম্ব্লি ইনস্টিটিউশন থেকে ফার্স্ট আর্টস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপর ভর্তি হন কলকাতার মেডিকেল কলেজে। এখানকার প্রায় সব পরীক্ষাতেই তিনি সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন এবং কলেজের প্রায় সব পুরস্কার, পদক করায়ত্ত করেন। তিনি 'গুডিব বৃত্তি'ও পান। ১৮৯২ সালে এম. বি. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ধাত্রীবিদ্যায় তিনি পুরো নম্বর পেয়েছিলেন। তাঁর আগে বা পরে আর কেউ এই রেকর্ড ভাঙতে পারেননি। প্রসূতিতন্ত্রের অধ্যাপক ডাঃ জুইবার (Col. C. H. Joubert) কেদারনাথকে খুব স্নেহ করতেন।

এম. বি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরেই ডাঃ দাস মেডিকেল কলেজের ইডেন হাসপাতালে অধ্যাপক জুইবারের অধীনে 'হাউস সার্জন' নিযুক্ত হলেন। ডাঃ জুইবার ডাঃ দাসের অসাধারণ জ্ঞান এবং অস্ত্রোপচারে আশ্চর্য নৈপুণ্য লক্ষ্য করে তাঁর খুব প্রশংসা করতেন।

এই সময় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেজিস্ট্রারের পদ সৃষ্টি হয়। ডাঃ দাস ১৮৯২ থেকে ১৮৯৯ সাল পর্যন্ত এখানে রেজিস্ট্রার হিসাবে কাজ করেছেন।

তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম ছিল যে বি. এ. পাশ না করলে এম. ডি. পরীক্ষা দেওয়া যাবে না। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এই নিয়ম ছিল না। ১৮৯৫ সালে কেদারনাথ পাশ করলেন মাদ্রাজের এম. ডি. পরীক্ষা।

১৮৯৯ সালে ডাঃ দাস ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলে প্রসূতিতন্ত্রের শিক্ষক নিযুক্ত হন। এখানে শিক্ষক থাকাকালে তাঁর নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। স্ত্রীরোগের চিকিৎসার জন্য পুরুষ-চিকিৎসকদের কাছে আসতে মহিলাদের লজ্জার বাধা ছিল। সেযুগে শিক্ষিত সম্প্রদায় এবং অল্প কয়েকশ্রেণীর মহিলারাই পুরুষ-চিকিৎসকদের কাছে যেত। এই সংস্কার এবং লজ্জা যে কত মহিলার জীবনাবসানের কারণ হত, তার সীমা সংখ্যা নেই। সন্তান প্রসবের কাজ করত অশিক্ষিত, অপরিচ্ছন্ন 'দাই'রা।

তখন মেডিকেল কলেজে সবে ছাত্রীভর্তি শুরু হয়েছে। ১৮৮৯ সালে বিধুমুখী বসু ও ভার্জিনিয়া মেরী মিটার চিকিৎসাবিদ্যার প্রথম স্নাতক। ১৮৮৮ সালে ক্যাম্পবেল স্কুলেও প্রথমবার দশজন ছাত্রী ভর্তি হয়েছে।

ডাঃ দাসের রোগ নিরূপণের ক্ষমতা ছিল অসাধারণ, তার উপর অস্ত্রোপচারে তাঁর ছিল অসামান্য দক্ষতা। সংস্কার, লজ্জা দূরে ফেলে দিয়ে মহিলারা আসতে লাগল ডাঃ দাসের কাছে। একবার এক ইংরেজ মহিলা এল ডাঃ জুইবারের কাছে চিকিৎসার জন্য। ডাঃ জুইবার তাকে ডাঃ দাসের কাছে যেতে বললেন। ইংরেজ মহিলা একজন 'নেটিভ'কে দিয়ে পরীক্ষা করাতে রাজী হল না। এতে ডাঃ জুইবার রেগে গিয়ে বললেন, 'আগে ডাঃ দাস দেখবেন, তারপর দরকার হলে আমি দেখব।'

ক্যাম্পবেল হাসপাতালের বেকার ওয়ার্ডে অস্ত্রোপচারের জন্য পৃথক ঘর ছিল না। ওয়ার্ডেরই একপাশে অস্ত্রোপচার করা হত। ডাঃ দাস ধাত্রীবিদ্যাবিভাগটি সম্পূর্ণ ঢেলে সাজান। অচিরেই শ্রেষ্ঠ স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ বলে তিনি স্বীকৃতি পেলেন।

ডাঃ দাস ১৯১৮ সাল অবধি ক্যাম্পবেল হাসপাতালে কাজ করে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯১৯ সালে যোগ দেন কার্মাইকেল মেডিকেল কলেজে ধাত্রীবিদ্যার অধ্যাপক হিসাবে এবং ১৯২২ সালে এই কলেজেরই অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। মৃত্যু পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯৩৬ সাল অবধি তিনি এই পদে কাজ করেছিলেন। যাঁদের নিঃস্বার্থ পরিশ্রমে এই প্রতিষ্ঠানটি বর্তমান রূপ নিয়েছে, তাঁদের মধ্যে ডাঃ কেদারনাথ দাসের নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই কলেজের জন্য তিনি যাট হাজার টাকা দান করেন। তাঁর মূল্যবান পুস্তকের ভাণ্ডারও এই কলেজের গ্রন্থাগারেই দান করেন।

অধ্যক্ষ হিসাবে কেদারনাথের কাজ নিতান্ত সহজ ছিল না। আই. এম এস অফিসারদের বিরোধিতা ও ভ্রূকুটির মধ্যে এই বেসরকারী কলেজের জন্ম। সবে (১৯১৯) কলেজটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করেছে। মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে পরীক্ষা দিতে হবে এই কলেজের ছাত্রদের। সকলের দৃষ্টি এখন এই কলেজের উপর, অধ্যক্ষ হিসাবে কেদারনাথের উৎকণ্ঠা যে কত ছিল, তা সহজেই অনুমেয়। পরীক্ষায় দেখা গেল কার্মাইকেলের ছেলেরা ভালই করেছে।

গবেষণা ছিল কেদারনাথের কর্মজীবনের এক বিশেষ অঙ্গ। বহু স্ত্রীরোগ নিয়ে তিনি গবেষণা করেছেন। পঞ্চাশটিরও বেশী গবেষণামূলক প্রবন্ধ তিনি লিখেছেন। তাছাড়া লিখেছেন তিনটি গ্রন্থ—*Hand Book of Obstetrics* (1914), *Text Book of Midwifery* (1920) এবং *Obstetric Forceps* (1928)। ফরসেপ্‌স প্রস্তুত করা একদিনের ব্যাপার নয়। এর জন্য তাঁকে গবেষণা করতে হয়েছে দীর্ঘ বার বছর।

প্রায় সারাজীবন শিক্ষকতা করেছেন তিনি। উচ্চতায় ছয় ফুটের চেয়েও অধিক ডাঃ দাস ছিলেন রাশভারি লোক এবং পড়াশুনায় অবহেলা মোটেই সহ্য করতে পারতেন না। ছাত্ররা তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে ভয় পেত। কিন্তু যারা তাঁর সান্নিধ্যে এসেছে, তারাই অনুভব করেছে, বাইরে তিনি কড়া হলেও, ভিতরে খুব নরম। ক্যাম্পবেল স্কুল

থেকে অবসর গ্রহণ করার সময় ছাত্ররা এক সভার আয়োজন করে। সে সভায় বিদায় সম্ভাষণের উত্তরে ডাঃ দাস বলেন—

'আমি এতদিন এই ধারণা করে আসছিলাম যে যখন আমি ক্যাম্পবেল হাসপাতাল ছেড়ে যাব, ছাত্ররা তখন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবে। কিন্তু আজ তোমাদের আবেগময় বক্তৃতা শুনে আমার ভুল ভেঙেছে। আমার এই ভ্রান্ত ধারণার জন্য আমি নিজেকে অপরাধী মনে করছি। আমি তোমাদের প্রতি মাঝে মাঝে কর্কশ ব্যবহার করেছি সত্য, তবে তার কারণ একটিই। আমি চেয়েছি, যাতে তোমাদের মান উঁচু হয়। আলস্য, ঔদাসীন্য আমি বরদাস্ত করতে পারি না। আমি চেয়েছি, ক্যাম্পবেল স্কুলের ছাত্ররা চিকিৎসকদের কাছে এবং সমাজে যেন শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে ওঠে।' (Bengal Obstetric & Gynaecological Society—Sir Kedarnath Das Centenary Commemoration Volume, 1967)

স্ত্রীরোগের চিকিৎসায় ডাঃ দাসের সমকক্ষ সে সময় কেউ ছিলেন না। মেডিকেল কলেজের ধাত্রীবিদ্যার খ্যাতনামা অধ্যাপক ডাঃ গ্রীন-আর্মিটেজ (Lt. Col. V. B. Green-Armytage) ডাঃ দাসের গুণে এতই মুগ্ধ ছিলেন যে ডাঃ দাসকে গুরু বলে উল্লেখ করতেন। সব সময়েই বলতেন—'My guru'। গ্রীনআর্মিটেজের একটি ছবি ডাঃ কেদার দাসের পুত্র ডাঃ প্রবোধ দাসের বাড়িতে রয়েছে। ছবিটিতে আর্মিটেজ নিজের হাতে লিখেছেন—'To my guru'।

প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন কেদারনাথ, দানও করেছেন অজস্র। বর্তমান আর. জি. কর হাসপাতালে ধাত্রীবিদ্যাবিভাগের বাড়িটির গায়ে উৎকীর্ণ ডাঃ দাসের নাম তাঁর দানের মহিমা প্রচার করছে। বহু ছাত্র তাঁর কাছ থেকে অর্থ সাহায্য পেত। কিন্তু অন্য কেউ টের পেত না।

দেশ বিদেশের বহু সম্মান ডাঃ দাস লাভ করেছিলেন। সরকার তাঁকে সম্মানিত করে 'সি. আই. ই'. (১৯১৮) এবং 'স্যার' (১৯৩৩) উপাধি দিয়ে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোট্স পদক তিনি লাভ

করেন ১৯২৯ সালে। ডাঃ দাস কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের সদস্য এবং ফেকালটি অব মেডিসিনের ডীন হয়েছিলেন। আমেরিকান গাইনিকলজিক্যাল সোসাইটির অবৈতনিক সদস্য এবং রয়েল কলেজ অব অবস্‌টেট্রিশিয়ান্‌স্‌ এণ্ড গাইনিকলজিস্টস্‌-এর ফেলো মনোনীত হন। ১৮৯৪ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম ইণ্ডিয়ান মেডিকেল কংগ্রেসে সহ-সম্পাদক ছিলেন ডাঃ দাস। ১৯২২ সালের মে মাসে তিনি আমেরিকান গাইনিকলজিক্যাল সোসাইটি দ্বারা বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয়ে আমেরিকায় যান এবং সেখানে 'ভারতে ধাত্রীবিদ্যা' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

১৯৩৬ সালের ১৩ই মার্চ স্যার কেদারনাথের মৃত্যু হয়। তাঁর তিন পুত্রের মধ্যে দুজন চিকিৎসক। ডাঃ প্রবোধচন্দ্র দাস স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞ হিসাবে সুপরিচিত। স্যার কেদার দাসের ব্যক্তিগত লাইব্রেরি ছিল বিরাট। ডাঃ প্রবোধ দাসের লাইব্রেরিটিও দেখার মতো। বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ তিনি যত্ন করে রেখেছেন। প্রতিটি বই-এ নম্বর দেওয়া। যখন যেটি দরকার, এক সেকেণ্ডে সেটি বার করে আনেন।

স্যার কেদার দাস ছেলেমেয়েদের সংগীতচর্চার প্রচুর সুযোগ দিয়েছিলেন। বাড়িতে বড় বড় ওস্তাদ এসে গান শেখাতেন। শোনা যায় স্বর্গত ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ ত্রিপুরা থেকে এসে প্রথম আশ্রয় পান স্যার কেদারনাথের বাড়িতে। গান বাজনার শব্দ শুনেই নাকি তিনি ঢুকে পড়েছিলেন তাঁর বাড়িতে।

এ যুগের ধন্বন্তরি

ধন্বন্তরি ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন, কি ছিলেন না, তা তর্কের বিষয় ; কিন্তু ধন্বন্তরি এদেশীয় চিকিৎসকদের চিরকালের আদর্শ হয়ে আছেন। সমুদ্র-মন্থনের সময় ধন্বন্তরির আবির্ভাব. তাঁর হাতে ছিল অমৃতের পাত্র। (সান্ন্যাল, ১৯৬৪) বর্তমান যুগের চিকিৎসকরা অমৃত কোথায় পাবেন, কিন্তু তাঁদের আছে বিদ্যা এবং আশ্চর্য সব ওষুধ।

দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এক সময়ে লোকে মানত ধন্বন্তরি হিসাবে, তাঁর দর্শনেই রোগী নাকি অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠত। তার পরের যুগে নীলরতন সরকারকে। ডাঃ সরকার রোগীর বাড়িতে পা দেওয়া মাত্রই রোগীর আত্মীয়স্বজন ভাবত—আর ভয় নেই, এ যাত্রা রোগী বেঁচে যাবে। নীলরতনের জীবদ্দশাতেই আর একজন চিকিৎসক চিকিৎসায় অপূর্ব নিপুণতা দেখিয়ে সবাইকে বিস্ময়াভিভূত করে দিলেন। ইংল্যাণ্ড থেকে এম. আর. সি. পি. (মেম্বর অব রয়েল কলেজ অব ফিজিসিয়ন্‌স্) এবং এফ. আর. সি. এস. (ফেলো অব রয়েল কলেজ অব সার্জন্‌স), মেডিসিন ও সার্জারির দুটি সর্বোচ্চ উপাধি নিয়ে এই তরুণ চিকিৎসক ফিরে এলেন কলকাতায়। প্র্যাক্‌টিস শুরু করলেন ডাঃ সরকারের আশীর্বাদ নিয়ে এবং অতি অল্পদিনেই চিকিৎসকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত হলেন। এমন দ্রুত রোগনির্ণয় করার ক্ষমতা, এমন অপূর্ব চিকিৎসা আগে কেউ কোনোদিন দেখেনি। চিকিৎসকরা আশা ছেড়ে দিয়েছেন, এমন মৃত্যুপথযাত্রী রোগীকেও তিনি বাঁচিয়ে তুলেছেন—যেন এক দৈবশক্তি নিয়ে তাঁর আবির্ভাব। রোগী আসতে লাগল ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। ভারতের সর্বত্র একটি নাম লোকের মুখে-মুখে ফিরতে লাগল। সে নাম, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়।

ধন্বন্তরির হাতে ছিল অমৃতের পাত্র, বিধান রায়ের হাতেও লোকে দেখতে পেত মৃতসঞ্জীবনী। মুমূর্ষু রোগীর পরিজনবর্গও ভাবত, একবার যদি বিধান রায়কে দেখান যেত, তবে বোধ হয় রোগীকে বাঁচানো যেত।

কোথাও কোন চিকিৎসক যদি সুচিকিৎসা করেন, লোকে বলে, এখানকার 'বিধান রায়'। ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নালে বিধানচন্দ্র রায় সম্বন্ধে লেখা হয়েছিল :

'একথা বললে অত্যুক্তি হয় না যে সারা পৃথিবীর মধ্যে ডাঃ রায়ের মত এত বিরাট পসার আর কোনো চিকিৎসকের ছিল না। কোন শহরে গেলে তাঁর আসার খবর বাতাসে ছড়িয়ে পড়ত এবং বহু লোক এসে জড় হত, তাঁকে দিয়ে পরীক্ষা করবার জন্য। এমনকি ট্রেনে হয়ত কোথাও যাচ্ছেন, কোনো স্টেশনে ট্রেন থেমেছে। দেখা গেল অনেক রোগী তাঁকে দিয়ে পরীক্ষা করাতে স্টেশনে হাজির।'

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু হয় দার্জিলিং-এ। সে সময়ে ডাঃরায় ছিলেন শিলং-এ। খবর পেয়েই ছুটে এলেন কলকাতায়। দেখা করতে গেলেন দেশবন্ধু-পত্নী বাসন্তী দেবীর সঙ্গে। ডাঃ রায়কেদেখে বাসন্তী দেবী কেঁদে উঠলেন। বললেন,'বিধান, তুমি যদি থাকতে, তবে হয়ত তাঁকে বাঁচানো যেত।' এই বিশ্বাস শুধু বাসন্তী দেবীর নয়, সারা দেশের লোকের।

বিধানচন্দ্র রায়ের জন্ম ১৮৮২ সালের ১লা জুলাই, পাটনা শহরে। সেখানে তাঁর পিতা প্রকাশচন্দ্র রায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তিনি ছিলেন ভাইবোনদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট। পরবর্তী যুগে তাঁর দীর্ঘ দেহ, বলিষ্ঠ চেহারা, অসামান্য ব্যক্তিত্ব যারা দেখেছে, তারা কল্পনাই করতে পারবে না যে ছোটবেলায় তিনি ছিলেন রোগা দুর্বল। স্কুল-কলেজে পড়ার সময় উল্লেখযোগ্য কোনো অসামান্য কৃতিত্ব তাঁর নেই। ১৮৯৭ সালে পাটনা কলেজিয়েট স্কুল থেকে উত্তীর্ণ হলেন এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় এবং এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন ১৮৯৯ সালে। বাঁকিপুর কলেজ থেকে ১৯০১ সালে পাশ করলেন গণিত নিয়ে বি. এ. অনার্স। সেই বছরেই ভর্তি হলেন কলকাতার মেডিকেল কলেজে। এখানকার ছাত্রজীবনেও উল্লেখ করার মতো কৃতিত্ব কিছু নেই। আরো আশ্চর্য, এম. বি. পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলেন। পাশ করলেন এল. এম. এস. পরীক্ষা। এই পরীক্ষার ব্যাপারে এমন একটি ঘটনা ঘটেছিল, যা

থেকে তাঁর চরিত্রের অনমনীয় দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যায়।

এম. বি. পরীক্ষার কয়েকদিন আগে বিধানচন্দ্র দাঁড়িয়ে আছেন মেডিকেল কলেজের প্রবেশপথে। এমন সময় একটি ঘোড়ার গাড়ি প্রবল বেগে কলেজ থেকে বেরিয়ে কলেজস্ট্রীটে পড়ল। কলকাতায় তখন সবে বিদ্যুৎ-চালিত ট্রামগাড়ি চালু হয়েছে। ঘোড়ার গাড়িটি ধাক্কা খেল ট্রামের সঙ্গে এবং তার কিছু ক্ষতিও হল। গাড়িতে ছিলেন কর্নেল পেক (Lt. Col. F. S. Peck. I. M. S.), প্রসূতিতন্ত্রের অধ্যাপক। কর্নেল পেক খুব রেগে গেলেন, তাঁর মতে দোষ ট্রামের। কারণ, ট্রাম নাকি ঘণ্টায় ত্রিশ মাইলের বেশি বেগে চলছিল। পেক দেখতে পেলেন বিধানচন্দ্র দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁকে ডেকে তিনি বললেন, 'দেখলে তো ব্যাপারটা। ট্রামেরই দোষ। তুমি এর সাক্ষী হবে।' বিধান বললেন, 'কিন্তু স্যার, দোষ তো আপনার গাড়ির সহিসের। ওর উচিত ছিল ঘণ্টা বাজিয়ে সংকেত দেওয়া। সে তা দেয়নি।' সাহেব এমন উত্তর কল্পনাই করতে পারেননি। একে তো সাহেব, তার উপর অধ্যাপক। সাহেব রেগে আগুন হয়ে গেলেন। কয়েকদিন পরেই বিধানের পরীক্ষা। লিখিত পরীক্ষা বেশ ভালই হল। মৌখিক পরীক্ষা দিতে গিয়ে দেখলেন পেক বসে আছেন। বিধান আসনে বসেছেন মাত্র, পেক কোনো প্রশ্ন না না করেই বিধানকে গালাগাল দিতে লাগলেন। বিধান বুঝে নিলেন পরীক্ষার ফল কী হবে। পরীক্ষার ফল বেরুলে দেখা গেল, বিধান পাশ করতে পারেননি। মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ কর্নেল লুকিস (Lt. Col C. P. Lukis) ব্যাপারটা জানতে পেরে বিধানকে বললেন, যতদিন পেক থাকবেন, ততদিন তাঁর পক্ষে এম. বি. পাশ করা অসম্ভব, কারণ পেক প্রতিবারই পরীক্ষক। তার চেয়ে এল. এম. এস. পরীক্ষা দেওয়াই ভাল। ১৯০৬ সালে বিধান এল. এম. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। এই পরীক্ষায় ডাঃ নীলরতন সরকার অন্যতম পরীক্ষক ছিলেন।

এল. এম. এস. পাশ করার পর বিধানচন্দ্র যথারীতি বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল মেডিকেল সার্ভিসে যোগ দিলেন। নিযুক্ত হলেন কর্নেল

লুকিসের অধীনে হাউস-ফিজিসিয়ন। প্র্যাক্টিসও শুরু করলেন। ফি—দুটাকা। এখন পর্যন্ত বিধান রায় অন্য পাঁচজন ডাক্তারেরই মতো, তাঁর যে কোনো বৈশিষ্ট্য আছে তা বেশি লোকের নজরে পড়েনি। এসময়ে সম্ভবত বিধানচন্দ্র মনে মনে নিজেকে প্রস্তুত করছিলেন ভবিষ্যতের জন্য। হাসপাতালে বহুক্ষণ থাকতেন, প্রতিটি রোগীকে পরীক্ষা করতেন, রোগের বিবরণ লিখতেন। পড়াশুনাও করতেন নিয়মিত। ১৯০৮ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ডি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। জ্ঞান স্পৃহা তাঁর বেড়েই চলল। এবার প্রস্তুত হলেন ইংল্যাণ্ড যাবার জন্য।

১৯০৯ সালে বিধানচন্দ্র গেলেন ইংল্যাণ্ডে। মাত্র দুই বছরের মধ্যে তিনি এম. আর. সি. পি. এবং এফ. আর. সি এস.—এই দুটি কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। শুধু তাই নয়, এম. আর. সি. পি-তে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করলেন। এতদিনে তাঁর সুপ্ত প্রতিভা জাগরিত হল। গৌরবের মুকুট মাথায় নিয়ে তিনি ফিরে এলেন দেশে ১৯১১ সালে এবং হ্যারিসন রোডের উপর একটি বাড়ি ভাড়া নিলেন। নীলরতন সরকারও হ্যারিসন রোডে থাকতেন।

এই বিধান আর আগেকার বিধান এক নন। এখন তিনি প্রজ্ঞায় অনুপম, প্রতিভায় ভাস্বর, আত্মবিশ্বাসে স্থির। দেশে ফিরে এসে আগেকার কাজেই যোগ দিলেন। অদ্ভুত ধরনের কাজ করতে দেওয়া হল তাঁকে। প্রথম কাজ পুলিশের লোকদের প্রাথমিক চিকিৎসা শেখানো। অনেক চেষ্টায় এলেন ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলে অ্যানাটমির শিক্ষক হিসাবে। নিজের প্র্যাক্টিসে এবার তাঁর ফি হল আট টাকা। ডাঃ রায় ইচ্ছা করলেই আই. এম. এস-এ যোগ দিতে পারতেন, কেননা তাঁর সঙ্গে এম. আর. সি. পি. পাশ করেছেন এবং পরীক্ষায় তাঁর চেয়ে অনেক নিচুতে স্থান পেয়েছেন, এমন অনেকে আই. এম. এস. হয়েছিলেন। আই. এম. এস-এ যোগ দিলে তাঁকে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে হত। কলকাতায় আসার সুযোগ হত হয়ত বৃদ্ধ বয়সে। বড় শহরে বড় হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত না থাকলে বড় চিকিৎসক

হওয়া যায় না! দেশের সৌভাগ্য যে. বিধান রায় আই. এম. এস-এ যোগ দিয়ে কেবল সৈন্যদের চিকিৎসা করেননি। ডাঃ রায়ের বহু আগে ১৮৮২ সালে প্রথম যে ভারতীয় এম. আর. সি. পি হন তাঁর নাম এ. এন চট্টোপাধ্যায়। মেডিকেল কলেজ থেকে এল. এম. এস পাশ করে যান বিলাতে। এডিনবরা থেকে এল. আর. সি. পি, গ্লাসগো থেকে এল. এফ. পি. এস. এবং লণ্ডন থেকে এম. আর. সি. পি. ডিপ্লোমা নিয়ে ফিরে আসেন দেশে এবং যোগ দেন আই. এম. এস-এ। আজ তাঁর নাম খুব কম লোকেই জানে।

১৯১৯ সালে ডাঃ রায়ের জীবনের একটি সন্ধিক্ষণ। এ বছর সরকারী কাজে ইস্তফা দিলেন তিনি এবং যোগ দিলেন কার্মাইকেল মেডিকেল কলেজে মেডিসিনের অধ্যাপক হিসাবে। কার্মাইকেল কলেজও ডাঃ রায়কে পেয়ে উপকৃত হল। এই সময় কলেজটির বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনের কথা হচ্ছে। কিন্তু মেডিসিনে এম আর সি. পি. এবং সার্জারিতে এফ. আর. সি. এস. অধ্যাপক না থাকলে বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন দেবে না। সার্জারির অধ্যাপক ছিলেন তৎকালীন বিখ্যাত সার্জন মৃগেন্দ্রলাল মিত্র। তিনি এফ. আর. সি. এস. ছিলেন। মেডিসিনে এম. আর. সি. পি. পাওয়া যাচ্ছে না, কারণ তখনকার সব এম. আর. সি. পি-ই আই. এম. এস অফিসার এবং মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক। তাঁরা বেসরকারী কার্মাইকেল কলেজকে সুদৃষ্টিতে দেখেন না। যখন বিধান রায়কে আমন্ত্রণ জানান হল ঐ কলেজে অধ্যাপকের পদে যোগ দিতে, তখন তিনি সানন্দে রাজী হলেন। কলেজও বিনা বাধায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করল।

চিকিৎসার ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানে ওঠার জন্য যা যা দরকার, এবার সে সব কিছুই বিধান রায়ের করায়ত্ত। সর্বোচ্চ ডিপ্লোমা, কলেজের অধ্যাপক-পদ, ডাঃ নীলরতন সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা। অতি অল্পদিনের মধ্যেই বিধানচন্দ্র চিকিৎসক হিসাবে ও শিক্ষক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করলেন। তাঁর রোগ-নির্ণয়ের আশ্চর্য ক্ষমতার কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। এমন এক স্বতস্ফূর্ত জ্ঞান তাঁর জন্মেছিল যে অনেক

সময় দূর থেকে দেখেই রোগ বলে দিতে পারতেন। রোগীর শুয়ে থাকার ধরন দেখে, বা রোগীর হাঁটা দেখে কোনো কোনো রোগ সম্বন্ধে ধারণা করা যায়, কিন্তু খুব কম চিকিৎসকই এই সব নিয়ে মাথা ঘামান। ইনটুইশন বা স্বজ্ঞা অনেকের ক্ষেত্রে মারাত্মক ভ্রান্তিরও কারণ হতে পারে, কিন্তু ডাঃ রায়ের ক্ষেত্রে এই ইনটুইশন প্রায় অভ্রান্ত। যখন তাঁর ১৬ টাকা দর্শনী তখনো যেমন রোগীর লাইন, ৬৪ টাকা দর্শনীর সময়ও তেমনি বা তার চেয়েও বড় লাইন। তাঁর ওয়েলিংটন স্কোয়ারের বাড়ি রোগীদের আশার প্রতীক। একবার ও-বাড়িতে ঢুকতে পারলেই যেন শান্তি!

বিধানচন্দ্রের আশ্চর্য চিকিৎসা সম্বন্ধে অনেক গল্প শোনা যায়। ১৯৪৩ সালে গান্ধীজী যখন অনশন করেন, তখন তাঁর শরীর খুব খারাপ হয়ে যায় এবং জীবনের আশংকাও দেখা দেয়। সরকারী চিকিৎসক স্থির করলেন, বাঁচাতে হলে শিরার ভিতর দিয়ে গ্ল‍ুকোজ ইনজেক্‌সন দেওয়া দরকার। ডাঃ রায় গান্ধীজীর অবস্থা শুনে সেখানে গেলেন এবং সরকারী চিকিৎসককে সতর্ক করে দিলেন, জোর করে গ্ল‍ুকোজ ইনজেক্‌সন দিলে ফল মারাত্মক হতে পারে। ডাঃ রায় গান্ধীজীকে বললেন, সামান্য লেবুর রস লবণ ও জলের সঙ্গে মিশিয়ে খেতে। গান্ধীজী আপত্তি করলেন, কারণ এতে তাঁর অনশন ভঙ্গ হবে। ডাঃ রায় বুঝিয়ে বললেন, এতে অনশন ভঙ্গ হবে না, কারণ জল, লেবুর রস ও লবণ খাদ্য হিসাবে গ্রাহ্য নয়। গান্ধীজী অবশেষে ডাঃ রায়ের অনুরোধ রাখলেন এবং একটু একটু লেবুর রস খেতে লাগলেন। ফল হল আশ্চর্য, যে গান্ধীজীর জীবন সম্বন্ধে সকলে আশঙ্কিত হয়েছিল, পরদিন সকালে তাঁকে দেখা গেল অনেক সুস্থ। দেশবাসী আশ্বস্ত হল। আর একবার ডাঃ রায় আলিপুর জেলে বন্দী। জেলের ডাক্তার তো ডাঃ রায়কে বন্দী হিসাবে পেয়ে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করলেন। ডাঃ রায় যতদিন জেলে ছিলেন, ততদিন কেটেছে রোগী দেখে। কে বলবে, ডাঃ রায় বন্দী। বরং তাঁর আদেশ পালন করতে জেলের অফিসার, কর্মচারী সকলেই ব্যগ্র।

ডাঃ রায় প্রতিটি রোগীর নামধাম, উপসর্গ খাতায় লিখে রাখতেন। বহুদিন পরেও যদি রোগী আবার তাঁকে দেখাতে আসত, তবে তিনি অনায়াসে আগেকার রোগের ইতিহাস বের করে দেখতে পারতেন। দুশোর উপর বড় বড় খাতা তাঁর ছিল। সে সব খাতায় রোগীর উপসর্গগুলি লেখা।

শিক্ষার সঙ্গে সারাজীবন জড়িত ছিলেন ডাঃ রায়। ১৯১৬ সালে এবং ১৯২১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হন। একবার কার্মাইকেল মেডিকেল কলেজের এডুকেশন সোসাইটির নির্বাচনে একটি ঘটনা ঘটে, যা থেকে ডাঃ রায়ের চরিত্রের দৃঢ়তা প্রকাশ পায়। কে. পি থমাস তাঁর 'ডাঃ বি. সি. রায়' গ্রন্থে কলেজের একটি নির্বাচনের উল্লেখ করেছেন। ডাঃ রায় তখন কার্মাইকেল মেডিকেল কলেজে মেডিসিনের অধ্যাপক হিসাবে সবে যোগ দিয়েছেন। বেঙ্গল মেডিকেল এডুকেশন সোসাইটির পরিচালক-সমিতির একজন সদস্য নির্বাচন করা হবে। ডাঃ বিধান রায় এবং ডাঃ মৃগেন্দ্রলাল মিত্র নির্বাচন-প্রার্থী। মৃগেন্দ্রলাল প্রবীণ ব্যক্তি, তাঁর বিরুদ্ধে না দাঁড়াবার জন্য অনেকে ডাঃ রায়কে অনুরোধ করলেন। কিন্তু ডাঃ রায়ের অনমনীয় মনোভাব। ভোট নেওয়া হল। ডাঃ রায় পেলেন ১৯টি ভোট এবং ডাঃ মিত্র পেলেন ১৮টি ভোট। ডাঃ সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারী ছিলেন সভাপতির আসনে। তিনি বললেন, তাঁর ভোট দেওয়া তখনো বাকি। এই বলে তিনি ভোট দিলেন ডাঃ মিত্রকে। এবার দুজনের ভোট সমান সংখ্যক। ডাঃ সর্বাধিকারী তখন সভাপতির নির্ণায়ক ভোটটি দিলেন ডাঃ মিত্রের পক্ষে। ডাঃ মিত্রকে নির্বাচিত বলে ঘোষণা করা হল। ডাঃ সর্বাধিকারীর এই অন্যায় আচরণে ডাঃ রায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। কিন্তু ডাঃ সর্বাধিকারী ছিলেন অতিশয় রাগী লোক। ডাঃ রায় সামনাসামনি ঝগড়া না করে এক চিঠি লিখলেন: 'সিনেটের সভায় অনেক সময় আপনি স্যার আশুতোষের অনেক কার্যের তীব্র সমালোচনা করেছেন এবং তাঁর স্বজনপোষণ-নীতির প্রতি সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি, ক্ষমতা হাতে পেলে

সকলেই তার অপব্যবহার করে। আপনি আশুতোষকে সব ব্যাপারেই অনুকরণ করেছেন, একমাত্র তাঁর মহৎ গুণগুলি ছাড়া। আপনি এখন নিশ্চয়ই অনুভব করছেন যে ডাঃ মিত্রের নির্বাচনের ব্যাপারে আপনি কত বড় অন্যায় কাজ করেছেন। আপনি যা করেছেন, তা অবৈধ, অযৌক্তিক এবং পক্ষপাতদুষ্ট।'

পরদিন কলেজে আসার পর ডাঃ সর্বাধিকারী ডাঃ রায়কে ডেকে বললেন, 'বিধান, তুমি আমার গালে আচ্ছা চড় কষিয়েছ। ডাঃ মিত্রের নির্বাচন বাতিল করে দেব ভাবছি।' ডাঃ রায় বললেন, 'ইতিমধ্যেই আপনি একটি অন্যায় করেছেন, আরো একটি করতে যাবেন না।' ডাঃ সর্বাধিকারীকে এমন কড়া চিঠি লেখার সাহস সে যুগে বেশি লোকের ছিল না। তার উপর তিনি ছিলেন কার্মাইকেল মেডিকেল কলেজের সর্বময় কর্তা।

ডাঃ রায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হন ১৯৪১ সালে। যুদ্ধের জন্য সে সময়টা খুব সমস্যা-সংকুল ছিল। শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রায় ধ্বসে পড়ার মতো অবস্থা। সে সময় ডাঃ রায় দিনরাত পরিশ্রম করেছেন যাতে শিক্ষার কাজকর্ম ব্যাহত না হয়।

জুট টেকনোলজি স্কুল, সোস্যাল ওয়েলফেয়ার ইনস্টিটিউট তাঁরই উদ্যোগে স্থাপিত হয়। তিনিই ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত ডাক্তারদের জন্য দুবছরের কনডেন্‌সড্ কোর্সে এম. বি. হবার সুযোগ করে দেন। এর ফলে বহু এল. এম. এফ. ডাক্তার ভবিষ্যতে অনেক উন্নতি করতে পেরেছেন। ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন, যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, খড়গপুরের টেকনলজিক্যাল ইনস্টিটিউট পরিকল্পনার এবং প্রতিষ্ঠার সঙ্গে ডাঃ রায় বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন।

১৯৩৯ সালে ডাঃ রায় ভারতীয় মেডিকেল কাউন্সিলের সভাপতি নির্বাচিত হন। তাঁর আগে সভাপতি মনোনীত হতেন সরকার কর্তৃক। তিনিই প্রথম বেসরকারী সভাপতি।

ডাঃ রায়ের অসংখ্য কীর্তির মধ্যে যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতাল এবং চিত্তরঞ্জন সেবাসদন প্রতিষ্ঠা অন্যতম। প্রভাসচন্দ্র ঘোষ নামে যক্ষ্মা

রোগে আক্রান্ত এক যুবক তাঁর সম্পত্তি যক্ষ্মা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করার জন্য দান করে যান এবং ডাঃ রায়কে অন্যতম ন্যাসপাল নিযুক্ত করেন। সেই সম্পত্তি বিক্রয় করে যে অর্থ আসে, তা দিয়ে তৈরি হয় যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতাল। হাসপাতাল শুরু হয়েছিল চার শয্যা নিয়ে। ক্রমে হাসপাতালের আয়তন এবং শয্যাসংখ্যা বাড়াতে হল। ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায় হাসপাতালের দায়িত্ব নিলেন। বর্তমানে এই হাসপাতাল দেশের একটি বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান।

চিত্তরঞ্জন সেবাসদনকে একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ প্রসূতিসদন রূপে গড়ে তোলার জন্য ডাঃ রায় তাঁর মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন। দেশবন্ধু ১৯২৪ সালে তাঁর সম্পত্তির ন্যাস প্রস্তুত করেন এবং ডাঃ রায়কে অন্যতম ন্যাসপাল মনোনীত করেন। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর তাঁর রসা রোডের বাড়িটিকে একটি প্রসূতিসদনে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ১৯২৬ সালে ১৪ই এপ্রিল পণ্ডিত মতিলাল নেহরু এই সেবাসদনের উদ্বোধন করেন। নতুন আরো একটি ব্লক তৈরি করা হল। এই ব্লকের উদ্বোধন করলেন গান্ধীজী ১৯২৯ সালের ২রা জানুয়ারি। যশস্বী স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞ ডাঃ বামনদাস মুখোপাধ্যায় যোগ দিলেন এখানে। ক্রমে এই হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত হল ক্যান্সার হাসপাতাল। কে. পি. থমাস যথার্থই লিখেছেন, এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি ইঁট ডাঃ রায়ের চেনা এবং প্রতিটি ইঁট চেনে ডাঃ রায়কে।

ডাঃ রায়ের মতো যাঁদের বিরাট প্রতিভা, তাঁরা শুধু চিকিৎসা বা কয়েকটা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না। তাঁদের কর্মক্ষেত্রের পরিধি হয় অতি বিস্তৃত। বলা বাহুল্য, রাজনীতিতে প্রবেশ না করলে সে ব্যাপ্তি পাওয়া যায় না। ডাঃ রায় রাজনীতির মঞ্চে অবতীর্ণ হলেন ১৯২২ সালে এবং প্রথম প্রবেশেই সবাইকে স্তম্ভিত করে দিলেন। ১৯২৩ সালে বঙ্গীয় আইনসভার নির্বাচনে তিনি পরাজিত করলেন বাংলার 'মুকুটহীন সম্রাট' সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জিকে। এক সময় সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা দেশবাসীর প্রাণে সাড়া জাগাত। কিন্তু মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করে তিনি দেশবাসীর শ্রদ্ধা হারালেন।

ডাঃ রায় কংগ্রেসের সাংগঠনিক কাজে সক্রিয় অংশ নিলেন ১৯২৮ সালে বার্ষিক কংগ্রেস অধিবেশনের সময়। এই সম্মেলনে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ছিলেন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত আর সাধারণ সম্পাদক ছিলেন ডাঃ রায়। এই সময়েই তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হন। ১৯৩০ সালে তিনি কলকাতা কর্পোরেশনের অলডারম্যান নির্বাচিত হন এবং পরের বছর নির্বাচিত হন মেয়র। ১৯৩২ সালে আবার তিনি মেয়র-পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। সেবার তিনি পরাজিত করেছিলেন আর এক প্রতাপশালী নেতাকে, তিনি জনাব এ. কে. ফজলুল হক। বিধানচন্দ্র যখন মেয়র, তখন আচার্য জগদীশচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মদিবস পালিত হয় কর্পোরেশনের উদ্যোগে।

ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির আগে ডাঃ রায়ের সত্যিকার পরিচয় শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক হিসাবে। তাঁর সম্মান, যশ সব কিছুই চিকিৎসার দৌলতে। স্বাধীনতালাভের সময় ডাঃ রায় ছিলেন আমেরিকায়। জওহরলাল নেহরু টেলিফোনযোগে তাঁকে জানালেন, তাঁকে উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল মনোনীত করা হয়েছে। ডাঃ রায়ের কাছে রাজ্যপাল পদের পক্ষে আকর্ষণ না থাকাই স্বাভাবিক। তিনি জানালেন, সেপ্টেম্বরের আগে ফিরতে পারবেন না। ১লা নভেম্বরে ডাঃ রায় যখন ফিরে এলেন, তখন উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল সরোজিনী নাইডু।

ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী হলেন, কিন্তু তাঁর পক্ষে বেশিদিন কাজ করা দুষ্কর হয়ে উঠল। অতঃপর ডাঃ রায়কে করা হল মুখ্যমন্ত্রী। পশ্চিমবঙ্গে তখন অসংখ্য সমস্যা, সবচেয়ে বড় সমস্যা উদ্বাস্তু-পুনর্বাসন। ডাঃ রায় এ কাজে পুরোপুরি সফল হননি সত্য, তবে তাঁর চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসন তাঁরই উৎসাহে সম্ভব হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে অসংখ্য সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য নানা প্রকল্পে তিনি হাত দিয়েছিলেন। ময়ূরাক্ষী প্রকল্প, দুর্গাপুর প্রকল্প, হরিণঘাটা দুগ্ধকলোনী, কল্যাণী শহর পত্তন, লবণহ্রদে নতুন কলকাতা গড়ে তোলা—সবই তাঁর কল্পনাপ্রসূত। দুর্গাপুরের ইস্পাত

কারখানা, চিত্তরঞ্জন ইঞ্জিন তৈরির কারখানা প্রভৃতি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পেও তাঁর যথেষ্ট হাত ছিল।

কলকাতা শহরের উন্নয়নে তিনি বিশেষ চেষ্টিত হয়েছিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন আমেরিকায়। বিশ্বব্যাঙ্ক ও ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের সঙ্গে তিনি এ ব্যাপারে যোগাযোগ স্থাপন করেন। তাতেই গড়ে উঠল কলকাতা মেট্রোপলিটন সংস্থা। ১৯৬১ সালে ডাঃ রায়কে 'ভারত-রত্ন' উপাধি দেওয়া হয়।

১৯৬২ সালে ডাঃ রায় চতুর্থবার তাঁর মন্ত্রীসভা গঠন করলেন। কিন্তু তাঁর জন্মদিনের তারিখেই অর্থাৎ ১লা জুলাই তিনি পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিলেন। অসংখ্য কাজে তিনি হাত দিয়েছিলেন, সমস্যা-জর্জরিত পশ্চিমবঙ্গকে নতুনভাবে গড়তে চেয়েছিলেন, কিন্তু সেসব পরিকল্পনা রয়ে গেল অসম্পূর্ণ। তাঁর মৃত্যু পশ্চিমবঙ্গে এনে দিল এক বিরাট শূন্যতা। এমন ব্যক্তিত্ব, এমন কল্পনা-শক্তি, অথচ এমন ব্যবহারিক জ্ঞান সচরাচর পাওয়া যায় না। প্রতাপাদিত্যের বংশে জন্ম ডাঃ রায়ের। উত্তরাধিকার সূত্রেই লাভ করেছিলেন নির্ভীকতা ও ব্যক্তিত্ব। প্রতাপাদিত্যের মতই ডাঃ রায়কে এক পরাক্রান্ত শত্রুর সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছিল, সে শত্রু বাংলার সমস্যা। বহুবার ডাক এসেছে কেন্দ্রে যাবার জন্য, কিন্তু তাঁর এক কথা, পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে কোথাও যাব না।

গবেষণার ক্ষেত্রে চিকিৎসক

গবেষণার প্রতি আমাদের দেশের চিকিৎসকদের নিতান্তই অনীহা, এই অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়। কিন্তু ভুললে চলে না, এদেশে রোগীর চিকিৎসার জন্যই প্রয়োজনীয় সংখ্যক চিকিৎসক জোটানো শক্ত, গবেষণা তো পরের কথা। তার উপর চিকিৎসায় অর্থ ও সম্মান দুই-ই সহজলভ্য। নৈষ্ঠিক গবেষক বিদগ্ধসমাজে সম্মানিত হন বটে, তবে অর্থপ্রাপ্তির ভাগ্য সবসময় সুপ্রসন্ন নয়। বর্তমানে অবশ্য ভারতবর্ষে অনেক চিকিৎসক গবেষণায় নিরত আছেন এবং তাঁদের অনেকের উল্লেখযোগ্য অবদানও রয়েছে।

আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উন্নতির মূল কারণ গবেষণা। উনিশ শতকের শেষভাগে ও বিশ শতকের গোড়ার দিকে ভারতে কর্মরত অনেক বিদেশী চিকিৎসক নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কার করে অনেক ব্যাধি নির্মূল করার ভূমি রচনা করেন। রোনাল্ড রস্ (Ronald Ross) ম্যাকনামারা (N. C. Macnamara), লিওনার্ড রজার্স (Col. Sir Leonard Rogers), মেগাও (J. W. D. Megaw), নেপিয়ার (L. E. Napier) প্রভৃতির নাম সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত। রস্‌কে আধা-ভারতীয় বলা চলে, কারণ তাঁর জন্ম আলমোড়াতে। মশা যে ম্যালেরিয়া রোগ ছড়ায়, এই তথ্য আবিষ্কারের জন্য ১৯০২ সালে রসকে 'নোবেল পুরস্কার' দেওয়া হয়।

১৮৯৭ সালের ২০শে আগস্ট একটি স্মরণীয় দিন। সেকেন্দ্রাবাদে কাজ করার সময় রস্ একটি মশার শরীর পরীক্ষা করতে করতে এর পাকস্থলীর আবরণে ম্যালেরিয়ার জীবাণুর বিবর্তিত অবস্থা দেখতে পান। রস-এর এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের ফলে পৃথিবী থেকে ম্যালেরিয়া নির্মূল হবার পথ সুগম হল। বিজ্ঞানের গবেষণা ছাড়া রস্-এর আর একটি বিশেষ খ্যাতি ছিল। তিনি ছিলেন প্রথম শ্রেণীর

সাহিত্যিক। রস-এর 'মেময়ার্স' এবং 'স্পিরিট অব স্টর্ম' যাঁরা পড়েছেন, তাঁরাই স্বীকার করবেন কী অসাধারণ তাঁর রচনা। রস-এর কর্মস্থল ছিল সেকেন্দ্রাবাদ ও কলকাতা।

জার্মান বৈজ্ঞানিক রবার্ট ককের সঙ্গে ভারতের, বিশেষ করে কলকাতার সংযোগ ছিল। কক্ ১৮৮৩ সালে ইজিপ্টে কলেরার জীবাণু আবিষ্কার করেন। পরের বছর আসেন কলকাতায়। এখানে কাজ করেই তিনি এই জীবাণুর অস্তিত্ব নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেন। কলেরার উপর গবেষণা করেছেন ম্যাকনামারা, রজার্স। ম্যাকনামারা মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। কলেরার উপর লেখা তাঁর বিরাট গ্রন্থ এখনো অতি মূল্যবান। রজার্সের কাজ ছিল ব্যাপক। বহু বিষয় নিয়ে তিনি গবেষণা করেছিলেন। কলেরা, কালাজ্বর, আমাশয়, কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগের উপর নতুন আলোকপাত করেছিলেন।

আগেকার দিনে কলেরার কোনো সুচিকিৎসা ছিল না। কলেরা হলে মৃত্যু ছিল অবধারিত। ক্যালোমেল দেওয়া, নাইট্রিক অ্যাসিডের ব্লিস্টার দেওয়া থেকে তামাক, গাঁজা সব কিছুই চলত। ডেভিড হেয়ারের কলেরা হলে তাঁর প্রিয় ছাত্র ডাঃ প্রসন্ন মিত্র তাঁকে তখনকার প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ব্লিস্টার দিয়ে চিকিৎসা করেছিলেন। হেয়ার সাহেব নাকি অবশেষে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, 'প্রসন্ন, আর ব্লিস্টার দিও না। শান্তিতে মরতে দাও।' কলেরার চিকিৎসায় যখন থেকে শিরার ভিতর দিয়ে লবণ-দ্রব চালিত করা প্রচলিত হয়, তখন থেকে আশ্চর্য ফল লক্ষিত হয়। প্রথম দিকে ব্যবহৃত হত নরম্যাল সেলাইন (Normal saline)। রজার্স প্রচলন করেন হাইপারটনিক সেলাইন (Hypertonic saline)। তিনি লক্ষ্য করলেন এর ব্যবহারের ফলে মৃত্যুহার আরো হ্রাস পায়। কলেরা রোগীর শিরার ভিতর দিয়ে লবণ-দ্রব চালনা করা মাঝে মাঝে খুব কঠিন হয়, কারণ শিরা খুঁজে পাওয়া যায় না। রজার্স সেজন্য প্রস্তুত করেন রজার্স ক্যান্নুলা (canula) যা দিয়ে লবণ-দ্রব শরীরের ভিতর চালিত করা সহজ হয়। বর্তমানে সময়মতো চিকিৎসা হলে কলেরা রোগীর মৃত্যু হয় না।

রজার্স ১৯০৪ সাল থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত মেডিকেল কলেজে প্যাথলজির অধ্যাপক ছিলেন। তাঁরই উৎসাহে ও উদ্যোগে 'কলকাতা স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন' স্থাপিত হয়।

মেডিকেল কলেজের রসায়নের অধ্যাপক উইলিয়ম ব্রুক ও'স্যানেসী (Sir W. B. O'Shaughnessy), উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক জর্জ কিং (Lt. Col. G. King), তুলনামূলক অ্যানাটমির অধ্যাপক এলকক (Lt. Col. A.W. Alcock), প্যাথলজির অধ্যাপক ডি. ডি. ক্যানিংহাম (Col. D. D. Cunningham), শল্যচিকিৎসার অধ্যাপক জোসেফ ফেরার (J. Fayrer) প্রভৃতিরা রয়াল সোসাইটির 'ফেলো' নির্বাচিত হয়েছিলেন। প্রসিদ্ধ শল্যচিকিৎসক কেনেথ ম্যাকলিয়ড (K. Mcleod) লিস্টারের প্রবর্তিত বীজবারক পদ্ধতি (antiseptic) অনুসরণ করে শল্যচিকিৎসার ভয়াবহতা দূর করেন। আগেকার দিনে অপারেশনের পর প্রায়ই ক্ষতস্থান বিষাক্ত হয়ে অনেক রোগীর মৃত্যু হত। হাসপাতালের আবহাওয়াও হত দুর্গন্ধময়। লিস্টার প্রথম বীজবারক পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। ম্যাকলিয়ড এডিনবরায় গিয়ে লিস্টারের পদ্ধতি দেখে আসেন এবং কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এই ব্যবস্থা চালু করেন।

গবেষণায় বিদেশী বৈজ্ঞানিকদের তুলনায় দেশীয় চিকিৎসকদের খ্যাতি যদিও কিছু নিষ্প্রভ,তবু কয়েকজন বাঙালী চিকিৎসক বৈজ্ঞানিক মহলে যথেষ্ট স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। কানাইলাল দে, চুনিলাল বসু, গোপালচন্দ্র চাটার্জি এবং উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর নাম তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

উনিশ শতকে কানাইলাল দে বাঙালী চিকিৎসকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গবেষক বলে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। খ্যাতনামা চিকিৎসক সে সময় অনেকে ছিলেন, তাঁদের কেউ কেউ গবেষণামূলক প্রবন্ধও লিখতেন বটে, তবে নিষ্ঠাবান গবেষক বলতে ছিলেন একমাত্র কানাইলাল দে। চিকিৎসকদের সভা-সমিতিতে ওষুধ ও রসায়ন সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন উঠলে সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকত ডাঃ দে-র উপর। তিনি যা বলবেন, তাই শেষ কথা।

ডাঃ দে-র গবেষণার বিষয়বস্তু দেশীয় ওষুধের রাসায়নিক বিশ্লেষণ। আমাদের দেশে এমন অনেক ওষুধ প্রচলিত হয়ে আসছে, যেগুলির উপকারিতা সকলেরই জানা, কিন্তু কী রাসায়নিক উপাদানের ফলে শরীরে ক্রিয়া হয়, সে সম্বন্ধে কারো কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না। ডাঃ দে-ই প্রথম এ-বিষয়ে চিকিৎসকদের দৃষ্টি ফেরান। তিনি বহু ওষুধের গুণাগুণ বিশ্লেষণ করেন এবং তাঁর গবেষণালব্ধ ফল প্রকাশ করেন তৎকালীন শ্রেষ্ঠ মেডিকেল জার্নালগুলিতে। ডাঃ দে ১৮৭৭ সালে প্রকাশ করেন তাঁর লিখিত বিরাট গ্রন্থ *'Indigenous Drugs of India'*। এ গ্রন্থই প্রমাণ, তিনি কত নিষ্ঠাসহকারে দেশীয় ওষুধের গুণাগুণ পরীক্ষা করেছিলেন। বস্তুত এই সূত্র ধরেই পরবর্তীযুগে রামনাথ চোপরা, প্রেমাঙ্কুর দে, বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, বিষ্ণুপদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ গবেষকগণ দেশীয় ওষুধের উপর গবেষণা করে বহু তথ্য উদ্ঘাটিত করেন। অসংখ্য দেশীয় ওষুধ সংগ্রহ করেছিলেন ডাঃ দে। এই সব সংগ্রহ বিভিন্ন প্রদর্শনীতে দেখান হয়েছিল। ১৯৬২ এবং ১৯৬৭ সালে অনুষ্ঠিত বিশ্ব-প্রদর্শনীতে তাঁর সংগ্রহ সকলের প্রশংসা লাভ করেছিল এবং ডাঃ দে স্বর্ণ-পদক লাভ করেছিলেন। প্যারিস প্রদর্শনীতে ভারতীয়দের মধ্যে পুরস্কারপ্রাপক একমাত্র ডাঃ দে। ১৮৮১-'৮২-এ অনুষ্ঠিত কলকাতার এবং ১৮৮৩-এ অনুষ্ঠিত জয়পুরের প্রদর্শনীতে ডাঃ দে অন্যতম বিচারক মনোনীত হয়েছিলেন। লণ্ডনে অনুষ্ঠিত 'ইণ্টার ন্যাশনাল ফার্মাসিউটিকাল ও মেডিকেল কংগ্রেসে' যোগদানের জন্য ডাঃ দে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর পক্ষে যাওয়া সম্ভব হয়নি।

ডাঃ দে অনেক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন বাংলায় ও ইংরেজিতে। তাঁর রচিত পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যার বাংলা গ্রন্থ স্কুলে পাঠ্য ছিল। সরকারের অনুরোধে ডাঃ জন মারের (Dr. John Murray) 'প্যাথলজি ও ট্রিটমেণ্ট অব কলেরা' গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করেন। তাঁর 'মেডিকেল জুরিসপ্রুডেন্স' গ্রন্থটি মেডিকেল স্কুলগুলিতে পড়ান হত।

কানাইলাল দে-র জন্ম কলকাতার এক সম্ভ্রান্ত বংশে ১৮৩১ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর। তাঁর পিতার নাম রাধানাথ দে। মেডিকেল কলেজের

শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ১৮৫৪ সালে এবং সেই বছরই সরকারী কাজে যোগ দেন। প্রথমেই তিনি নিযুক্ত হন মেডিকেল কলেজের রসায়ন বিভাগে অধ্যাপকের সহকারী হিসাবে। তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের কর্মপন্থা তখনই নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। প্রায় সারাজীবন গবেষণাগারেই কাটিয়েছিলেন।

মেডিকেল কলেজের রসায়নের অধ্যাপক এফ. এন. ম্যাকনামারার অবর্তমানে ডাঃ দে কিছুকাল অধ্যাপকের পদে অস্থায়ীভাবে কাজ করেন। সে সময়ে অধ্যাপকের পদ শুধু ইয়োরোপীয়দের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। ১৮৬৯ সালে তিনি মেডিকেল কলেজের বাংলা শাখায় রসায়ন ও চিকিৎসা আইন-বিজ্ঞান (Medical Jurisprudence)-এর শিক্ষক নিযুক্ত হন। আরো একবার মেডিকেল কলেজে রসায়নের অধ্যাপক হিসাবে তিনি কাজ করেন কিছুদিন, যখন অধ্যাপক সি. এইচ. উড ছুটিতে ছিলেন। ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুল স্থাপিত হলে তিনি সেখানে চলে আসেন। ১৮৮৪ সালের ৫ই মে ডাঃ দে সরকারী কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। সরকার তাঁকে 'রায় বাহাদুর' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করে। তাঁর অবসর গ্রহণ-কালে 'স্টেটসম্যান' কাগজ লিখেছিল, 'Rai Kanyelal is an ornament to his service which ought to feel proud of him'। সেকালের আর কোনো ভারতীয় চিকিৎসকের সম্বন্ধে কোনো বিদেশী-পরিচালিত কাগজ এমন কথা বলেনি। দেশী ও বিদেশী সকলেই তাঁকে গভীর শ্রদ্ধা করত। দীর্ঘ ত্রিশ বছরের কর্মজীবনে তিনি একদিনও ছুটি নেননি। এটা একটা বিরাট রেকর্ড বলা যেতে পারে। তাঁর একমাত্র পুত্র প্রিয়লাল দে লণ্ডনস্থিত কেমিকেল সোসাইটির ফেলো হয়েছিলেন। মেডিকেল কলেজের রসায়ন বিভাগে প্রথম ভারতীয় স্থায়ী অধ্যাপক রায় বাহাদুর চুণিলাল বসু। কানাইলাল দে দুবার অধ্যাপকের পদে কাজ করেছিলেন, কিন্তু দু'বারই অস্থায়ীভাবে। চুণিলাল বসু রসায়নের গবেষণায় এতই মৌলিকত্ব দেখিয়েছিলেন যে সরকারের পক্ষে অস্বীকার করার উপায় ছিল না যে ইয়োরোপীয়দের মধ্যে চুণিলালের চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তি

নেই। তাই এফ. এন. উন্‌ডসরের (Lt. Col. F. N. Windsor) পরে চুণিলাল অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হলেন। তাঁর আগে মাত্র দুজন বাঙালী মেডিকেল কলেজে অধ্যাপক হয়েছিলেন। তাঁরা হলেন সূর্যকুমার গুডিব চক্রবর্তী (১৮৬৭-৭৪) এবং রাজেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র (১৮৭৪-৯৩)। দুজনেই ছিলেন মেটেরিয়ামেডিকা ও ক্লিনিক্যাল মেডিসিনের অধ্যাপক।

চুণিলালের জন্ম ১৮৬১ সালের ১৩ই মার্চ কলকাতার শ্যামবাজারে। পিতা দীননাথ বসু। কৌলিক নিবাস চব্বিশ পরগণায় হরিনাভির নিকট চাংগ্রিপোতা গ্রাম। স্কুলের পড়াশুনা সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলে। ১৮৭৮ সালে এনট্রাস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ভর্তি হন জেনারেল অ্যাসেম্‌লিজ ইনস্টিটিউশনে (বর্তমান স্কটিশ চার্চ কলেজ)। এই সময়ে নরেন্দ্রনাথ দত্তও (বিবেকানন্দ) এই কলেজের ছাত্র ছিলেন। নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে চুণিলালের সৌহার্দ্য গড়ে উঠেছিল এবং সারাজীবন তা অটুট ছিল।

১৮৮০ সালে তিনি ভর্তি হলেন কলকাতা মেডিকেল কলেজে। কৃতিত্বে উজ্জ্বল তাঁর ছাত্রজীবন। কলেজের প্রায় সব পুরস্কার, সব পদক তিনি লাভ করেন। প্রায় প্রতিটি বিষয়ে অনার্স নিয়ে ১৮৮৬ সালে এম. বি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এর পর সরকারী চাকরিতে যোগ দেন অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন-রূপে। একবছর পর বাংলা সরকারের সহায়ক রাসায়নিক পরীক্ষক নিযুক্ত হন। এর পর তিনি যান ব্রহ্মদেশে। এক বছর সেখানে কাটিয়ে ফিরে আসেন এবং যোগ দেন মেডিকেল কলেজের রসায়ন বিভাগে। এই সময় থেকে তাঁর জীবনের কার্যধারার পরিবর্তন ঘটে। রোগীর সঙ্গে সম্পর্ক তাঁর আর রইল না, গবেষণাগারই হল কর্মক্ষেত্র। ১৮৯৮ সালে বাংলা সরকারের অতিরিক্ত রাসায়নিক পরীক্ষক এবং রসায়নের অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত হন। অধ্যাপক-পদে পাঁচ বছর কাজ করার পর সরকারী কাজ থেকে তিনি অবসর নেন।

রসায়ন বিভাগে কাজ করার সময় ডাঃ বসু বাংলাদেশে প্রচলিত খাদ্যদ্রব্যের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করেন। তাঁর এই গবেষণার ফলে

ভারতের পূর্বাঞ্চলের ব্যাপক অপুষ্টির কারণ ব্যাখ্যা করা সহজ হল। বর্তমানে আমাদের দেশে খাদ্য ও পুষ্টির উপর প্রচুর গবেষণা হচ্ছে। বলা চলে, ডাঃ বসুই এই বিষয়ে গবেষণায় পথিকৃৎ। তখনকার মেডিকেল জার্নালের প্রায় প্রতিটি সংখ্যায় তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হত।

ডাঃ বসুর আর একটি বিখ্যাত গবেষণা হল, করবীফুলের রাসায়নিক ক্রিয়া ও বিষক্রিয়া বিশ্লেষণ। এই গবেষণার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'কোট্‌স মেমোরিয়াল পুরস্কার' অর্পণ করে ১৯০১-এ। রসায়নে গবেষণার জন্য কাশীর ধর্ম-মহামণ্ডল তাঁকে 'রসায়নাচার্য' উপাধিতে ভূষিত করে।

যদিও ডাঃ চুণিলাল বসুর জীবনের বেশির ভাগ সময় কেটেছে গবেষণাগারে, তবু চিকিৎসক-সমাজ তাঁকে সম্মানিত করেছে নানাভাবে। ১৮৯৪ সনে অনুষ্ঠিত প্রথম সারা ভারত চিকিৎসক সম্মেলনে তিনি সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯২৪ সনের সম্মেলনে তিনি বিজ্ঞানশাখার সভাপতিত্ব করেন। ক্যালকাটা মেডিকেল ক্লাবের জন্মলগ্ন থেকে তিনি এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিনি ছিলেন এই ক্লাবের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং শুরু থেকে অর্থাৎ ১৯০১ থেকে ১৯১৭ পর্যন্ত এই ক্লাবের অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ। পরে এই ক্লাবের সহ-সভাপতিও হয়েছিলেন। তিন বছর ক্লাবের বহুল-প্রচারিত জার্নালটি দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদনা করেছিলেন তিনি।

১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে ডাঃ বসু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' নির্বাচিত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু পরীক্ষার পরীক্ষক ছিলেন তিনি। চিকিৎসা-বিদ্যার তো বটেই, কলাবিদ্যারও পরীক্ষক ছিলেন। সরকার তাঁকে 'রায় বাহাদুর' ও 'সি. আই. ই.' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করে। ১৯২১ সালে ডাঃ বসু কলকাতার 'শেরিফ' হন। চিকিৎসকদের মধ্যে তিনি দ্বিতীয় শেরিফ। তাঁর আগে একমাত্র ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার শেরিফ হয়েছিলেন।

রসায়ন আর সাহিত্য—দুটিরই রস নিয়ে কারবার; কিন্তু বলাবাহুল্য

দুটির রস ভিন্ন জাতের এবং আপাতবিরোধী। বিজ্ঞানী যদি সাহিত্যের আসরে নামেন, তবে নাকি অনধিকার চর্চা হয়, তাঁরা জাতিভ্রষ্ট হন। কিন্তু রোনাল্ড রস্-এর বেলায় তা সত্য নয়, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর বেলায় তা সত্য নয় এবং সত্য নয় ডাঃ চুণিলাল বসুর বেলায়। চিকিৎসক-সাহিত্যিক দুরকমের। এক, সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ এতই গভীর যে চিকিৎসাশাস্ত্রের সঙ্গে সম্পর্ক অতি ক্ষীণ বা, নেই, মূল লক্ষ্য সাহিত্য। সুখের বিষয়, এই দলে দু-একজনের বেশি নেই। আর দুই, চিকিৎসাই প্রধান, কখনো কখনো সাহিত্যের আসরে আনা-গোনা অর্থাৎ সাহিত্য-বিলাস। এই দলে অনেকে পড়েন। চুণিলাল এই দুই দলের একটিতেও পড়েন না। তাঁর অধিকাংশ রচনা খাদ্য ও স্বাস্থ্য বিষয়ক অর্থাৎ বিজ্ঞান ভিত্তিক। আমাদের দেশের গবেষকগণ গবেষণা-মূলক প্রবন্ধ ইংরেজিতে প্রকাশ করেন, দেশীয় ভাষায় প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন না। কিন্তু ডাঃ বসু যেমন তৎকালীন শ্রেষ্ঠ মেডিকেল জার্নালগুলিতে নিয়মিত প্রবন্ধ লিখতেন, তেমনি তা লিখতেন বাংলায়। তাঁর প্রথম বাংলা গ্রন্থ 'খাদ্য'। ১৯১০ সালে বাগবাজার সাহিত্যসভার গ্রন্থ-প্রচার বিভাগ থেকে প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকলের দৃষ্টি এই গ্রন্থটির প্রতি আকৃষ্ট হয়। প্রাঞ্জল ভাষায় চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ রচনা যে সম্ভব, তা তিনি প্রমাণ করলেন। তাঁর গ্রন্থ ইংরেজি গ্রন্থের অনুবাদ নয় কোনো ক্রমেই অথবা শুধু তথ্যের শুষ্ক উল্লেখ নয়—তাঁর প্রতিটি রচনাই রস সমৃদ্ধ। ফলে তাঁর রচিত 'খাদ্য', 'শারীর স্বাস্থ্য বিধান' (১৯১৩), 'পল্লী-স্বাস্থ্য' (১৯১৬), 'স্বাস্থ্য-পঞ্চক' (১৯১৮) প্রভৃতি গ্রন্থ সুখপাঠ্য সাহিত্য হয়ে উঠেছে। বিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থ ছাড়া ডাঃ বসু রচনা করেছেন 'পুরী যাইবার পথে', 'নীলাচল' প্রভৃতি ভ্রমণ কাহিনী। বাংলায় তিনি মোট তেরোটি এবং ইংরেজিতে বারোটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ডাঃ বসু যে সাহিত্যিক হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন তার প্রমাণ তিনি বহু বছর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি ছিলেন। ১৯২২ সালে মেদিনীপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে ডাঃ বসু বিজ্ঞানশাখার সভাপতিত্ব করেন।

ডাঃ চুণিলাল বসুর মতো মানবদরদী এদেশে বিরল। মানব-হিত ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। যেখানেই মানুষের দুঃখ দেখেছেন, লাঞ্ছনা দেখেছেন, সেখানেই তিনি এগিয়ে গেছেন। অর্থ দিয়ে, শ্রম দিয়ে সর্বপ্রকারে লোকের প্রয়োজনে সাহায্য করেছেন। তাঁর দানের হিসাব দিতে গেলে একটি দীর্ঘ তালিকা দিতে হয়। এই বললেই যথেষ্ট যে সে সময়ে কলকাতায় এমন কোনো দাতব্য প্রতিষ্ঠান ছিল না যা তাঁর অকৃপণ দানলাভে বঞ্চিত। সারা ভারত দাতব্য সমিতির তিনি ছিলেন সভাপতি। কলকাতার অনাথাশ্রমের এবং অন্ধ বিদ্যালয়ের কর্ম-সচিব ছিলেন বহু বছর। তাঁর অনলস পরিশ্রমে ও দক্ষ পরিচালনার গুণে এই প্রতিষ্ঠান দুটির প্রভূত উন্নতি হয়। সে সময়ে সুরাপান 'বাবুদের' ভিতর সাধারণ রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ডাঃ বসু 'সুরাপান নিবারণ সমিতি'র সহ-সভাপতি ছিলেন। উদারতা, সংযম ও চরিত্রমাধুর্যে তিনি সকল শ্রেণীর মানুষের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। সংসারী লোকের মধ্যে সাধারণত যে লোভ, নীচতা ও পরশ্রীকাতরতা দেখা যায়, ডাঃ বসুর চরিত্রে সে-সবের লেশমাত্র ছিল না। তাই তিনি ব্যতিক্রম।

১৯৩০ সালের ৩রা আগষ্ট রাঁচীতে ডাঃ চুণিলাল বসু শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুর পরও গবেষণার ধারা তাঁর বংশে অব্যাহত রয়েছে। তাঁর পুত্র জ্যোতিপ্রকাশ বসু কলকাতার স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনে বহুমূত্র রোগ নিয়ে গবেষণা করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এবং কৌটস্ পদক পেয়েছিলেন ১৯৩৯-এ। চুণিলালের এক পৌত্র ডাঃ অজিতকুমার বসুর নাম সারা ভারতে পরিচিত। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এস. এবং ইংল্যাণ্ডের এফ. আর. সি. এস.। তাঁর আগে বাংলাদেশ থেকে একমাত্র ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এই দুটি উপাধি অর্জন করেছিলেন।

তীক্ষ্ণ মেধা ও বিরাট প্রতিভার অধিকারী না হয়েও শুধু নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের জোরে যে মানুষ সমাজহিতকর কাজ করতে পারে, ডাঃ

গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনে এই সত্য পরিস্ফুট। চব্বিশ পরগণার সুখচর গ্রামে ১৮৬৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন গোপাল চট্টোপাধ্যায়। গ্রামের স্কুলে পড়াশুনা শেষ করে আসেন কলকাতায়। মেডিকেল কলেজ থেকে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে হাউস সার্জন হিসাবে কাজ করেন তিন বছর। ১৮৯৬ সালে তিনি মেডিকেল কলেজে সহায়ক জীবাণুবিদ্ পদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে জীবাণুতত্ত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। সকল দেশেই জীবাণুর উপর গবেষণা চলছে। কলকাতার মেডিকেল কলেজও ব্যতিক্রম নয়। ১৯০৪ সালে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক লিওনার্ড রজার্স প্যাথলজির অধ্যাপক হিসাবে যোগ দিলেন। তিনি ১৯২১ সাল পর্যন্ত অধ্যাপক ছিলেন।

এই সময়টা নিঃসন্দেহে মেডিকেল কলেজে গবেষণার স্বর্ণযুগ। গোপাল চট্টোপাধ্যায় রজার্সের সঙ্গে কাজে লেগে গেলেন। আগেই বলা হয়েছে রজার্স কলেরার চিকিৎসায় হাইপারটনিক সেলাইন ব্যবহার করে মৃত্যুহার কমিয়ে এনেছিলেন। ডাঃ চট্টোপাধ্যায় তাঁর গ্রামে অসহায় দর্শকের মত কলেরার তাণ্ডব প্রতি বছর লক্ষ্য করেছেন। তাঁর মনে হয়েছে এর প্রতিরোধে কিছু একটা করা দরকার। কলেরার টিকা সবে আবিষ্কৃত হয়েছে কিন্তু তার ফলাফল সম্পর্কে সকলে একমত নন। স্পেন দেশে ফেরান (Ferran) ১৮৮৩-এ কলেরার জীবাণু ইন্‌জেক্‌শন করে মানুষের শরীরে প্রবেশ করিয়ে কলেরার প্রতিষেধকের সূচনা করেন। হ্যাফকিনও (Haffkine—১৮৯২) কলেরার প্রতিষেধক ইন্‌জেক্‌শন প্রস্তুত করেন। কিন্তু এঁরা জীবিত জীবাণু ব্যবহার করেছিলেন এবং ফলে প্রতিক্রিয়া খুব বেশি হয়েছিল। ১৮৯৬ সালে কোলে (Kolle) মৃত জীবাণু ব্যবহার করে বর্তমানে ব্যবহৃত ইন্‌জেক্‌শনের শুরু করেন। গোপাল চট্টোপাধ্যায় মন স্থির করলেন তিনিও টীকা প্রস্তুত করবেন এবং সাধারণের উপর প্রয়োগ করে ফলাফল পরীক্ষা করবেন। ডাঃ চট্টোপাধ্যায় বালি অঞ্চলে বহুলোককে টিকা দেন। কিন্তু ফল আশানুরূপ পাওয়া গেল না কারণ টিকার পরিমাণ (dose) ছিল অল্প। কিছুদিনের মধ্যে খবর পাওয়া গেল, কয়েকটি দেশে

কলেরার টিকা বিশেষ কার্যকর হয়েছে। মেডিকেল কলেজের স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের অধ্যাপক বেণ্টলি (C. A. Bentley) বাংলাদেশে কলেরার টিকা প্রচলন করতে উৎসাহী হলেন, কিন্তু জনসাধারণ টিকা নিতে মোটেই আগ্রহী নয়। বেণ্টলি তখন ডাঃ চট্টোপাধ্যায়ের শরণাপন্ন হলেন। চব্বিশ পরগণার একটি এলাকা ঠিক করা হল, এখানে কলেরার প্রকোপ খুব বেশি ছিল। ডাঃ চট্টোপাধ্যায় শত শত স্বেচ্ছাসেবককে ইন্‌জেকশন দেবার কাজে লাগালেন এবং এলাকার প্রতিটি লোককে ইন্‌জেকশন দেওয়া হল। আশ্চর্য ফল দেখা গেল। সে বছর সেখানে কলেরার প্রকোপ হল খুব কম। বেণ্টলি এই পরীক্ষায় এতই অনুপ্রাণিত হলেন যে সারা ভারতে এর প্রচলনের চেষ্টা করতে লাগলেন।

রজার্স কালাজ্বরের উপর অনেক গবেষণা করেন। কালাজ্বরের জীবাণু তিনিই প্রথন 'কালচার' করেন। ডাঃ চট্টোপাধ্যায় একাজে রজার্সের প্রধান সহায় ছিলেন।

বাংলাদেশে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ছিল অত্যন্ত বেশি। রোনাল্‌ড রসের আবিষ্কারের পর বহুদেশে মশা, বিশেষ করে এনোফিলিস্‌ মশা বিনাশের চেষ্টা চলে। ভারতেও আই. এম. এস. অফিসাররা কোনো কোনো জায়গায় মশা বিনাশ করে ম্যালেরিয়া হ্রাস করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁদের প্রাথমিক প্রয়াস ব্যর্থ হয়। অফিসাররা ঘোষণা করলেন যে, রস-এর প্রস্তাবিত পন্থায় ম্যালেরিয়া দূর করা অসম্ভব এবং এতে অর্থ অপচয় হবে মাত্র। গোপাল চট্টোপাধ্যায় রস-এর আবিষ্কারে বিশেষ প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি আই এম. এস. অফিসারদের রিপোর্টে মোটেই দমলেন না। সংগঠিত করলেন 'অ্যান্টি-ম্যালেরিয়া সমবায় সমিতি'। কেন্দ্রীয় সোসাইটির সভাপতি হলেন স্যার কৈলাসচন্দ্র বসু। সেকালের প্রায় সব গণ্যমান্য ব্যক্তিই এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্র রায়, জগদীশচন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নীলরতন সরকার এর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বহু গ্রামে সোসাইটির স্থানীয় সমিতি গড়ে উঠেছিল। গ্রামের লোকদের কাছ থেকে চাঁদা নিয়ে কাজ করা হত। মশা যাতে জন্মাতে না পারে, সেজন্য

ডোবা, খানাখোন্দল ভরাট করে দেওয়া হত। রবীন্দ্রনাথ একবার ডাঃ চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে গিয়েছিলেন শিলাইদহতে। শান্তিনিকেতনেও সমিতির শাখা স্থাপিত হয়। সেখানে উৎসাহী কর্মী ছিলেন এল্মহার্স্ট। রস ১৯২৭ সালের জানুয়ারি মাসে কলকাতায় এসেছিলেন এবং ডাঃ চট্টোপাধ্যায়ের কাজ দেখে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর এই কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে রস্ ইন্স্টিটিউটের ফেলোশিপ অর্পণ করা হয়। ডাঃ চট্টোপাধ্যায়ের তৈলচিত্র লণ্ডনের রস্ ইন্স্টিটিউটে স্থাপিত হয়।

যক্ষ্মারোগীর চিকিৎসায় ডাঃ চট্টোপাধ্যায় যশস্বী হয়েছিলেন। চিকিৎসা করেই যে চিকিৎসকের কর্তব্য শেষ হয় না ডাঃ চট্টোপাধ্যায় তা দেখিয়ে দেন। থুথু ফেলার জন্য তিনি রোগীদের পাত্র দিতেন এবং রোগীদের বুঝিয়ে দিতেন যেখানে সেখানে থুথু ফেললে রোগ সংক্রামিত হয়।

ডাঃ চট্টোপাধ্যায় ১৯২২ সালে মেডিকেল কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং যোগ দেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে প্রটোজুলজির অবৈতনিক অধ্যাপক হিসাবে।

তিনি গবেষণার স্বীকৃতিস্বরূপ 'রায় বাহাদুর' উপাধি পান সরকারের কাছ থেকে। ১৯৫৩ সালে ৮৪ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

বৈজ্ঞানিকের জীবনে অনিশ্চয়তা যথেষ্ট। এমন অনেক বৈজ্ঞানিক ছিলেন বা আছেন, যাঁরা সারাজীবন গবেষণা করে গেছেন, কিন্তু তেমন কিছু চমকপ্রদ আবিষ্কার করার ভাগ্য তাঁদের হয় নি। আবার এমন অনেকে আছেন, তাঁরা যাতে হাত দিয়েছেন, তাতেই সফল হয়েছেন। ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী এমনি একজন ভাগ্যবান বৈজ্ঞানিক।

১৮৭৩ সালের ৭ই জুন জামালপুরে উপেন্দ্রনাথের জন্ম। সেখানে তাঁর পিতা নীলমণি ব্রহ্মচারী রেলওয়ের ডাক্তার ছিলেন। স্কুল জীবন থেকেই উপেন্দ্রনাথের প্রতিভা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল।

কলেজ জীবন হুগলী কলেজে। এখান থেকে বি. এ. পরীক্ষায় গণিতের অনার্সে তিনি প্রথমস্থান অধিকার করেন। এর পর কলকাতায় রসায়ন নিয়ে এম. এ. ক্লাসে ভর্তি হন। তাঁর পিতার ইচ্ছা তাঁর প্রতিভাবান পুত্র যেন চিকিৎসক হয়। কিন্তু চিকিৎসা-বিদ্যায় উপেন্দ্রনাথের তত উৎসাহ ছিল না, যতটা ছিল গণিত ও রসায়নের প্রতি। কিন্তু পিতার ইচ্ছাই শেষ পর্যন্ত পূর্ণ হল। উপেন্দ্রনাথ ভর্তি হলেন মেডিকেল কলেজে। আজ আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যেদিন উপেন্দ্রনাথ মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন, সেদিন দেশের এক শুভদিন সূচিত হয়েছিল এবং উপেন্দ্রনাথেরও কোনোদিন অনুতাপ করার কোনো কারণ ঘটেনি। মানুষের জীবনে যা যা কাম্য—অর্থ, যশ, লোকের কৃতজ্ঞতা সব কিছুই তিনি লাভ করেছিলেন। রসায়নশাস্ত্রে জ্ঞান ও চিকিৎসাবিদ্যার ব্যবহারিক নৈপুণ্য তাঁর গবেষণার ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। মেডিকেল কলেজে পড়ার প্রথম বছরে তিনি এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই পরীক্ষাতেও তিনি প্রথম শ্রেণী লাভ করেন। ১৮৯৯ সালে উত্তীর্ণ হন এম. বি. পরীক্ষায়। এতে মেডিসিন ও সার্জারি এই দুটি বিষয়ে তিনি প্রথম হয়েছিলেন। প্রধান দুটি বিষয়ে প্রথম হবার কৃতিত্ব অল্প লোকেরই আছে। ১৯০২ সালে তিনি এম. ডি. ও ১৯০৪ সালে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন।

এম. বি. পাস করার পরই ডাঃ ব্রহ্মচারী বেঙ্গল মেডিক্যাল সার্ভিসে যোগ দেন। প্রথমে তিনি ঢাকার মেডিকেল স্কুলে প্যাথলজি ও মেটেরিয়া-মেডিকার শিক্ষকরূপে কাজ করেন। ১৯০৫ সালে আসেন ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলে। এখানেই অতিবাহিত হয় তাঁর কর্মবহুল জীবনের অনেকগুলি বছর। ১৯২৩ সালে ডাঃ ব্রহ্মচারী কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অতিরিক্ত চিকিৎসক নিযুক্ত হন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি আই. এম.এস. না হয়েও এই পদে নিযুক্ত হলেন। এই সময় আরো দুজন ভারতীয় চিকিৎসক মেডিকেল কলেজে অবৈতনিক চিকিৎসক নিযুক্ত হন। তাঁরা হলেন স্যার কৈলাসচন্দ্র বসু ও শস্ত্রচিকিৎসক মেজর হাসান সুরাবর্দি। ডাঃ ব্রহ্মচারী ১৯২৭ সালে সরকারী কাজ

থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এবার তিনি আসেন কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ-রসায়নেরও অধ্যাপক নিযুক্ত হন তিনি। ১৯৪৬ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি এই অনলস বৈজ্ঞানিকের জীবনাবসান ঘটে।

ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলে কাজ করার সময় ১৯২০ সালে ডাঃ ব্রহ্মচারী আবিষ্কার করেন 'ইউরিয়া স্টিবেমাইন' (Urea Stibamine)। এই আবিষ্কারের ফলে লক্ষ্য লক্ষ্য মানুষের জীবন রক্ষা হল। সে সময় ম্যালেরিয়ার মতো কালাজ্বরের কবলে পড়েও বাংলা ও আসামের শত শত লোক প্রতি বছর প্রাণ হারাত। কালাজ্বর নিশ্চিত মৃত্যুর পরওয়ানা নিয়ে হাজির হত কারণ এর কোনো সুচিকিৎসা ছিল না। আগে কালাজ্বরকে ম্যালেরিয়ারই অন্য রূপ বলে মনে করা হত। ১৯০০ সনে লেইসম্যান (Leishman) কালাজ্বরের জীবাণু আবিষ্কার করেন। ১৯০৩ সনে ডনোভেন-ও (Donovan) এই জীবাণুর অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। পরবর্তী বৈজ্ঞানিকগণ প্রমাণ করেন সেণ্ডফ্লাই (Sandfly) এই রোগ একের দেহ থেকে অন্যের দেহে ছড়ায়।

কালাজ্বরের চিকিৎসার জন্য ১৯১৫ সনে প্রথম অ্যান্টিমনির (Antimony) ব্যবহার করেন রজার্স। অধিক পরিমাণে এই ওষুধ ব্যবহারে বিষক্রিয়া দেখা দিত, আবার অল্প পরিমাণে ব্যবহার করলে ফল হত না। ডাঃ ব্রহ্মচারীর 'ইউরিয়া স্টিবেমাইন' যদিও অ্যান্টিমনি থেকে তৈরি, তবু তা এই সব দোষ থেকে মুক্ত। অতএব অল্পদিনের মধ্যেই কালাজ্বরের একমাত্র ওষুধ হল ইউরিয়া স্টিবেমাইন। ক্রিস্টোফারস (S. R. Christophers), শর্ট (H. E. Shortt), ব্যারড (P. G. Barraud) এদের নিয়ে গঠিত 'ভারতীয় কালাজ্বর কমিশন' কেবলমাত্র ইউরিয়া স্টিবেমাইন ব্যবহার করেছিলেন। এই ওষুধ আবিষ্কারের ফলে উপেন্দ্রনাথ চিরস্মরণীয় হয়ে রইলেন। খ্যাতি, সম্মান অজস্রভাবে লাভ করেছেন, অর্থও উপার্জন করেছেন প্রচুর।

ইউরিয়া স্টিবেমাইনের নাম গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ল।

কালাজ্বর আর ব্রহ্মচারী দুটি অচ্ছেদ্য নাম হয়ে রইল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোটস্ পদক, স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের 'মিণ্টো-পদক', এশিয়াটিক সোসাইটির 'স্যার উইলিয়ম জোন্স' ও 'বার্কলে' পদক, 'কাইজার-ই-হিন্দ' পদক তাঁকে দেওয়া হয়। সরকার তাঁকে সম্মানিত করেন 'নাইটহুড' দিয়ে। ১৯৩৬ সালে অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সাধারণ সভাপতি হয়েছিলেন তিনি। ডাঃ ব্রহ্মচারী প্রথম ভারতীয় চিকিৎসক যিনি মূল কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন। তাঁর আগে অবশ্য একজন ভারতীয় চিকিৎসক মূল কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন, তিনি অধ্যাপক শিবরাম কাশ্যপ। যদিও কাশ্যপ আগ্রা মেডিকেল স্কুল থেকে ডিপ্লোমা নিয়ে কিছুদিন চিকিৎসাবৃত্তি চালিয়েছিলেন, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরূপে যশস্বী হয়ে ওঠেন এবং লাহোর গবর্নমেণ্ট কলেজে উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক হন। তাঁর জীবন কেটেছে উদ্ভিদবিদ্যার চর্চায়, অতএব তাঁকে চিকিৎসক বলা হয় না। ডাঃ ব্রহ্মচারীর আগে কংগ্রেসের মূল সভাপতিদের মধ্যে চিকিৎসক ছিলেন তিনজন। এই তিনজনই ছিলেন বিদেশী।

১৯২৯ সালে অনুষ্ঠিত রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের এক সভায় সভাপতির ভাষণে ডাঃ ব্রহ্মচারী বলেন :

> ক্যাম্পবেল হাসপাতালের সেই রাতটির কথা মনে হলেএখনো আনন্দ হয়। রাত দশটায়, কেরোসিনের ক্ষীণ আলোয় ধূমাচ্ছন্ন ঘরের ভিতর আমার গবেষণার প্রথম ফল প্রত্যক্ষ করলাম। তখনো জানতাম না, ঈশ্বর আমার হাতে এমন এক অমোঘ অস্ত্র দিয়েছেন যা দিয়ে আমার দেশের লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ রক্ষা হবে। যে ঘরটিতে আমি দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কাজ করেছি, সে ঘরে না ছিল বিজলি বাতি, না ছিল গ্যাস, জলের ট্যাপ। তবু সে ঘর আমার কাছে চিরদিন তীর্থস্থান হয়ে থাকবে।
>
> নিজেদের অক্ষমতা ঢাকার জন্য আমরা অনেক সময় সুযোগ সুবিধার অভাবের দোহাই দিই। অবশ্য একথা ঠিক—জটিল বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি একান্ত দরকার। কিন্তু যে সব

উপকরণ আমাদের হাতে বর্তমান, সেগুলিও কি আমরা পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারি!

উপেন্দ্রনাথ প্রমাণ করেছেন প্রতিভা, সংকল্প ও সহিষ্ণুতা থাকলে নানা অসুবিধার মধ্যেও সার্থক কাজ করা যায়।

কালাজ্বরের উপর উপেন্দ্রনাথ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। Kala-azar : Its treatment (১৯১৭), A Treatise on Kala-azar (১৯২৮), Gleanings from My Researches (১৯৪০) গ্রন্থগুলি তাঁর গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য বহন করছে।

লিওনার্ড রজার্স-এর নাম ভারতের চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে নানা কারণে। প্রথমত গবেষণায় তিনি ছিলেন শীর্ষস্থানীয়; দ্বিতীয়ত, গবেষণার এক মহান পীঠস্থানের জনক তিনি। রজার্স লক্ষ্য করেছিলেন এদেশে এমন সব ব্যাধি আছে, যে-গুলি সম্বন্ধে গবেষণা এখানেই হওয়া দরকার। এই সব ব্যাধি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হওয়ার জন্য এদেশের চিকিৎসকদের যেতে হত ব্রিটেনে। রজার্স ভাবলেন শিক্ষার এবং গবেষণার জন্য কলকাতাই আদর্শ স্থান।

এই উদ্দেশ্যে রজার্স ১৯১০ সালে সরকারের কাছে একটি পরিকল্পনা দাখিল করেন। তাঁর এই প্রস্তাব প্রথম দিকে সরকারের অনুমোদন লাভ করেনি। কিন্তু রজার্স হাল ছাড়বার পাত্র নন। সরকারের সঙ্গে মনোমালিন্য দেখা দিল রজার্সের। অবস্থা এমন অবস্থায় পৌঁছল যে 'ইংলিশম্যান' কাগজে সংবাদ প্রকাশিত হল, রজার্স পদত্যাগ করবেন। এই সময়ে রজার্স কলকাতা মেডিকেল কলেজে প্যাথলজির অধ্যাপক ছিলেন এবং বৈজ্ঞানিক হিসাবে ইতিমধ্যে বিদগ্ধ মহলে সম্মানিত হয়েছেন। রজার্সের দৃঢ়তায় সরকার অবশেষে তাঁর পরিকল্পনা অনুমোদন করলেন। মেডিকেল কলেজের পাশে ট্রপিক্যাল স্কুলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হল ১৯১৪ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি।

রজার্স বহু প্রতিষ্ঠানের কাছে আবেদন করে চাঁদা আদায় করলেন। তখনকার একজন নামকরা চিকিৎসক ডাঃ কৈলাসচন্দ্র বসু প্রচুর চাঁদা আদায় করে রজার্সের কাজে সহায়তা করেন।

১৯২০ সালে ট্রপিক্যাল স্কুলের গবেষণাগারের কাজ শুরু হয় এবং ১৯২১ সালে স্কুলে ছাত্রভর্তি আরম্ভ হয়। এই স্কুল স্থাপন করে রজার্স যে দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তার প্রমাণ প্াওয়া যায় পরবর্তী সময়ে এখানকার ব্যাপক গবেষণায়। মেগাও থেকে শুরু করে জ্যোতিভূষণ চট্টোপাধ্যায় পর্যন্ত প্রত্যেক ডিরেক্টরই ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। শুধু ডিরেক্টররাই নন, প্রতিটি বিভাগে গবেষকরা নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কার করে বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানও সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁদের গবেষণায়। তাঁদের অনেকে গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। সেই সব গ্রন্থ এখনো গবেষকদের, শিক্ষকদের এবং শিক্ষাব্রতীদের অবশ্য পঠনীয়।

১৯২২ সালে আগত আমেরিকার এক চিকিৎসক ভারত ভ্রমণ করার পর বলেছিলেন, ভারতে তিনি তিনটি কীর্তিসৌধ দেখেছেন। সেই তিনটি হল আগ্রার তাজ, লক্ষ্ণৌ-এর রেসিডেন্সি এবং কলকাতার স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন। একথা অতি সত্য সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ট্রপিক্যাল স্কুলের প্রথম দিকের ডিরেক্টরদের নাম ও কার্যকাল নিচে দেওয়া হল :

মেগাও (J. W. D. Megaw) ১৯২১—১৯২৮

একটন (H. W. Acton) ১৯২৮—১৯৩৩

নোল্‌স্ (R. Knowles) ১৯৩৩—১৯৩৫

চোপরা (R. N. Chopra) ১৯৩৫—১৯৪১

নেপিয়ার (L. E. Napier) ১৯৪১—১৯৪৩

দাসগুপ্ত (B. M. Das Gupta) ১৯৪৩—১৯৪৫

এর প্রথম ভারতীয় ডিরেক্টর হলেন স্যার রামনাথ চোপরা, সি. আই. ই, এম. এ, এম. ডি, এস্.-সি. ডি., এফ. আর. সি. পি., এফ. এন. এ.।

ডাঃ চোপরাকে আধুনিক ভারতের ভেষজ বিজ্ঞানের জনক বলা যেতে পারে। গবেষণা ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। তিনি যে শুধু নিজেই কর্মজীবনের বেশির ভাগ সময় গবেষণায় কাটিয়েছিলেন তাই নয়, তৈরি করেছিলেন একটি গবেষক গোষ্ঠী।

আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানে ইয়োরোপ আমেরিকার এতই প্রভাব যে এই প্রভাব অতিক্রম করে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা সেযুগে বেশি ভারতীয়ের ছিল না। অথচ ভারতে প্রচলিত বহু ওষুধের গুণ সর্বজনবিদিত। এই সব ওষুধ ব্যবহৃত হয়ে আসছে যুগ যুগ ধরে। এগুলির মধ্যে এমন কি উপাদান রয়েছে, যার ফলে রোগ নিরাময় হয়, সে বিষয়ে প্রথম দৃষ্টি দেন ডাঃ কানাইলাল দে। কিন্তু ডাঃ দে ওষুধের যথাযথ রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে ওষুধের গুণাগুণ বিচার করতে পারেন নি। ডাঃ চোপরা ডাঃ দে-র পথ অনুসরণ করে দেশীয় ওষুধের উপর গবেষণা করে, রাসায়নিক বিশ্লেষণ করেন এবং রোগীর উপর সে সব ওষুধ প্রয়োগ করে বহু রহস্যের আবরণ উন্মোচন করেন। সর্পগন্ধার (Rauwolfia Serpentina) ব্যবহার ভারতবর্ষে বহুদিন থেকে প্রচলিত। উন্মাদ রোগে স্নায়ু প্রশমিত করার জন্য এবং রক্তচাপ হ্রাস করার জন্য সর্পগন্ধা ব্যবহৃত হত। ডাঃ চোপরা এর উপর গবেষণা করে এর রাসায়নিক বিশ্লেষণ করেন এবং রোগীর উপর এর ক্রিয়া পরীক্ষা করেন (১৯৩৩—১৯৪৩)। কুরচির বাকল আমাশয়ে ব্যবহৃত হয়। ডাঃ চোপরা এরও রাসায়নিক বিশ্লেষণ করেন। এমনি করে এদেশের বহু গাছগাছড়ার রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে এদের উপকারিতা বিজ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন।

ডাঃ চোপরা প্রায় পাঁচশো গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখেছেন। ১৯২৫ সাল থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ যে সময়টা তাঁর গবেষণাজীবনের শ্রেষ্ঠ সময়, Indian Medical Gazette, Indian Journal of Medical Research প্রভৃতি মেডিকেল জার্নালের প্রায় প্রতিটি সংখ্যায় ডাঃ চোপরার প্রবন্ধ থাকত। এসব প্রবন্ধ ছাড়া গ্রন্থও লিখেছেন, যেমন—*Indigenous Drugs of India, Medicinal and*

Poisonous Plants of India, Handbook of Tropical Therapeutics, Glossary of Indian Medicinal Plants, Drug Addiction in India এইসব গ্রন্থ আমাদের চিরকালের সম্পদ।

রামনাথ চোপরার জন্ম ১৮৮২ সালে কাশ্মীরের শ্রীনগরে। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েট হওয়ার পর ১৯০২ সালে চলে যান ক্যাম্ব্রিজে। ইংল্যাণ্ডে কাটান বারো বৎসর। এল. আর. সি. পি; এম. আর. সি. এস., এম. বি., এম. ডি. এবং এস্.-সি. ডি. প্রভৃতি উপাধি লাভ করেন। লণ্ডনের বার্থেলেমিউ হাসপাতালে কাজ করার সময় আই. এম. এস. পরীক্ষা দেন এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেন আই. এম. এস.-এ যোগ দিয়ে প্রথমে যান আফ্রিকায়, পরে আফগানিস্থানে।

১৯২১ সালে তিনি কলকাতার ট্রপিক্যাল স্কুলে এবং মেডিকেল কলেজে ভেষজ বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৩৫ সালে এই স্কুলেরই ডিরেক্টর হন। ১৯৪১ সালে অবসর গ্রহণ করেন এবং চলে যান কাশ্মীরে নিজের বাড়িতে। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি অবসর জীবন কাটানো সম্ভব হল না, ডাক এল কাশ্মীর সরকারের কাছ থেকে। নিযুক্ত হলেন সে রাজ্যের 'ডিরেক্টর অব হেলথ সার্ভিসেস অ্যাণ্ড ড্রাগ রিসার্চ-এর পদে। এখান থেকে তিনি অবসর নেন ১৯৬০ সালে। ১৯৭৩ সালের ১৩ই জুন ৯১ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

ট্রপিক্যাল স্কুল থেকে ডিপ্লোমা ইন ট্রপিক্যাল মেডিসিন (ডি. টি. এম.) এবং ডিপ্লোমা ইন পাব্লিক হেল্‌থ (ডি. পি. এইচ.) স্নাতকোত্তর উপাধি দেওয়া হত। ১৯৩২ সালে ট্রপিক্যাল স্কুলের উল্টোদিকে 'রক্‌-ফেলার ফাউণ্ডেশনে'র পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপিত হয় 'অল ইণ্ডিয়া ইনস্টি-টিউট অব হাইজিন অ্যাণ্ড পাবলিক হেল্‌থ।' তখন ডি. পি. এইচ. পড়ান আরম্ভ হয় এই ইনস্টিটিউটে। ট্রপিক্যাল স্কুলের মত এখানেও এক-দল গবেষকগোষ্ঠী নিষ্ঠা সহকারে গবেষণা করতে শুরু করেন। এখানকার

গবেষণার বিষয়বস্তু জনস্বাস্থ্য, সেজন্য চিকিৎসা-বিজ্ঞান ছাড়া এখানে রয়েছে 'সেনিটারি ইন্‌জিনিয়ারিং'-এর সম্পূর্ণ বিভাগ।

এই ইনস্টিটিউটের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ছিলেন ডাঃ রামবিহারী লাল। ডাঃ লাল এপিডেমিওলজি (Epidemiology) বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। সে সময় পূর্ব ও মধ্য ভারতে শোথ রোগ মহামারি আকারে দেখা দিত। এই রোগ 'এপিডেমিক ড্রপসি' নামে পরিচিত। এতে পা ফুলে যায়, হৃদযন্ত্র আক্রান্ত হয়।

ডাঃ লাল এই রোগের কারণ অনুসন্ধান করতে শুরু করলেন। তখন এই রোগের কারণ হিসাবে তিনটি তত্ত্ব প্রচলিত ছিল। এক, জীবাণু দ্বারা সংক্রামিত ; দুই, পোকায়ধরা চালের ভাত খাওয়া ; তিন, সরষের তেল খাওয়া। ডাঃ লাল অনুসন্ধান চালালেন জনসাধারণের মধ্যে। তাঁর প্রথম অনুসন্ধান পরিসংখ্যানের উপর ভিত্তি করে। তিনি দেখালেন, সরষের তেল যারা খায়, এ রোগ শুধু তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অনেক জায়গা থেকে সরষের তেল যোগাড় করে পরীক্ষা করা হল। দেখা গেল, তেলে সরষে ছাড়াও রয়েছে শিয়ালকাঁটার বীজ থেকে নিষ্কাষিত রস। শিয়ালকাঁটার বীজে আছে বিষাক্ত উপক্ষার (alkaloid) সেঙ্গুইনারিণ। সোথ রোগের জন্য সেঙ্গুইনারিণ দায়ী। সরষের ক্ষেতে শিয়ালকাঁটা জন্মায়। সরষে তোলার সময় শিয়ালকাঁটার বীজও একসঙ্গে তোলা হয়—কখনো অনিচ্ছায়, কখনো বা ইচ্ছায়। ডাঃ লালের আবিষ্কারের ফলস্বরূপ এপিডেমিক ড্রপসিরোগ অনেক পরিমাণে হ্রাস পায়।

ডাঃ লাল আরো একটি কাজ করেন, যা এদেশে তাঁর আগে অন্য কেউ করেন নি। আমাদের দেশে কতজন লোক কী কী রোগে ভোগে জানার উপায় নেই, আগে আরো ছিল না। উন্নত দেশগুলিতে কয়েকটি রোগ স্বাস্থ্যদপ্তরে জানানো চিকিৎসকদের পক্ষে বাধ্যতামূলক। আমাদের দেশেও এই নিয়ম কাগজেপত্রে বলবৎ। কিন্তু চিকিৎসকরা প্রায়ই এ ব্যাপারে উদাসীন। তার উপর বহু পদ্ধতির চিকিৎসা থাকায় রোগনির্ণয়ে পার্থক্য ঘটে। বসন্তের মতো সংক্রামক ব্যাধিও স্বাস্থ্যদপ্তরকে জানানো হয় না। যদি বসন্ত হওয়ামাত্র স্বাস্থ্যদপ্তরকে জানানো হয়, তবে তৎক্ষণাৎ

প্রতিষেধক-ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় এবং রোগ বিস্তার নিবারণ করা যায়। আমাদের দেশে রোগের ব্যাপকতা জানার একটিমাত্র উপায় হাসপাতালে রোগীর হাজিরা খাতা। কিন্তু হাসপাতালে আর কয়জন রোগী আসে। এই সব অসুবিধার জন্য ডাঃ লাল ও তাঁর সহকারী ডাঃ শ্রীশচন্দ্র শীল হুগলি জেলার সিঙ্গুর থানায় সমীক্ষা চালান। এই রকম সমীক্ষাকে বলা হয় General Health Survey। ১৯৪৪ সালে সিঙ্গুর সার্ভের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এই রিপোর্ট দেশেবিদেশে সমাদৃত হয়। ডাঃ শীল ডাঃ লালের পরে অধ্যাপক হয়েছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে কোটস পদক অর্পণ করে ১৯৫২ সালে। ডাঃ শীলের পর অধ্যাপক হন ডাঃ লালমোহন ভট্টাচার্য। শরীরে ম্যালেরিয়ার জীবাণু আছে কিনা জানার জন্য রক্ত পরীক্ষা করা হয়। ডাঃ ভট্টাচার্য দিল্লীতে কাজ করার সময়ে একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন, যা দিয়ে অতি অল্প সময়ে রক্তের স্লাই স্টেইন(Stain)করা যায়। এই পদ্ধতি যশোবন্ত সিংহ ভট্টাচার্য—জে. এস. বি. (স্টেইন) ভারতে বহু ব্যবহৃত।

ডাঃ চোপরা ও ডাঃ লাল বাঙালী নন, কিন্তু এঁদের কর্মক্ষেত্র কলকাতা। তাছাড়া এঁরা বাঙালী চিকিৎসকদের গবেষণার কাজে উৎসাহিত করেছিলেন এবং তৈরি করেছিলেন একনিষ্ঠ গবেষক-গোষ্ঠী।

ডাঃ চোপরার পর ট্রপিক্যাল স্কুলের ডিরেক্টর হলেন নেপিয়ার। নেপিয়ারের পর ১৯৪৩ সালে বিরাজমোহন দাশগুপ্ত ডিরেক্টর নিযুক্ত হলেন। ডাঃ দাশগুপ্তর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ডিগ্রি ছিল না, ছিল ঢাকা মেডিকেল স্কুলের ডিপ্লোমা। তাঁর আগে যাঁরা ডিরেক্টর হয়েছিলেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন আই. এম. এস. অফিসার। ডাঃ চোপরাও আই. এম. এস. ছিলেন। ডাঃ দাশগুপ্তর পক্ষে ডিরেক্টর হওয়া বিস্ময়কর হলেও তা কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। ডিরেক্টর হওয়ার আগে ছয় বছর এই স্কুলেরই অধ্যাপক হিসাবে কাজ করেছিলেন।

নোল্‌সের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন তিনি। বস্তুত কর্মক্ষেত্রে উন্নতি, গবেষণায় খ্যাতি প্রভৃতির পিছনে নোল্‌সের অকৃপণ সহায়তা এবং প্রেরণা ছিল। নোল্‌স গবেষণার প্রতি ডাঃ দাশগুপ্তর অকুণ্ঠ নিষ্ঠা দেখে এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে যখন তিনি মেডিকেল প্রোটোজুলজি সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করেন, তখন সেই গ্রন্থ উৎসর্গ করেন দাশগুপ্তর নামে। বিরাজমোহন প্রোটোজুলজি অর্থাৎ এককোষ প্রাণীবিদ্যা এবং এই সব প্রাণীজনিত রোগ নিয়ে গবেষণা করতেন এবং তাঁর মৌলিক গবেষণা চিকিৎসা-বিজ্ঞানে স্বীকৃত। তাঁর বিশেষ উল্লেখযোগ্য গবেষণার বিষয় ম্যালেরিয়া এবং লেপ্টোস্পাইরোসিস (Leptospirosis)। ভারতবর্ষে তিনিই সর্ব-প্রথম শেষোক্ত রোগের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন এবং জীবাণুর বিভিন্ন টাইপ বা জাতি নির্ণয় করেন। খনির শ্রমিকদের মধ্যে এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি। পশু থেকে মানুষের শরীরে ম্যালেরিয়ার জীবাণু প্রবেশ করতে পারে—এবিষয়ে তাঁর মৌলিক গবেষণা রয়েছে।

ডাঃ দাশগুপ্তর জন্ম ঢাকায় ১৮৮৭ সনে। পাঠ্যজীবনে উল্লেখ করার মতো কিছু নেই। কলকাতার সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে এবং পরে ঢাকা মেডিকেল স্কুলে তিনি পড়াশুনা করেন। সরকারী কাজে যোগ দেন অতি সামান্য সাব-অ্যাসিস্টাণ্ট সার্জন পদে। ১৯১৮ সালে তিনি যোগ দেন শিলং-এর পাস্তুর ইনস্টিটিউটে। এখানে যোগ দেবার পর থেকে গবেষণার প্রতি তাঁর সুপ্ত স্পৃহা জাগরিত হয় এবং তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। ডাঃ দাশগুপ্তর সৌভাগ্য যে সে সময় পাস্তুর ইনস্টিটিউটে ছিলেন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক নোল্‌স। নোল্‌সের প্রতিটি গবেষণায় তিনি ছিলেন সহায়ক। লেবরেটরির কাজে ডাঃ দাশগুপ্তর প্রণালী ও নিপুণতা দেখে কর্ণেল নোল্‌স বিশেষ প্রীত হন। এরপর নোল্‌স আসেন কলকাতার ট্রপিক্যাল স্কুলে প্রোটোজুলজির অধ্যাপক হিসাবে। ডাঃ দাশগুপ্তকে নিয়ে এলেন সহায়ক অধ্যাপকরূপে। বিরাজমোহন নিশ্চয়ই অতটা আশা করেননি। এই কাজে তিনি যোগ দেন ১৯২১ সালে। তিনি যে একাজের যোগ্য, তার যথেষ্ট প্রমাণ তিনি দিয়েছিলেন। পরিশ্রম এবং নিষ্ঠা এই দুটি ছিল

তাঁর প্রধান সম্বল। ১৯৩৪ সনে রকফেলার ফাউণ্ডেশন বৃত্তি নিয়ে তিনি আমেরিকা ও ইংলণ্ডে যান।

১৯৩৬ সনে কর্ণেল নোল্‌সের মৃত্যু হলে শিষ্য ও সহকারী ডাঃ দাশগুপ্ত প্রোটোজুলজির অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হলেন। ১৯৪২ সনে নেপিয়ার ডিরেক্টর-পদ থেকে অবসর গ্রহণ করলে ডাঃ দাশগুপ্ত ডিরেক্টর হলেন। ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত তিনি এই পদে আসীন ছিলেন। যুদ্ধের বছর-গুলিতে স্কুলের কাজ স্বাভাবিকভাবে পরিচালনা করা খুব সহজ ছিল না। তবু কাজে নিষ্ঠা ছিল বলেই ডাঃ দাশগুপ্তর পক্ষে তা সম্ভব হয়েছিল। ট্রপিক্যাল স্কুল থেকে অবসর গ্রহণ করার সময় 'লণ্ডন স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন'-এ যোগ দেওয়ার জন্য আহ্বান আসে, কিন্তু স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ার দরুন তাঁর পক্ষে এই কাজে যোগ দেওয়া সম্ভব হয়নি।

ডাঃ দাশগুপ্ত গবেষণামূলক অসংখ্য প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। 'ব্রিটিশ এনসাইক্লোপিডিয়া অব মেডিক্যাল প্র্যাক্‌টিস' গ্রন্থে 'র‍্যাট বাইট ফিবর' (Rat-bite fever) অধ্যায়টি তিনি রচনা করেন। তাঁর গুরু নোল্‌স মেডিকেল প্রোটোজুলজির একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন। পরে ডাঃ দাশগুপ্ত এই বইটি সম্পাদনা করেন। মৌলিক গবেষণার জন্য তিনি 'মিণ্টো পদক' লাভ করেন এবং সরকার তাঁকে 'রায় বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করে।

১৯৪৬ সালের ২৫শে মে ডাঃ দাশগুপ্তর মৃত্যু হয়। তাঁর জীবনে তিনি প্রমাণ করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-পাশের বড় ছাপ থাকাই সব নয়, নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার জোরে উল্লেখযোগ্য কাজ করা অনেকের পক্ষেই সম্ভব। তাঁর চার পুত্রের মধ্যে একজনও চিকিৎসক হননি।

১৯৭২ সালের ২রা মার্চ বৃহস্পতিবার, দোলযাত্রার দিন। সকাল বেলায় শোনা গেল ট্রপিক্যাল স্কুলের ডিরেক্টর ডাঃ জ্যোতিভূষণ চট্টোপাধ্যায় আর বেঁচে নেই। কলকাতার চিকিৎসক-সমাজ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন, শোকে বিহ্বল হলেন। অনেকে বিশ্বাসই করতে পারছিলেন

না এই ঘটনা। কারণ, আগের দিনও তিনি সুস্থ ছিলেন এবং যথারীতি কাজ করেছেন। স্নিগ্ধ-স্বভাব, বন্ধুবৎসল ডাঃ চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে চিকিৎসক সমাজ আত্মীয়বিয়োগব্যথা অনুভব করলেন। তিনি ছিলেন বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক, কিন্তু চিকিৎসকগণ তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন ও ভালবাসতেন শুধু বৈজ্ঞানিক হিসাবে নয়, তাঁর অমায়িক স্বভাবের জন্য।

ডাঃ চট্টোপাধ্যায় 'রক্ত' সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তাঁর গবেষণা শুধু ভারতেই নয়, ভারতের বাইরেও স্বীকৃত। পুষ্টিজনিত ও বংশজাত কারণে যে রক্তাল্পতা দেখা যায়, ডাঃ চট্টোপাধ্যায় এর উপর ব্যাপক গবেষণা করেন। আমাদের দেশে অপুষ্টিজনিত রোগের প্রকোপ অত্যন্ত বেশি। প্রতি বছর প্রোটিন-এর অভাবে অসংখ্য ছেলেমেয়ের মৃত্যু হয় এবং যারা বাঁচে, তাদের শরীর ও মন স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করে না। প্রোটিন আমাদের দেশে ছেলেমেয়েদের জন্য সবচেয়ে বড় সমস্যা। শুধু যে দুধ, ডিম, মাছমাংসের মধ্যেই প্রোটিন আছে, তাই নয়, ডালের মধ্যেও প্রচুর প্রোটিন রয়েছে। সোয়াবিনের মধ্যে প্রোটিন খুব বেশি। প্রোটিন-অপুষ্টির পরেই সমস্যা হল ভিটামিন্ 'এ'-র অভাব এবং রক্তাল্পতা (Anaemia)। খাদ্যে ভিটামিন কম থাকা বা একেবারেই না থাকার জন্য বহু ছেলেমেয়ে অন্ধ হয়ে যায়। দুধ, ঘি, ডিম, মাছ এগুলির মধ্যে ভিটামিন 'এ' প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। গাজর এবং শাকসব্জি খেলেও ভিটামিন 'এ'-র প্রয়োজন মেটে। খাদ্য নিয়ে বর্তমানে প্রচুর গবেষণা হচ্ছে হায়দ্রাবাদের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউট্রিসন-এ (National Institute of Nutrition)। রক্তাল্পতা নানা কারণে হতে পারে। যদি খাদ্যে লোহা কম থাকে, যদি লোহা শরীরে হজম না হয়, রক্ত শরীর থেকে যদি অনবরত বের হয়ে যায়, লোহার প্রয়োজনীয়তা যদি বেড়ে যায়, তাহলে রক্তাল্পতা দেখা দেয়। এসব ছাড়া রক্তাল্পতার আরো অনেক কারণ রয়েছে। একটি হল বংশগত কারণ। আফ্রিকার নিগ্রোদের মধ্যে দেখা যায় সিক্ল সেল এনিমিয়া (sickle cell anaemia)। ডাঃ চট্টোপাধ্যায় দেখালেন পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে

হিমগ্লোবিন-ই-থেলেসিমিয়া (Haemoglobin-E-Thalassemia)। এটি একজাতীয় অস্বাভাবিক হিমগ্লোবিন রোগ। এর কোন চিকিৎসা নেই এবং সাধারণত অল্প বয়সেই রোগীর মৃত্যু হয়।

ডাঃ চট্টোপাধ্যায়কে অনেকবার বলতে শুনেছি আমাদের দেশে যে লৌহপাত্রে খাদ্য প্রস্তুত করার রীতি ছিল, তা একদিক থেকে খুব ভাল কারণ পাত্র থেকে একটু একটু লৌহ খাদ্যের সঙ্গে মিশ্রিত হত এবং তাতে লৌহের প্রয়োজন অনেকাংশে মিটত।

জ্যোতিভূষণের জন্ম ১৯১৯ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি কলকাতায়। যশোরের 'সম্মিলনী ইনস্টিটিউশন' থেকে তিনি ১৯৩৪ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এতে তিনি বৃত্তি লাভ করেন। আই. এস-সি. পড়েন স্কটিস্ চার্চ কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় নবম স্থান অধিকার করেন। এরপর ভর্তি হন কলকাতা মেডিকেল কলেজে। এম. বি. পাশ করেন ১৯৪২ সালে এবং মেডিসিনে প্রথম হন। গবেষণা দিয়েই তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। ট্রপিক্যাল স্কুলের হিমাটোলজি (Haematology) বিভাগে কাজ নেন ১৯৪৪ সালে, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিকেল রিসার্চের অধীনে রিসার্চ-অফিসার হিসাবে। এখানে কাজ করতে করতে তিনি ১৯৪৯ সালে এম. ডি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরের বছর রকফেলার বৃত্তি নিয়ে যান বস্টনের 'নিউ ইংল্যাণ্ড মেডিকেল সেণ্টার'-এ রক্ত-বিষয়ে গবেষণার জন্য। সেখানে বিখ্যাত অধ্যাপক ডেমশেকের (Prof. Damshek) তত্ত্বাবধানে কাজ করেন এবং ফিরে এসে ট্রপিক্যাল স্কুলের রক্ত-বিষয়ক বিভাগের অফিসার-ইন-চার্জ পদে যোগ দেন। ১৯৫৬ সালে এই বিভাগের অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত হন। ডাঃ রবীন্দ্রনাথ চৌধুরীর অবসর গ্রহণের পর ১৯৬৬ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি ডাঃ চট্টোপাধ্যায় ডিরেক্টর-পদ লাভ করেন।

রক্ত-বিষয়ে ডাঃ চট্টোপাধ্যায়ের মতো এত মৌলিক কাজ আর কোনো ভারতীয়ের নেই। সেজন্য ভারতের রক্ত-বিষয়ক প্রায় প্রতিটি বিশেষজ্ঞ-কমিটির সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব

মেডিকেল রিসার্চের হিমাটোলজির বিশেষজ্ঞ-কমিটির তিনি ছিলেন সভাপতি। বিশ্বস্বাস্থ্যসংস্থার রক্ত-বিষয়ক বিশেষজ্ঞ-কমিটিরও সদস্য-ছিলেন। এসব ছাড়া আন্তর্জাতিক রক্ত ট্রান্সফিউশন সোসাইটির, আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অব ফিজিসিয়ান এবং আরো অনেক সংস্থার সদস্য ছিলেন। ১৯৬০ সালে টোকিওতে, ১৯৬২ সালে ফ্রান্সে, ১৯৬৪ সালে স্টকহোমে, ১৯৬৬ সালে সিডনিতে, ১৯৬৮ সালে নিউইয়র্কে, ১৯৭১ সালে সুইজারল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক হিমাটোলজি সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছেন তিনি। এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে ডাঃ চট্টোপাধ্যায় একমাত্র ভারতেই অগ্রণী গবেষক হিসেবে গণ্য ছিলেন না, সারা পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক-সমাজে তাঁর স্থান ছিল অনেক উঁচুতে।

দেশে ডাঃ চট্টোপাধ্যায়ের সম্মানের পরিমাণও অল্প নয়। তিনি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউটের ফেলো মনোনীত হন। গবেষণার জন্য ১৯৫৮ সালে পান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোট্‌স পদক, ১৯৬৪ সালে পান এশিয়াটিক সোসাইটির বাক্‌লে পদক এবং ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিকেল রিসার্চের বাসন্তীদেবী আমীরচাঁদ পুরস্কার, ১৯৬৬ সালে পান মিণ্টো পদক। কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চের ১৯৬৬-৬৭ সালের 'শান্তিস্বরূপ ভাটনগর পুরস্কার' দেওয়া হয় ডাঃ চট্টোপাধ্যায়কে। ১৯৬৫ সালে অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের চিকিৎসা-বিজ্ঞান শাখায় সভাপতিত্ব করেন তিনি।

বহু মৌলিক প্রবন্ধ লিখেছেন ডাঃ চট্টোপাধ্যায়। দেশের ও বিদেশের বহু নামকরা জার্নালে তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর তিনশোর অধিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ আমাদের দেশের অমূল্য সম্পদ। যখন তিনি দীপ্তিতে প্রোজ্জ্বল, যখন তাঁর প্রতিভা স্বীকৃত, সেই সময় পৃথিবী থেকে তিনি বিদায় নিলেন। মাত্র ৫৩ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তাঁর বিলাসিতাহীন অনাড়ম্বর জীবনযাপন সকলের বিস্ময় উদ্রেক করত। ট্রপিক্যাল স্কুল এবং গবেষণা ছিল তাঁর একমাত্র ধ্যান। প্রাইভেট প্র্যাকটিসের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কখনো

তা করতেন না। অর্থের প্রতি তাঁর কোন লালসা ছিল না। ডাঃ চট্টোপাধ্যায়ের জীবন গবেষকদের কাছে চিরকাল আদর্শ হয়ে থাকবে।

উনিশ শতকে বাঙালী চিকিৎসকদের যে মহান ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল, ডাঃ মনীন্দ্রনাথ দে বোধ হয় তার শেষ প্রতিভূ। অশীতিপর বৃদ্ধ বললে যে অবস্থা চোখের সামনে ভেসে ওঠে, ডাঃ মনি দে-কে দেখে সে অবস্থার সঙ্গে কোনো মিলই খুঁজে পাওয়া যেত না। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে পর্যন্ত নিয়মিত চেম্বারে বসতেন, রোগী দেখতেন, কখনো কখনো বাইরেও বেরুতেন রোগী দেখতে। এদেশে এই বয়সের অন্য কেউ সক্রিয়ভাবে চিকিৎসা ব্যবসা করতেন বলে জানা নেই।

বর্তমানে যত প্রবীণ চিকিৎসক আছেন, তাঁদের অনেকেই ডাঃ দে-র ছাত্র। তাঁদের কাছে ডাঃ দে সম্বন্ধে জানতে চাইলে, তাঁরা ভাবাবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন। তাঁরা বলেন, 'ভাল শিক্ষক মেডিকেল কলেজে অনেকে ছিলেন, কিন্তু মাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে কারুর তুলনা হয় না। তাঁর পড়াবার এমনি ধরন ছিল যে প্রতিটি কথা মনে গেঁথে থাকত।' সত্তর বছর বয়স্ক একজন চিকিৎসক বললেন, 'মাস্টার মশাই কয়েকটি রোগ সম্বন্ধে আমাদের পড়িয়েছিলেন। তাঁর প্রতিটি কথা, প্রতিটি উপমা এখনো মনে আছে। যেমন ক্লাশে, তেমনি ওয়ার্ডের ক্লিনিক্‌স্‌-এ।' ডাঃ দে খুব কম দিনই রোল কল করতেন। তার কোনো প্রয়োজনও ছিল না, কারণ ছাত্ররা ডাঃ দে-র ক্লাশ ফাঁকি দেবে, একথা ভাবাই যেত না। বরং ক্লাশে এতই ভিড় হত যে অনেকে বসার জায়গা পেত না। হয়ত ক্লাশ নেবেন তৃতীয় বর্ষের ছাত্রদের জন্য, দেখা গেল চতুর্থ-পঞ্চম বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীরা এসেও হাজির। মাস্টার মশাই বলতে মেডিকেল কলেজে একজনকেই বোঝাত, তিনি হলেন ডাঃ মনি দে। এখনো পুরনো ছাত্ররা তাঁকে 'মাস্টার মশাই' বলে উল্লেখ করেন।

ডাঃ দে প্রথম ভারতীয়, যিনি মেডিকেল কলেজের প্যাথলজি বিভাগের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই প্যাথলজি বিভাগেই

কাজ করেছিলেন ডি. ডি. ক্যানিংহ্যাম, লিওনার্ড রজার্স-এর মতো বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ। ডাঃ দে গবেষণার সে-ধারা অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। তাঁর বহু গবেষণার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল প্লীহার উপর গবেষণা। ডাঃ দে লক্ষ্য করেছিলেন অনেক রোগীর প্লীহা বিরাট বড়, অথচ ম্যালেরিয়া বা কালাজ্বরের কোনো ইতিহাস নেই। এরা মাঝে মাঝে জ্বরে ভোগে, শরীর খুব কৃশ হয়ে যায়। ম্যালেরিয়া বা কালাজ্বরের চিকিৎসায় কোনো ফল হয় না। ডাঃ দে-র মতে এটি এক ধরনের ব্যাধি, যদিও কারণ অজ্ঞাত। তাঁর এই মত যদিও সকলে গ্রহণ করেন নি, তবু এই পর্যবেক্ষণের মূল্য অনস্বীকার্য।

মনীন্দ্রনাথ দে-র জন্ম ১৮৯৩ সালে হাওড়া জেলার শিবানন্দবাটি গ্রামে। পিতা মহাদেবচন্দ্র দে। প্রথম পড়াশুনা গ্রামের গুরুমশায়ের পাঠশালায়। পরে পড়তে আসেন হাওড়া জিলা স্কুলে। ১৯১০ সালে তিনি ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন প্রথম বিভাগে। এই বছরেই প্রথম ম্যাটিকুলেশন পরীক্ষা চালু হয়। এর পরে তিনি সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে আই. এস-সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ভর্তি হন কলকাতা মেডিকেল কলেজে। মেডিকেল কলেজে তাঁর ছাত্রজীবন কৃতিত্বে উজ্জ্বল। প্রায় প্রতিটি বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। কলেজের প্রায় সব পদক ও পুরস্কার লাভ করেছেন। ১৯১৮ সালে মেডিসিন ও প্যাথলজিতে অনার্স নিয়ে তিনি এম. বি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। মেডিসিনের অধ্যাপক জে. টি. কেলভার্টের অধীনে হাউস-ফিজিসিয়ন হিসাবে তিনি কাজ করেন। পরে যান ইংল্যাণ্ডে। কয়েক মাসের মধ্যে তিনি লণ্ডনের এম. আর. সি. পি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন।

দেশে ফিরে এসে তিনি যোগ দিলেন প্রাদেশিক মেডিকেল সার্ভিসেস্-এ এবং মেডিকেল কলেজের প্যাথলজি বিভাগে ডিমনস্ট্রেটর নিযুক্ত হলেন। ১৯৩৯ সালের আগে আবাসিক চিকিৎসক (Resident Physician) এবং আবাসিক সার্জন পদ দুটি আই. এম. এস. অফিসারদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। সরকার সিদ্ধান্ত নেন যে প্রাদেশিক মেডিকেল সার্ভিসেস্-এর চিকিৎসকদের এই পদ দুটিতে নিয়োগ করা

হবে। ডাঃ দে আবাসিক চিকিৎসক-পদে নিযুক্ত হলেন। ১৯৩২ সালে নিযুক্ত হলেন প্যাথলজির অধ্যাপক-পদে। তাঁর আগে অধ্যাপক ছিলেন মেজর জি. শেঙ্কস্ (Major G. Shanks)। এই সময় বাংলা দেশে শোথরোগের (Epidemic Dropsy) খুব প্রাদুর্ভাব ছিল। ট্রপিক্যাল স্কুল ও হাইজিন ইনস্টিটিউটের গবেষকগণ রোগের কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করছিলেন। ডাঃ দে দেখালেন, এই রোগে ধমনীর কি কি পরিবর্তন হয়। তাঁর এই কাজের ফলে শরীর ফুলে যাওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করা সম্ভব হল। তাঁর মৌলিক প্রবন্ধের সংখ্যা একশ পঁচিশটি।

ডাঃ দে ১৯৩৭ সালে ক্লিনিক্যাল মেডিসিনের অধ্যাপক এবং দ্বিতীয় চিকিৎসক নিযুক্ত হন। ১৯৪১ সালে নিযুক্ত হন মেডিসিনের অধ্যাপক ও প্রথম চিকিৎসক। সরকারী কর্ম থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করেন ১৯৪৯ সালে। সে সময় লিবারপুল ইউনিভার্সিটিতে ট্রপিক্যাল মেডিসিনের অধ্যাপক পদ গ্রহণ করার আহ্বান আসে তাঁর কাছে, কিন্তু ডাঃ দে তা গ্রহণ করেন নি। সরকারী কাজ থেকে অবসর নিলেও চিকিৎসা ব্যবসা থেকে অবসর নিলেন না। বরং এতে আরো বেশি করে মন দিলেন।

ডাঃ দে জীবাণুবিদ্যা বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেন ডাঃ কালিধন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৩৫ সালে। গ্রন্থের উপক্রমণিকায় ডাঃ নোল্স লিখেছেন—'গত পনের বছর ধরে ডাঃ দে এবং তাঁর কাজের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ হয়েছে। তাঁর মত বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি, দক্ষ কর্মী এবং যোগ্য শিক্ষক অতি বিরল। শিক্ষকতার জন্য তিনি ছাত্রদের অতি প্রিয়।'

ডাঃ দে-র কর্মজীবনকে তিনটি সুনির্দিষ্ট অধ্যায়ে ভাগ করা যায়: গবেষণা ও শিক্ষকতা; চিকিৎসা ও শিক্ষকতা; চিকিৎসা। যতদিন প্যাথলজির অধ্যাপক ছিলেন, ততদিন তিনি একনিষ্ঠ গবেষক। রাত সাতটা-আটটা পর্যন্ত একা একা লেবরেটরিতে কাজ করতেন। গবেষণার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানিত করে 'কোট্স্ পদক' দিয়ে।

যেদিন প্যাথলজি থেকে মেডিসিনে চলে এলেন, সেদিন থেকে শুরু

হল দ্বিতীয় অধ্যায়। এখন শুধু রোগী দেখা আর চিকিৎসা করা, দিনরাত্রির কাজ। গবেষক মনি দে এখন সম্পূর্ণ অন্তর্হিত। প্যাথলজিতে থাকার সময় মাসের নির্দিষ্ট বেতনই ছিল সম্বল। কিন্তু মেডিসিনের অধ্যাপক হয়ে দেখলেন টাকার ছড়াছড়ি, যা কোনো গবেষকের ভাগ্যে কোনদিন জোটে না। শিক্ষকতায় এখনো আগের মতই যশস্বী।

অবসর গ্রহণের পর শিক্ষকতার সুযোগ আর রইল না, রইল শুধু চিকিৎসা। সারাজীবন গবেষণার পর অনেক চিকিৎসককে অনুশোচনা করতে শোনা যায়, 'গবেষণায় থেকে জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল। তার চেয়ে রোগীর চিকিৎসা করলে টাকাও আসত, নামও হত।' ডাঃ দে-কে কোনদিন মনস্তাপ করতে হয় নি।

ডাঃ দে চিকিৎসা ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন, প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে। ১৯৭৪ সালের ৩০শে আগস্ট তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর কয়েক মাস আগে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। স্বল্পভাষী মাস্টার মশাই অনেকক্ষণ আমার সঙ্গে কথা বলেছিলেন। ইচ্ছা ছিল একটি বই তাঁর হাতে দেব। মাস্টার মশাইয়ের বয়সের কথাটা একবারও মনে হয় নি। তাঁর দুই পুত্র ও পাঁচ কন্যা। এক জামাতা ডাঃ শম্ভুনাথ দে, লণ্ডনের ডি. এস-সি। তিনি মেডিকেল কলেজে প্যাথলজির অধ্যাপক ছিলেন। কলেরার উপর তাঁর গবেষণা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর গবেষণার সূত্র ধরে কলেরার নতুন রকমের টিকা প্রস্তুত করার চেষ্টা হচ্ছে।

ট্রপিক্যাল স্কুলের, বিশেষ করে ভেষজ-বিজ্ঞানের গবেষণায় স্যার রামনাথ চোপরার অবদানের কথা আগেই বলা হয়েছে। রামনাথ চোপরার একজন যোগ্য শিষ্য ডাঃ বিষ্ণুপদ মুখোপাধ্যায়। কর্মজীবনের প্রথম দিকে চোপরার সহকারী হিসাবে তাঁর সকল গবেষণার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ডাঃ মুখোপাধ্যায়। দেশীয় ওষুধের গুণাগুণ বিশ্লেষণ করে ডাঃ চোপরা আধুনিক ভেষজ-বিজ্ঞানে সে-সব ওষুধ অন্তর্ভুক্ত করে ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করেছিলেন। তাঁর এই কাজে ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের

মতো যোগ্য প্রতিভাবান সহকারী পেয়েছিলেন বলে তাঁর কাজের পথ সুগম হয়েছিল। সর্পগন্ধার গুণাগুণ বিশ্লেষণ করায় ডাঃ মুখোপাধ্যায় ডাঃ চোপরাকে সাহায্য করেছিলেন। অন্তঃক্ষরণ (Endocrine) গ্রন্থি, বিশেষ করে পস্টেরিয়ার পিটুইটারি (Posterior Pituitary) গ্রন্থির উপর তিনি মৌলিক গবেষণা করেন।

সারাজীবন গবেষণাগারেই কাটিয়েছেন ডাঃ মুখোপাধ্যায়। লক্ষ্ণৌ-এর সেণ্ট্রাল ড্রাগ রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর হিসারে তিনি যে দূরদৃষ্টি এবং দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, তা বৈজ্ঞানিক এবং প্রশাসক মহলে অবিমিশ্র প্রশংসা অর্জন করেছে। ১৯৬২ সালে অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি মূল সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন। মূল সভাপতি যাঁরা হন, তাঁরা বৈজ্ঞানিক হিসাবে দেশে বিদেশে স্বীকৃত। ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের আগে ভারতীয় চিকিৎসকদের মধ্যে মূল সভাপতি হয়েছিলেন স্যার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী (১৯৩৬), স্যার রামনাথ চোপরা (১৯৪৮), ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় (১৯৫৭), ডাঃ লক্ষ্মণ-স্বামী মুদালিয়র (১৯৫৯)। এঁরা শুধু চিকিৎসক হিসেবেই স্বনামধন্য-নন, বৈজ্ঞানিক হিসেবেও বিশ্ববিশ্রুত।

বিষ্ণুপদ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯০৩ সালের ১লা মার্চ চব্বিশ পরগণার ব্যারাকপুরে। ১৯১৯ সালে শ্যামবাজার বিদ্যাসাগর স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, এবং এতে বৃত্তি লাভ করেন। লেটার পেয়েছিলেন তিনটি বিষয়ে—সংস্কৃত, বাংলা ও অঙ্কে। স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে তিনি আই. এস্-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, এতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ত্রয়োদশ স্থান অধিকার করেন। এর পরে আসেন কলকাতা মেডিকেল কলেজে। এখানেও প্রায় প্রতিটি পরীক্ষায় পুরস্কার বা পদক লাভ করেন। ১৯২৭ সালে ফার্মাকোলজি ও মিডওয়াইফরিতে অনার্স পেয়ে এম. বি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর ইডেন হাসপাতালে বিখ্যাত স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক গ্রীণ আর্মিটেজের অধীনে জুনিয়র হাউস-সার্জন হিসাবে বছর দেড়েক কাজ করেন। তারপর যোগ দেন ট্রপিক্যাল স্কুলের ফার্মাকোলজি বিভাগে

ডাঃ চোপরার অধীনে। ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের ভবিষ্যত কর্মজীবনের ধারা তখনই নির্ণীত হয়ে যায়।

ডাঃ চোপরার সান্নিধ্যে এসে ডাঃ মুখোপাধ্যায় গবেষণায় অণুপ্রেরণা লাভ করলেন। ছিলেন ইডেন হাসপাতালে, পেয়েছিলেন গ্রীণ আর্মিটেজের মতো শিক্ষক; সেখানে থাকলে ভবিষ্যতে হয়ত একজন যশস্বী স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞ হতেন, অর্থের ভাণ্ডার উপচে পড়ত। কিন্তু রামনাথ চোপরার প্রভাব এমনি যে গবেষক-জীবনের আর্থিক অপ্রাচুর্য তাঁর কাছে মনে হল তুচ্ছ।

১৯৩০ সালে কর্ণেল চোপরার সভাপতিত্বে যে ড্রাগস্ এনকোয়ারী কমিটি গঠিত হয়, ডাঃ মুখোপাধ্যায় সেই কমিটির সহ-সম্পাদক নিযুক্ত হন। আগে প্রায় সব ওষুধই আসত বিদেশ থেকে। ১৮১১ সালে কলকাতায় প্রথম ওষুধের দোকান খোলেন বাথগেট নামে এক স্কচ ব্যক্তি। তাঁর প্রতিষ্ঠানটি এদেশে ওষুধ প্রস্তুত করতে শুরু করে ১৯১০ সালে। স্টানিস্ট্রীট কোম্পানি ১৮২১ সালে ছিল একটি ছোট দোকান। পরে এই কোম্পানির নাম হয় স্মিথ-স্টানিস্ট্রীট এণ্ড কোং। এই কোম্পানি এদেশে ওষুধ প্রস্তুত করতে শুরু করে ১৯১৮ সালে। এছাড়া সরকারী তত্ত্বাবধানে গাজিপুরে আফিম-ফ্যাক্টরি স্থাপিত হয় ১৮২০ সালে, এবং দার্জিলিং-এর মংপুতে ও নিলগিরিতে স্থাপিত হয় কুইনিন ফ্যাক্টরি ১৮৬০ সালে। দেশীয় লোকদের চেষ্টায় ওষুধ প্রস্তুত করার কারখানা তৈরি হয় ১৮৯২ সালে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ৯১নং আপার সার্কুলার রোডে ৭০০ টাকা মূলধন নিয়ে একটি ফ্যাক্টরি স্থাপন করলেন। ১৮৯৯ সালে কলকাতার বিখ্যাত চিকিৎসক কার্তিকচন্দ্র বসু যোগ দিলেন আচার্য রায়ের সঙ্গে এবং বেঙ্গল কেমিকেল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিকেল ওয়ার্কস কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়। বস্তুত এদেশে ওষুধ প্রস্তুত করার পথিকৃৎ হলেন আচার্য রায়। ক্রমে আরো অনেক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে লাগল।

এই সব প্রতিষ্ঠান থেকে যেসব ওষুধ প্রস্তুত হত, সেগুলির মান একরকম ছিল না। সেজন্য সরকার স্থির করলেন প্রতিটি ওষুধের মান

নির্ণয় করা দরকার। ড্রাগ্‌স্ এনকোয়ারি কমিটির সম্পাদক হিসাবে ডাঃ বিষ্ণুপদ মুখোপাধ্যায় ডাঃ চোপরার সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছেন। এই কমিটি ওষুধের মান নির্দিষ্ট করে দেন এবং ওষুধ প্রস্তুত-প্রণালী সম্বন্ধে নির্দেশ দেন। এই মান এবং নির্দেশ এখনো অনুসৃত হচ্ছে।

১৯৩৩ সালে ডাঃ মুখোপাধ্যায় 'রকফেলার ফাউণ্ডেশন বৃত্তি' নিয়ে গেলেন চীন, জাপান এবং আমেরিকায়। আমেরিকার মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পেলেন ফার্মাকোলজিতে ডি. এস-সি. ডিগ্রি। আমেরিকা থেকে এলেন ইংল্যাণ্ডে ও জার্মানিতে। ১৯৩৭ সালে দেশে ফিরে এসে তিনি যোগ দিলেন ভারত সরকারের সদ্য-প্রতিষ্ঠিত বায়োকেমিকেল স্ট্যাণ্ডার্ডাইজেশন লেবরেটরি-তে (Biochemical Standardization Laboratory)। এই বিভাগের প্রধান ছিলেন রামনাথ চোপরা। ১৯৪১ সালে ডাঃ মুখার্জি এর ডিরেক্টর হলেন। ১৯৪৭ সালে ভারত সরকার-পরিচালিত কলকাতার কেন্দ্রীয় ভেষজ-গবেষণাগারের ডিরেক্টর নিযুক্ত হলেন। এই সময়ে লক্ষ্ণৌ-এ সেণ্ট্রাল ড্রাগ রিসার্চ ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়। ১৯৫১ সালে ডাঃ মুখোপাধ্যায় এর ডিরেক্টর নিযুক্ত হলেন। গবেষণায় লক্ষ্ণৌ-এর এই গবেষণাগারটি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। বলাবাহুল্য ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের অনলস পরিশ্রম এর মূলে।

ডাঃ মুখোপাধ্যায় তিনশো'রও অধিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখেছেন। দেশী ও বিদেশী বিখ্যাত জার্নালে সেগুলি প্রকাশিত হয়েছে। ওষুধের মান নির্ধারণ, দেশীয় ওষুধের গুণাগুণ বিচার, অন্তঃক্ষরণ গ্রন্থির উপর গবেষণা—তাঁর ব্যাপক গবেষণার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। তাঁরই চেষ্টায় লক্ষ্ণৌতে অন্তঃক্ষরণ গ্রন্থির উপর গবেষণার জন্য একটি সম্পূর্ণ বিভাগ গড়ে ওঠে। সেণ্ট্রাল ড্রাগ রিসার্চ ইনস্টিটিউট থেকে অবসর গ্রহণ করেন তিনি ১৯৬৩ সালে। কিন্তু কর্মজীবন এখনো শেষ হয়নি। যোগ দিলেন চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যান্সার রিসার্চ সেণ্টারে ডিরেক্টর-পদে এবং ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত এখানে কাজ করেন। তারপর কিছুকাল 'ফোর্ড ফাউণ্ডেশনে'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

ডাঃ, মুখোপাধ্যায় ছয় বছর ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তাঁরই চেষ্টায় দিলখুশা স্ট্রীটে বিজ্ঞান-কংগ্রেসের বাড়িটি তৈরি হয়। ১৯৬২ সালে অনুষ্ঠিত উনপঞ্চাশতম বিজ্ঞান-কংগ্রেসে তিনি মূল সভাপতি ছিলেন। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সের ফেলো মনোনীত হন ১৯৪৬ সালে, পরে এর সহ-সভাপতি হন (১৯৫৭-১৯৬০) এবং বর্তমানে এর কাউন্সিল সদস্য। ১৯৭৩ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি হন। দেশ-বিদেশের অজস্র সম্মান তাঁর উপর বর্ষিত হয়েছে। ডাঃ মুখোপাধ্যায় কতগুলি পদক এবং পুরস্কার লাভ করেছিলেন, কত সংস্থার সভ্য মনোনীত হয়েছিলেন এবং কত বিশেষজ্ঞ-কমিটির সভ্য ছিলেন বা আছেন তার হিসাব দিতে গেলে দুতিন পৃষ্ঠা ভরে যাবে। এই বললেই যথেষ্ট যে, তিনি আমেরিকা এবং ইউরোপের ২৪টি সংস্থার এবং ভারতের প্রায় ৫০টি কমিটি বা সংস্থার সভ্য। পদক ও পুরস্কারের কয়েকটি হল—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'গ্রিফিথ মেমোরিয়াল পুরস্কার' (১৯৩৮), নীলমণি ব্রহ্মচারী স্বর্ণপদক (১৯৩৮), দ্বারভাঙ্গা স্কলারশিপ (১৯৩৯-১৯৪১), আশুতোষ মুখার্জি স্বর্ণপদক (১৯৪০), কোটস্ পদক (১৯৪৪); এশিয়াটিক সোসাইটির ইণ্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস পদক (১৯৫১), বার্কলে পদক (১৯৫৪)। ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মশ্রী' দিয়ে সম্মানিত করেন।

ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের লেখার ক্ষমতা অসাধারণ। গবেষণামূলক প্রবন্ধ ছাড়া অসংখ্য পত্রপত্রিকায় তাঁর লেখা ছড়িয়ে আছে। কয়েকটি গ্রন্থও রচনা করেছেন, ডাঃ চোপরার সঙ্গে *Hand Book of Tropical Therapeutics* (১৯৫৫), ডাঃ এস. সি. দত্তর সঙ্গে *Bulletin on Pharmacognosy of Indian Root and Rhizome Drugs and Leaf Drugs* (১৯৫০); এগুলি ছাড়া আছে *Pharmacology of Oriental Plants* (১৯৬৪), *Indian Pharmacutical Codex* (১৯৫৩) ইত্যাদি পুস্তক।

ডাঃ মুখোপাধ্যায় সত্তর বছর অতিক্রম করেছেন। কিন্তু এখনো কর্মশক্তির অভাব নেই। যদিও বয়সের ভারে দীর্ঘদেহ কিছুটা অবসন্ন, তবু বিজ্ঞান এখনো তাঁর বিরামহীন ভাবনা।

চিকিৎসাবিদ্যায় স্বাদেশিকতার প্রভাব

গান্ধীজী যখন অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলেন, তখন সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে এক অভূতপূর্ব সাড়া জেগেছিল। অনেকে সরকারী চাকরি ছেড়ে দিলেন, অনেকে স্কুল-কলেজ প্রভৃতি 'গোলাম খানায়' পড়া ছেড়ে দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিলেন। কিছু কিছু সমস্যারও সৃষ্টি হল। বিপুল সংখ্যক ছাত্রসমাজকে শিক্ষার জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা অনেকেরই মনঃপূত হল না। স্বদেশী শিক্ষায়তন গড়ে তুলে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হল। আগেই বলা হয়েছে তখন কলকাতায় চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হত মেডিকেল কলেজ অব বেঙ্গল, ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুল ও কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে। প্রথমোক্ত দুটি প্রতিষ্ঠান সরকারী। বেলগাছিয়ার কারমাইকেল কলেজ যদিও দেশীয় লোকদের দ্বারা পরিচালিত বেসরকারী কলেজ, তবু তা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত এবং সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত নয়।

মেডিকেল কলেজের ধর্মঘটী ছাত্রদের এক সমাবেশ হল হেলিডে পার্কে। সেখানে সভাপতি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, বক্তা ডাঃ সুন্দরী-মোহন দাস। মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা জাতীয় মেডিকেল স্কুল-কলেজের দাবী তুলল। এই সভাতেই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হবে। ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস, ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায় ও ডাঃ সতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত এই কল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য তখনই কাজে লাগলেন। একজন প্রবীণ, অন্য দুজন যুবক। ১৯২০ সালে জাতীয় আয়ুর্বিজ্ঞান পরিষদ গঠিত হল। পরিষদের সভাপতি হলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং যুগ্মসম্পাদক হলেন ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায় ও ডাঃ সতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের ১১ নম্বর বাড়ি ফরবেস ম্যানসন ভাড়া নেওয়া হল স্কুলের জন্য। স্কুলের নাম হল ন্যাশনাল

মেডিকেল ইনস্টিটিউট। অধ্যক্ষ হলেন ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস। দেশবন্ধু স্কুলের জন্য পনের হাজার টাকা দিলেন 'তিলক স্বরাজ তহবিল' থেকে। ১৯২১ সালের ১৪ই এপ্রিল স্কুলের কাজ শুরু হল। এখানে কিছুদিন চলার পর স্কুলটিকে সরিয়ে নেওয়া হল ১৮৯ নম্বর মানিকতলা মেন রোডে, কাশিমবাজার মহারাজার বাগানবাড়িতে। একটি হাসপাতালও নির্মিত হল, 'ন্যাশনাল ইন্‌ফার্মারি'—দরিদ্র ও নিরাশ্রয়দের জন্য। পরে পার্ক সার্কাসের কাছে ২৪ নম্বর গোরাচাঁদ রোডে কলকাতা কর্পোরেশনের কাছ থেকে পাওয়া গেল ১৩ বিঘা জমি। এইখানেই তৈরি হল চিত্তরঞ্জন হাসপাতাল এবং মানিকতলা থেকে স্কুল তুলে নিয়ে আসা হল ১৯৩০ সালে। ১৯৩২ সালে রাস্তার উল্টো দিকে ৩২ নম্বর গোরা-চাঁদ রোডে অধ্যাপনা বিভাগ স্থানান্তরিত হল। স্কুলের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে ছাত্রদের 'এল. এম. এস. (ন্যাশনাল)' উপাধি দেওয়া হত। এই উপাধি অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বা সরকারের অনুমোদিত নয়। পরে বহু চেষ্টার পর এখানকার ছাত্রদের স্টেট মেডিকেল ফেকালটির এল. এম. এফ. পরীক্ষাদানের অনুমতি মেলে এবং ছাত্ররা সরকারী চিকিৎসালয়ে নিযুক্ত হওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়।

স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৪৮ সালে ন্যাশনাল মেডিকেল ইনস্টিটিউট যুক্ত হয় ক্যালকাটা মেডিকেল ইনস্টিটিউটের সঙ্গে। ক্যালকাটা মেডিকেল ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়েছিল ১৯০৭ সালে কয়েকজন উৎসাহী ব্যক্তির চেষ্টায়। তাঁদের মধ্যে ডাঃ শরৎকুমার মল্লিকের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই স্কুল প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ দিয়েছিলেন। প্রথমে স্কুলটি ছিল বৌবাজারে এবং নাম ছিল 'রয়াল কলেজ অব ফিজিসিয়ন্স্ অ্যাণ্ড সার্জন্‌স্ অব ইণ্ডিয়া'। পরে ৩০।১।৩ নম্বর আপার সার্কুলার রোডে স্থানান্তরিত হয়। তখনকার কলেজ ও স্কুল থেকে পাশ করে যেসব ডাক্তার বের হতেন, তাঁদের অধিকাংশই যোগ দিতেন সরকারী চাকরিতে অথবা প্র্যাক্‌টিস করতেন শহরে। গ্রামে তখন ডাক্তার প্রায় ছিলেন না বললেই হয়। গ্রামের লোক বিনা চিকিৎসায় মারা যেত। একমাত্র ভরসা ছিল হাতুড়ে চিকিৎসা। এই স্কুলের

উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্য ছিল, এখান থেকে মোটামুটি জ্ঞানলাভ করে চিকিৎসকরা পল্লী অঞ্চলে চিকিৎসা করবে।

যাই হোক, দুটি ইনস্টিটিউট মিলে নাম হল 'ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিকেল ইনস্টিটিউট।' তখন থেকে এম. বি. বি. এস. পড়ানো শুরু হল। ১৯৬৭ সালের ৯ই জুন কলেজটির পরিচালনার দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রহণ করেন। কলেজের নতুন নাম হল ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ।

অনেক আত্মত্যাগী দেশহিতৈষীর চেষ্টায় গড়ে উঠেছে এই প্রতি-ষ্ঠান। তাঁদের মধ্যে দেশবন্ধু ছিলেন সকলের শীর্ষে। একদল কর্মী ছিলেন, যাঁদের মধ্যে ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস ও ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায়ের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

এই প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়েছে বারবার। একদিকে অর্থা-ভাব, শিক্ষকরা প্রায় কোনো পারিশ্রমিকই পেতেন না, অন্যদিকে ছিল সরকারী বিরোধিতা। এসব সত্ত্বেও যে প্রতিষ্ঠানটির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়নি, তার কারণ ডাঃ দাস এবং ডাঃ রায়ের মতো একনিষ্ঠ, দৃঢ়-চেতা, আদর্শবাদী চিকিৎসকদের ঐকান্তিক পরিশ্রম।

ডাঃ সুন্দরীমোহন দাসের জন্ম ১৮৫৭ সালে ১৭ই ডিসেম্বর (২রা পৌষ ১২৬৩) শ্রীহট্ট জেলার দিগলী গ্রামে। তাঁর পিতা স্বরূপচন্দ্র দাস কালেক্টরে দেওয়ান ছিলেন। জন্ম-সালটি লক্ষ্য করার মতো, সেটা সিপাহী বিদ্রোহের বছর। ডাঃ দাস পরবর্তীকালে বলতেন, 'আমার জন্ম এক বিপ্লবের সময়। মরার আগে আরেকটি বিপ্লব কি দেখে যাব?' প্রায় এক শতাব্দী বেঁচেছিলেন তিনি। এই দীর্ঘকালের মধ্যে তিনি দেখেছেন বাংলার জাগরণ, স্বাধীনতার আন্দোলন এবং স্বাধীনতালাভ।

তাঁর স্কুলের পড়াশুনা শ্রীহট্ট স্কুলে। ১৮৭৩ সালে ১৫ টাকা বৃত্তি পেয়ে তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এর আগের বছর তাঁর পিতার মৃত্যু হয় এবং সংসারের সব দায়িত্ব তাঁর উপর পড়ে। বৃত্তির টাকা দিয়েই পড়ার খরচ চলবে, এই আশায় তিনি এলেন কলকাতায় এবং ভর্তি হলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। এফ. এ. পরীক্ষাতেও বৃত্তি পান ২০

টাকা। এবার ভর্তি হলেন মেডিকেল কলেজে। মেডিকেল কলেজে বহু পদক ও পুরস্কার লাভ করেছিলেন। গুডিব বৃত্তিও পেয়েছিলেন। ১৮৮২ সালে এম.বি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। স্কুল জীবনে শ্রীহট্টের আরেক তরুণের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সখ্যতা গড়ে ওঠে, যা সারা জীবন অটুট ছিল। সে তরুণ বিপিনচন্দ্র পাল। ব্রাহ্মধর্মগ্রহণ করায় বিপিন পাল বাড়ি থেকে টাকা পেতেন না। পড়ার খরচ চলত সুন্দরীমোহনের বৃত্তির টাকায়। সে সময়ে বাংলাদেশে ব্রাহ্মধর্মের দারুণ প্রভাব। প্রতিভাবান যুবকরা স্বভাবতই 'কেশব সেনের ওজস্বিনী বাগ্মিতা, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাধনা, শিবনাথ শাস্ত্রীর ত্যাগ ও সত্যনিষ্ঠায়' মুগ্ধ হতেন। সুন্দরীমোহন শিবনাথ শাস্ত্রীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন। শিবনাথ-শাস্ত্রীর প্রভাবে সুন্দরীমোহন, বিপিনচন্দ্র পাল, তারাকিশোর রায় চৌধুরী (পরে সন্তদাস বাবাজী) প্রমুখ যুবকগণ অগ্নিসাক্ষী করে প্রতিজ্ঞা করেন যে তাঁরা কখনো মূর্তি পূজা করবেন না, বিধবা বিবাহে উৎসাহ দেবেন, সরকারী চাকরি নেবেন না, এবং নিজের দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটিয়ে যে অর্থ উদ্বৃত্ত থাকবে, তা সঞ্চয় করবেন না—পরার্থে ব্যয় করবেন। ডাঃ দাস প্রতিটি প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন।

এম. বি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর ডাঃ দাস সরকারী চাকরি না নিয়ে চলে গেলেন শ্রীহট্টে জেলাবোর্ডের হেলথ ইন্‌স্‌পেক্টরের চাকরি নিয়ে। কিন্তু শ্রীহট্টে তাঁর মন বসল না, আবার চলে এলেন কলকাতায়। সেটা ১৮৮৯ সাল। তখন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯৫০ পর্যন্ত কলকাতাই তাঁর কর্মক্ষেত্র। কলকাতায় এসে সুন্দরীমোহন মিউনিসিপালিটির স্বাস্থ্যবিভাগে একটি কাজ নিলেন। ১৮৯৫-এ কলকাতায় প্লেগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। কিটাসাটো (Kitasato) এবং ইয়ারসিন (Yersin) আলাদাভাবে কাজ করে প্রায় একই সময়ে ১৮৯৪-এ আবিষ্কার করেন প্লেগের জীবাণু। ফরাসী বৈজ্ঞানিক সিমণ্ড (Simond) বোম্বাই শহরে প্লেগের উপর গবেষণা করে ১৮৯৭ সালে নিশ্চিত হন যে প্লেগ আসলে ইঁদুরের রোগ, মানুষ আক্রান্ত হয় দৈবাৎ। পরে অন্যান্য বৈজ্ঞানিক দ্বারা এই ধারণা সত্য বলে প্রমাণিত

হয় এবং এও জানা যায় যে ইঁদুরের গায়ে এক ধরনের কীট (Rat flea) থাকে, যা প্লেগের জীবাণু ইঁদুর থেকে মানুষের শরীরে ঢুকিয়ে দেয়। যে সব জায়গায় ইঁদুর বেশি থাকে, যেমন গুদামঘর, দোকান, সেগুলির সংস্কার করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সুন্দরীমোহন কয়েকটি সাহেব কোম্পানির চিনি, লবণ ইত্যাদির দোকান পুড়িয়ে দেওয়ার আদেশ দেন। এই নিয়ে ইংরেজ চেয়ারম্যানের সঙ্গে তাঁর বচসা হয়। চেয়ারম্যান তাঁকে চাকরি ছেড়ে দিতে বলেন, কিন্তু সুন্দরীমোহন তাতে রাজী না হওয়ায় তাঁকে পেন্সন দিয়ে বিদায় করা হয়। এ ঘটনা ঘটে ১৯০০ সালে।

এবার সুন্দরীমোহন একমনে প্র্যাকটিস শুরু করলেন, অতি অল্প-দিনেই নিপুণ স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞ হিসাবে পরিচিত হলেন, পসার হল বিরাট। বেলগাছিয়ার মেডিকেল স্কুলে ধাত্রীবিদ্যার অবৈতনিক অধ্যাপক-পদে যোগ দিলেন। ধাত্রীবিদ্যা ছাড়া স্বাস্থ্যবিজ্ঞানও পড়াতেন। কিন্তু এই স্কুল কারমাইকেল কলেজে পরিণত হওয়ার পর সরকারী পৃষ্ঠ-পোষকতা লাভ করে এবং ডাঃ দাস শপথ অনুযায়ী কলেজের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন। ন্যাশনাল মেডিকেল ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠায় ডাঃ দাসের ত্যাগ অপরিসীম। ডাঃ দাসের পুত্র যোগানন্দ দাস লিখেছেন —'এই শিশু প্রতিষ্ঠান ছিল তাঁর ধ্যানজ্ঞান, স্বপ্নে জাগরণে সকল সময়ে একমাত্র চিন্তা ও সাধনা। পাছে এই সাধনায় বাধা আসে, সেই-জন্য তাঁর বিস্তৃত ডাক্তারি 'প্র্যাক্‌টিস (মাসে ৬।৭ হাজার টাকার, আজকের দিনের অন্তত ১৫/২০ হাজার টাকার মূল্যের) ছাড়তে লাগলেন। স্ত্রীরোগের 'কেস'গুলির অনেক দিলেন মেডিকেল কলেজের পাশ করা আমারই এক সতীর্থ বন্ধুকে। সার্জারির কেস্‌ সব পাঠাতেন যুবক ডাক্তার কে. এস. রায়কে। এমন কি, ডাঃ কে. এস. রায়ের উচ্ছ্-সিত প্রশংসা করে, দৈনিক কাগজে একাধিক সচিত্র প্রবন্ধ লিখলেন ইংরেজিতে, বাংলায় ; সেগুলিতে অবশ্য ন্যাশনাল মেডিকেল ইনস্টিটিউট ও চিত্তরঞ্জন হাসপাতালের উল্লেখ করতে কখনো ভুলতেন না। জেনারেল প্র্যাক্‌টিসের রোগীদের বলে দিতেন ডাঃ এস্‌. সি. সেনগুপ্তের কথা।

এইভাবে এই ন্যাশনাল মেডিকেল ইনস্টিটিউট ও চিত্তরঞ্জন হাস-পাতালকে সর্বশক্তি নিয়োগ করে ব্যাপকভাবে প্রচার করবার এবং গড়ে তুলবার জন্য সেদিনের একজন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস তাঁর সমস্ত 'প্র্যাক্‌টিস' ছেড়ে দিলেন। সম্বল রইল শুধু তাঁর বই বিক্রির রোজগার এবং ইনস্টিটিউট থেকে গাড়ি ভাড়া বাবদ প্রাপ্ত সামান্য ভাতা। মাইনে নিলেন না। অথচ, পূর্ব সঞ্চয় কিছু নেই, একটা বাড়ি নয়, একটা ব্যবসা নয়, একটা ব্যাঙ্ক ব্যালান্স নয়। এক কথায় এই ন্যাশনাল মেডিকেল ইনস্টিটিউট ও চিত্তরঞ্জন হাসপাতাল স্থাপন ও তার পরিপুষ্টির জন্য নিজের ধন মন জীবন উৎসর্গ করলেন।' (স্বস্তিকা, সুন্দরীমোহন দাস স্মৃতি সংখ্যা, ১৩৬৪)

উদ্ধৃতিটি একটু বড় হয়ে গেল, তবে এ থেকে সুন্দরীমোহনের সত্যনিষ্ঠা সম্পর্কে সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। শপথ নিয়েছিলেন উদ্বৃত্ত অর্থ সৎকার্যে দান করবেন। প্রসবকরানর জন্য পারিশ্রমিক নিতেন পাঁচশত টাকা। কিন্তু গরীব লোকদের কাছ থেকে একটি পয়সাও নিতেন না। তাঁর বাড়ির দ্বার ছিল অবারিত। সব সময়ই তাঁর বাড়ি আশ্রিতদের দ্বারা পূর্ণ থাকত। ১৯২১ সালে ডাঃ দাসের অধ্যক্ষ-তায় ইনস্টিটিউটের কাজ শুরু হয়, মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত এই পদে আসীন ছিলেন। কবিরাজ শামাদাস বাচস্পতির বৈদ্যশাস্ত্রপীঠের ডাক্তারি বিভাগেরও প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন ডাঃ দাস।

অল্প বয়স থেকেই সুন্দরীমোহন দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। মেডিকেল কলেজে পড়ার সময় হিন্দুমেলায় যোগ দিয়ে লাঠিখেলা, কুস্তি প্রভৃতিতে দক্ষ হয়ে ওঠেন। তাঁর সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়িটি বিপ্লবীদের আশ্রয়স্থল ছিল এবং তাঁরা এখানে বোমা তৈরি করত। বহু বিপ্লবী তাঁর কাছ থেকে অর্থ সাহায্য পেত। উল্লাসকর দত্ত তাঁর বাড়িতেই বেশি সময় কাটাতেন। দেশবন্ধুর নির্দেশে ১৯২৪ সালে স্বরাজ্য পার্টির প্রার্থী হিসাবে ডাঃ দাস কলকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। তিনি হেল্‌থ কমিটির সভাপতি হয়ে অনেক উন্নয়নমূলক কাজে হাত দেন। প্রতিটি ওয়ার্ডে নাগরিকদের দিয়ে হেল্‌থ

সোসাইটি গঠন করান এবং জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা করেন। এই সময়ই শহরের বিভিন্ন জায়গায় কর্পোরেশনের দাতব্য চিকিৎসালয় খোলা হয়। জুনিয়ার নার্সদের জন্য ট্রেনিং কোর্স চালু করা হয়। বাড়ি গিয়ে বিনামূল্যে প্রসব করাবার জন্য কর্পোরেশন কর্তৃক ধাত্রী নিযুক্ত হয়। শিশু ও রোগীর জন্য যাতে সস্তায় দুধ পাওয়া যায় সেই উদ্দেশ্যে দুধের সমবায় সমিতি গঠিত হয়। বেসরকারী হাসপাতালগুলি আগে কর্পোরেশন থেকে খুব কম অর্থ সাহায্য পেত, সুন্দরীমোহনের চেষ্টায় এই সাহায্যের পরিমাণ বর্ধিত হয়। বলা বাহুল্য, সাহায্যের সিংহভাগ পেত চিত্তরঞ্জন হাসপাতাল ও ন্যাশনাল মেডিকেল ইনস্টিটিউট।

সুন্দরীমোহন শপথ নিয়েছিলেন বিধবা বিবাহে উৎসাহ দেবেন। তিনি যে শুধু অপরকে বিধবা বিবাহে উৎসাহিত করতেন তাই নয়, নিজেও বিধবাবিবাহ করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী হেমাঙ্গিনী দেবী মেডিকেল কলেজে নার্সিং শিখছিলেন। সুন্দরীমোহন যখন সেখানকার ছাত্র, তখন দুজনের পরিচয় হয় এবং পরে তাঁদের বিবাহ হয়।

ডাঃ দাস ইংরেজি ও বাংলা দুভাষাতেই বহু প্রবন্ধ ও গ্রন্থ লিখেছেন। কয়েকটি বই-এর নাম—বৃদ্ধা ধাত্রীর রোজনামচা (দুই খণ্ড), সরল ধাত্রী শিক্ষা ও কুমারতন্ত্র, শুশ্রূষা বিদ্যা (পাঁচ খণ্ড), শিশু পরিচর্যা, রুগ্ন শিশু শুশ্রূষা, মিউনিসিপাল দর্পণ, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান। তাঁর গ্রন্থের ভাষা যেমন প্রাঞ্জল, তেমনি সাহিত্যরসপুষ্ট। দূর দূর গ্রামের বহু শিক্ষিতা স্ত্রীলোক তাঁর গ্রন্থ পাঠ করে ধাত্রীবিদ্যায় পারদর্শী হয়েছেন। 'বৃদ্ধা ধাত্রীর রোজনামচার' দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা লিখেছেন পরশুরাম। তিনি লিখেছেন—'ভেবেছিলাম কেবল গরম জল, তুলো আর লাইসলের বর্ণনা পাব। পাঁচ লাইন পড়েই বুঝলাম, বঙ্কিমচন্দ্র যেমন ডেপুটী, রবীন্দ্রনাথ যেমন জমিদার, রোজনামচার লেখকও তেমনি ধাত্রী। ধাত্রীর কাজটা জীবিকামাত্র ; দৃষ্টি আর অনুভূতি পেশাদারের সঙ্কীর্ণ গণ্ডি ছাড়িয়ে বহুদূরে ছড়িয়ে পড়েছে।' এই সব বই থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট বুঝা যায়—মাতা ও শিশুদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ডাঃ দাস

সকলকে সচেতন করতে চাইতেন। তিনি দেখেছিলেন গ্রামে বাড়ির সবচেয়ে নিকৃষ্ট আলোবাতাসহীন অন্ধকার ঘরটি সূতিকাগৃহ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অশিক্ষিত ধাত্রীদের পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে থাকার দরুন বহু মা ও শিশুর মৃত্যু হয়। ডাঃ দাস এই অপচয়ের প্রতিকার চেয়েছিলেন। তিনি একটি আত্মজীবনীও লিখেছিলেন। পুত্র যোগানন্দের কাছ থেকে পাণ্ডুলিপিটি কেউ নিয়ে আর ফেরত দেননি। এটি প্রকাশিত হলে অনেক তথ্য জানা যেত। ব্রাহ্ম হলেও বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি সুন্দরীমোহনের প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। নিজে অনেক ব্রহ্মসঙ্গীত এবং কীর্তন রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত সঙ্গীত সমাজে গীত হয়। নিজে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কীর্তন করতেন, কণ্ঠও ছিল মধুর। তাঁর কীর্তন শুনতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁর বাড়িতে আসতেন। রবীন্দ্রনাথও তাঁর কীর্তন শুনতে ভালবাসতেন।

সুন্দরীমোহনের দুই পুত্র—প্রেমানন্দ ও যোগানন্দ এবং এক কন্যা ভক্তিউষা দাস। সুন্দরীমোহনের যদিও ব্যবসাবুদ্ধি ছিল না, তবু বিদেশ থেকে বহু অর্থ ব্যয় করে যন্ত্রপাতি আনিয়ে তাঁর সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়িতে মোজা গেঞ্জির কারখানা খোলেন। উদ্দেশ্য ছিল তাঁর আশ্রিত বেকার যুবকদের কিছু কাজ দেওয়া। এই ব্যবসাতে তাঁর প্রচুর লোকসান হয়, কিন্তু সেজন্য কোনদিন অনুতাপ করেননি। জ্যেষ্ঠপুত্র প্রেমানন্দকে পাঠালেন অমেরিকায় ভেষজ-বিদ্যা (Pharmaceutical Chemistry) সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য। তাঁকে দিয়ে ১৯১৬ সালে স্ট্যাণ্ডার্ড ড্রাগ ও কেমিকেল কোম্পানি স্থাপন করান। শেষ বয়সে প্রতিষ্ঠা করেন ইউনিভার্সাল ড্রাগ হাউস প্রাইভেট লিমিটেড। যোগানন্দ মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন কিন্তু অসহযোগ অন্দোলনের সময় সেই যে কলেজ ছাড়লেন, আর তাতে ফিরে গেলেন না। 'শনিবারের চিঠি' তাঁরই সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

১৯৫০ সালের ৪ঠা এপ্রিল ডাঃ দাসের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর আগে তিনি বলে গিয়েছিলেন, তাঁর দেহ ছাত্ররা ব্যবচ্ছেদ করবে। যে প্রতিষ্ঠান তাঁর একমাত্র ধ্যানজ্ঞান ছিল, সেই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের

প্রতি ভালবাসা প্রদর্শনের জন্যই তাঁর এই অন্তিম দান। অবশ্য এই দান ছাত্ররা গ্রহণ করেনি।

ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের সঙ্গে যেমন ডাঃ সুন্দরীমোহন দাসের নাম জড়িয়ে আছে, তেমনি জড়িয়ে আছে ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায়ের নাম। কলেজের আভ্যন্তরীণ কাজের জন্য যেমন ছিলেন ডাঃ দাস, বাইরের কাজের জন্য তেমনি ডাঃ রায়।

কুমুদশঙ্কর জন্মেছিলেন পূর্ববাংলার এক সম্ভ্রান্ত জমিদার বংশে। জন্ম ১৮৯২ সালে কলকাতায়। তাঁর পিতার নাম পার্বতীশঙ্কর রায়। কুমুদশঙ্করের দাদা ছিলেন কুমারশঙ্কর রায়। কিরণশঙ্কর তাঁর খুড়তুতো দাদা। জমিদার বংশে লালিত এবং আরামে পালিত, কিন্তু সাধারণ জমিদার সন্তানের মতো ভোগবিলাসে দিনযাপন না করে কুমুদশঙ্কর বেছে নিলেন কর্মীর জীবন।

স্কুলের পড়াশুনা হিন্দুস্কুলে। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৯১১ সালে ভর্তি হলেন কলকাতার মেডিকেল কলেজে। ঐ বছরেই মেডিকেল কলেজের পড়া ছেড়ে দিয়ে তিনি চলে গেলেন বিলেতে। এডিনবরা থেকে ১৯১৫ সালে এম. বি. সি. এইচ. বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বি. এস-সি. এবং সাতটি বিষয়ে এম.এ ডিগ্রীও লাভ করেন। এরপর কিছুদিন তিনি স্কটল্যাণ্ডের ওকিল হিল যক্ষ্মা হাসপাতালে (Ochil Hill Tuberculosis Sanatorium) কাজ করেন। তখনকার দিনে যক্ষ্মা ছিল এক ভয়ঙ্কর ব্যাধি। এর কোনো সুচিকিৎসা ছিল না। খুব কম চিকিৎসকই এই রোগের চিকিৎসায় উৎসাহী হতেন। ডাঃ রায় একে চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করলেন।

১৯১৮ সালে ডাঃ রায় ফিরে এলেন দেশে। যোগ দিলেন কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে প্রাণি-বিদ্যার সহায়ক অধ্যাপক রূপে। ডাঃ রায়ের মনে দারুণ অস্বস্তি। তিনি শিখে এসেছেন সার্জারি। কিন্তু সে সুযোগই পাচ্ছেন না। কিছুদিন পরে জুনিয়র সার্জনের একটি পদ শূন্য হয় এই কলেজের হাসপাতালে। ডাঃ রায় প্রার্থী হলেন। ডাঃ সুরেশ সর্বাধিকারী

ডাঃ রায়কে বললেন 'তুমি প্রাণি-বিদ্যার অধ্যাপনা কর, সার্জারির কি জান?' অগত্যা ডাঃ রায় কাজে ইস্তফা দিলেন এবং যাওয়ার সময় ডাঃ সর্বাধিকারীকে বলে গেলেন,'স্যার, সার্জারিই আমি করব।' আমজাদিয়া হোটেলের পাশে একটি বাড়িতে পলিক্লিনিক খুললেন ডাঃ রায়। সেখানে তিনি সার্জারিই করতেন। শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালেও কাজ পেলেন।

কুমুদশঙ্কর রায়ের জীবন এক নিরলস কর্মীর জীবন। দেশের জন্য, সাধারণ মানুষের উপকারের জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেছিলেন। ন্যাশনাল মেডিকেল ইনস্টিটিউট স্থাপনে তাঁর নিঃস্বার্থ পরিশ্রমের তুলনা একমাত্র ডাঃ দাসের সঙ্গে করা যায়। তিনি এর সম্পাদক ছিলেন, আবার সার্জারির অধ্যাপকও ছিলেন। স্কুলের জন্য, হাসপাতালের জন্য চাই অর্থ। বহু প্রতিষ্ঠান, বহু ব্যক্তির কাছ থেকে তিনি অর্থ সংগ্রহ করেছেন। তাঁর স্বভাব ছিল মধুর, তার উপর ছিলেন রূপবান। কেউই তাঁর মুখের উপর 'না' বলতে পারতেন না। তাঁরই চেষ্টায় ২৪ নম্বর গোরাচাঁদ রোডে তের বিঘা জমি কর্পোরেশনের কাছ থেকে যৎসামান্য মূল্যে পাওয়া যায়। কর্পোরেশনের কাছ থেকে তিনি আদায় করলেন আড়াই লক্ষ টাকা—সার্জারি ব্লক তৈরি করার জন্য। বাৎসরিক ৪৭০০০ টাকা গ্রাণ্টও আদায় করলেন। ধনী জমিদার, ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ সকলেই অকৃপণভাবে দান করেছেন। ডাঃ রায়ের সহকর্মী সন্তোষকুমারী দেবী বলেন—'কুমুদের মতো এমন হৃদয়বান লোক যে কোন দেশে বিরল। দিনরাত ভাবত কি করে ন্যাশনাল স্কুলকে বড় করা যায়। চাঁদা তুলতে, রোগীদের জন্য কাপড় যোগাড় করতে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছি তাঁর সঙ্গে। স্কুলের জন্য এসব কাজ করতে তাঁর এতটুকু সঙ্কোচবোধ ছিল না। ডাঃ বিধান রায় ঠাট্টা করে বলতেন, রাজার ছেলের কি এসব সাজে?'

এই স্কুলের প্রতি যাতে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, সেজন্য ডাঃ রায় দেশের বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে স্কুল ও হাসপাতাল পরিদর্শনের জন্য নিয়ে আসতেন। পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, হাকিম আজমল খাঁ প্রমুখ নেতৃবর্গ এখানে এসেছিলেন।

যাদবপুর যক্ষ্মা-হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করায় কুমুদশঙ্কর ছিলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের প্রধান সহায়। মাত্র চারটি শয্যা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই হাসপাতাল। আজ এই হাসপাতাল ভারতের অন্যতম বৃহত্তম হাসপাতাল। সাড়ে সাতশ রোগীর থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। কুমুদশঙ্করের উদ্যম, দূরদর্শিতা ও রোগীর প্রতি মমত্ববোধের ফলেই তা সম্ভব হয়েছে। ১৯২২ সাল থেকে তিনি এই হাসপাতালের সম্পাদক এবং তত্ত্বাবধায়ক। বর্তমানে যক্ষ্মা চিকিৎসার জন্য বেশ কয়েকটি কার্যকরী ওষুধ রয়েছে। প্রথম থেকে চিকিৎসা হলে আরোগ্যলাভের সম্ভাবনা পুরোপুরি। সেনেটরিয়ামে থেকে চিকিৎসা, প্রচুর পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা—এসব অনাবশ্যক। রোগী যদি নিয়মিত ওষুধ সেবন করে, তাহলে সেনেটরিয়ামে থাকারও কোনো প্রয়োজন নেই, পুষ্টিকর খাদ্যের তালিকা নিয়েও মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই। বাড়িতে থেকে সাধারণ খাবার খেয়েও সুস্থ হয়ে ওঠা যায়। হাসপাতাল বা সেনেটরিয়াম প্রয়োজন শুধু বিশেষ অবস্থায়। ভারতে যক্ষ্মারোগীর সংখ্যা প্রায় আশি লক্ষ। এদের সকলকে হাসপাতালে রেখে চিকিৎসা করা কোনদিন সম্ভব নয়। বর্তমানে যক্ষ্মারোগের জন্য শয্যাসংখ্যা ছত্রিশ হাজারের মতো।

যক্ষ্মার আশ্চর্য ওষুধ স্ট্রেপটোমাইসিন আবিষ্কৃত হয় ১৯৪৪ সালে। আইসোনিয়াজিড, (Isoniazid) ও প্যারাএমাইনোসেলিসিলিক এসিড (PAS) অন্য দুটি প্রয়োজনীয় ওষুধ। এই তিনটি ওষুধ যক্ষ্মারোগের চিকিৎসায় নবযুগের সূচনা করেছে। অতি অল্পকালের মধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যক্ষ্মারোগ দ্রুত হ্রাস পেয়েছে। যক্ষ্মা-প্রতিরোধের জন্য বি. সি. জি. টিকা একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। প্যারিসে পাস্তুর ইনস্টিটিউটের দুই বৈজ্ঞানিক কামেট ও গুয়েরিণ এই টিকা আবিষ্কার করেছিলেন বলে এর নাম হল Bacillus Calmette Guerin।

যাদবপুর হাসপাতালের আয়তন যত বাড়তে লাগল, তত নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হতে লাগল। যক্ষ্মারোগীকে হাসপাতালে থাকতে হয় দীর্ঘদিন। হাসপাতালে থাকতে থাকতে রোগীর মানসিকতার

পরিবর্তন হয়। হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার সময় রোগী নিজেকে সমর্পণ করে চিকিৎসকের কাছে। কিন্তু রোগী যত সুস্থ বোধ করতে থাকে, হাসপাতালের প্রতি তার দাবিগুলি তত বাড়তে থাকে। অনেক যক্ষ্মা-হাসপাতালে রোগীদের সংস্থাও রয়েছে। হাসপাতালের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হিসাবে ডাঃ রায়ের কাজ ছিল কঠিন। কিন্তু তিনি তাঁর মধুর স্বভাবে রোগীদের মন জয় করতে পেরেছিলেন।

প্রথমদিকে এই হাসপাতালের নাম ছিল চন্দ্রমোহন ঘোষ মেমোরিয়াল সেনেটরিয়াম। পরে নাম হয় যাদবপুর টি.বি. হাসপাতাল। ১৯৫০ সালে কুমুদশঙ্করের নামে হাসপাতালের নাম রাখা হয় কে. এস. রায় হাসপাতাল।

ডাঃ রায় আরো একটি সেনেটরিয়াম প্রতিষ্ঠা করেন কার্সিয়াং-এ, 'এস্. বি. দে সেনেটরিয়াম'। কার্সিয়াং-এ ডাঃ রায়ের একটি বাড়ি ছিল। বছরে একবার সপরিবারে সেখানে গিয়ে কিছুদিন থাকতেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে যক্ষ্মারোগের প্রকোপ যথেষ্ট, অথচ চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। তিনি শুনতে পেলেন, রায় বাহাদুর শশিভূষণ দে তাঁর কার্সিয়াং-এর বাড়িটি স্কুলের জন্য দান করবেন। কলকাতায় ফিরে এসেই দেখা করলেন রায় বাহাদুরের সঙ্গে এবং যক্ষ্মা হাসপাতালের প্রয়োজনীয়তার কথা তাঁকে বোঝালেন। শশিভূষণ হাসপাতালের জন্য বাড়িটি দান করলেন। চব্বিশটি শয্যা নিয়ে হাসপাতাল স্থাপিত হয়েছিল, বর্তমানে এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে তিনশ পঞ্চাশ-এ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ডাঃ রায় 'বেঙ্গল সিবিল প্রোটেকশন কমিটি' সংগঠিত করেন (Bengal Civil Protection Committee)। এই কমিটির হেড-অফিস ছিল, তাঁরই পলিক্লিনিক। সাতটি অ্যাম্বুলেন্স ছিল কমিটির হাতে। বর্মা থেকে যখন দলে দলে উদ্বাস্তু ভারতে প্রবেশ করে, তখন সেবাকার্যে যোগ দেওয়ার জন্য একটি দল নিয়ে ডাঃ রায় যান ইম্ফলে। সেখানে তাঁকে নানা বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। এতে তাঁর নির্ভীকতা ও মানবিকতা প্রমাণিত হয়।

ডাঃ রায় রাজনীতিতেও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। দেশবন্ধুর সঙ্গে তাঁর পারিবারিক আত্মীয়তা ছিল। তার উপর দেশবন্ধুর আত্মত্যাগ ও ব্যক্তিত্বে তিনি বিশেষ প্রভাবিত হয়েছিলেন। স্বরাজপার্টির টিকিটে তিনি বঙ্গীয় আইন সভায় নির্বাচিত হলেন ১৯২৫ সালে। ১৯২৬ সালে নির্বাচিত হলেন কলকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর এবং ১৯২৯ সালে হলেন অলডারম্যান।

ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায় চিকিৎসকদের সংস্থা ইণ্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন সংগঠিত করার প্রাণপণ চেষ্টা করেন। ১৯২৮ সালে কলকাতায় পঞ্চম সারা ভারত চিকিৎসক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে সভাপতি ছিলেন বোম্বাই-এর ডাঃ জি. ভি. দেশমুখ এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় ডাঃ নীলরতন সরকার। ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায় ছিলেন সম্মেলনের সাংগঠনিক সম্পাদক। এই সম্মেলনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে চিকিৎসকদের একটি স্থায়ী সংস্থা গঠিত হবে। নাম হবে 'অল ইণ্ডিয়া মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন'।

এখানে আগেকার ইতিহাস কিছুটা বলা যেতে পারে। কলকাতায় চিকিৎসকদের প্রথম সংস্থা সংগঠিত হয় ১৮২৩ সালে। নাম ছিল 'দি মেডিকেল অ্যাণ্ড ফিজিক্যাল সোসাইটি অব ক্যালকাটা'। সভ্যদের অধিকাংশই ছিলেন ইয়োরোপীয়। এই সোসাইটির পাঠাগার ও প্রদর্শশালা (Museum) ছিল। মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রদর্শশালাটি ঐ কলেজকে দিয়ে দেওয়া হয়। এই সংস্থার অস্তিত্ব ছিল স্বল্পস্থায়ী। ১৮৬৫ সালে আরেকটি সংস্থা গঠিত হয়— ব্রিটিশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের বঙ্গদেশীয় শাখা। এতে ইংরেজ ও ভারতীয় দুই শ্রেণীর চিকিৎসকই ছিলেন। ডাঃ সূর্যকুমার গুডিব চক্রবর্তী ছিলেন এর প্রধান উদ্যোক্তা। কিন্তু ১৮৬৭ সালের সাম্বাৎসরিক সভায় যেদিন সংস্থার সহ-সভাপতি ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার হোমিওপ্যাথির গুণ-গান করলেন, সেদিন থেকেই চিকিৎসকদের উৎসাহে ভাটা পড়ে গেল। মহেন্দ্রলাল সংস্থা থেকে বিতাড়িত হলেন। এই সংস্থার সভায় যে সব প্রবন্ধ পাঠ করা হত, সেগুলি Indian

Medical Gazette নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হত। এই পত্রিকার প্রথম প্রকাশ ১৮৬৬ সালে। ১৮৮০ সালে 'ক্যালকাটা মেডিকেল সোসাইটি' নামে আর একটি সংস্থা গঠিত হয়; এতেও ছিলেন ইংরেজ ও ভারতীয় দুই-ই। এর সভাপতি ছিলেন মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ সার্জন-মেজর ডি. বি. স্মিথ (Surgeon-Major D. B. Smith) এবং যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন বিখ্যাত শল্যচিকিৎসক ক্যানেথ মেক্লিয়ড (K. Mcleod) ও ধাত্রীবিদ্যার অধ্যাপক রবার্ট হার্ভে (R. Harvey)। মাসে একবার এই সোসাইটির সভা বসত মেডিকেল কলেজে এবং সভার বিবরণ প্রকাশিত হত 'ইণ্ডিয়ান মেডিকেল গেজেট'-এ। ১৮৯৮ সাল পর্যন্ত এই সোসাইটির স্থায়িত্ব ছিল। কলকাতায় ভারতীয় চিকিৎসকদের প্রথম সংস্থা সংগঠিত হয় ১৯০১ সালে। এই সংস্থার নাম ক্যালকাটা মেডিকেল ক্লাব। নীলরতন সরকার ছিলেন এর প্রধান উদ্যোক্তা। প্রথম কয়েক বছর ক্লাবটি ডাঃ সরকারের ৬১ নম্বর হ্যারিসন রোডের বাড়িতেই অবস্থিত ছিল।

ইণ্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন নামে একটি সংস্থা গঠিত হয়েছিল ১৮৯৫ সালে। এর সভাপতি ছিলেন ডাঃ লালমাধব মুখোপাধ্যায় এবং সম্পাদক ছিলেন ডাঃ জে.আর. ওয়ালেস। ওয়ালেস 'ইণ্ডিয়ান মেডিকেল রেকর্ড' নামক পত্রিকার সম্পাদকও ছিলেন। এই পত্রিকার প্রথম প্রকাশ ১৮৯০ সালে। এই অ্যাসোসিয়েশনের আয়ু ছিল স্বল্পকাল।

এই শতকের গোড়ার দিকে যখন দেশবাসীর মধ্যে স্বাদেশিকতার মন্ত্র প্রচারিত হতে লাগল, তখন চিকিৎসকরাও তাতে উদ্বুদ্ধ হলেন। তাঁদের মধ্যেও দেখা দিল অস্থিরতা। প্রথম সারা ভারত চিকিৎসক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ১৯১৭ সালে কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে। সভাপতি ছিলেন ডাঃ রাঘবেন্দ্র রাও এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ডাঃ নীলরতন সরকার। দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ সম্মেলন হয় যথাক্রমে দিল্লী, অমৃতসর এবং নাগপুরে। ১৯২০ সালে চতুর্থ সম্মেলন হওয়ার পর বেশ কয়েক বছর আর কোন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়নি। ১৯২৮ সালে

পঞ্চম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার আগে কলকাতায় স্থানীয় চিকিৎসকদের একটি সভা হয়, ডাঃ সুন্দরীমোহন দাসের সভাপতিত্বে। এই সভায় স্থির হয়, একটি স্থায়ী অ্যাসোসিয়েশন গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। এই সময় ব্রিটিশ মেডিকেল কাউন্সিল সমস্ত ভারতীয় ডিগ্রীর স্বীকৃতি তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এর ফলে ভারতীয় চিকিৎসকদের বিলাতে গিয়ে পড়ার সুযোগ নষ্ট হয়ে যাবে, সরকারী চাকরি জুটবে না। অন্যদিকে নীলরতন সরকার, জীবরাজ মেহ্‌টা, বিধানচন্দ্র রায় প্রমুখ নেতৃবর্গ ভাবলেন ভারতের চিকিৎসকগণ শিক্ষার জন্য, ওষুধের জন্য কেন পরমুখাপেক্ষী হবেন। যোগ্য ভারতীয় শিক্ষক রয়েছেন, তাঁরা বিদেশীদের তুলনায় কোন অংশে কম নন। শিক্ষার জন্য ভারতীয়দের বিদেশে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনীয় ওষুধও দেশেই প্রস্তুত করতে হবে। কিন্তু এই সবের জন্য প্রয়োজন একটি সুসংগঠিত সংস্থা।

১৯২৮ সালে পঞ্চম সম্মেলন হল কলকাতার ন্যাশনাল মেডিকেল ইনস্টিটিউটে। এই সম্মেলনেই অল ইণ্ডিয়া মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয়। পরে ১৯৩০ সালে এর পরিবর্তিত নাম হয় 'ইণ্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন'। এই সংস্থা শুরু হয়েছিল ২২২ জন সদস্য নিয়ে। ডাঃ অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠাতা সভ্যদের অন্যতম। বর্তমানে আই. এম. এ-র সদস্য-সংখ্যা ৩৭০০০-এর কাছাকাছি।

ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায় আই. এম. এ-র সম্পাদক নির্বাচিত হলেন। দীর্ঘ ১২ বৎসর অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করেন। কি করে এই প্রতিষ্ঠানটিকে বড় করে তোলা যায় সেজন্য তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে গিয়েছেন শাখা সংস্থা গঠনে সাহায্য করতে। তাঁর অপরিসীম উদ্যম ও পরিশ্রমের ফলে সদস্যসংখ্যা দ্রুত বেড়ে যেতে লাগল। আজ ভারতের প্রতিটি রাজ্যে রয়েছে আই. এম. এ-র শাখা। ডাঃ রায় পরে পর পর দুবছর এর সভাপতিও হয়েছিলেন। এই সংস্থার যে জার্নালটি সারা পৃথিবীতে পরিচিত, তার প্রথম সম্পাদক ছিলেন নীলরতন সরকার। স্বাস্থ্যের কারণে নীলরতন ১৯৪২ সালে সম্পাদকের দায়িত্ব ত্যাগ করেন এবং ডাঃ রায়ের উপর সম্পাদনার ভার পড়ে।

অতিশয় দক্ষতার সঙ্গে তিনি জার্নালটি পরিচালনা করেন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এর সম্পাদক ছিলেন।

ইণ্ডিয়ান মেডিকেল কাউন্সিলেরও সদস্য ছিলেন ডাঃ রায়। বিশিষ্ট চিকিৎসকদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল এই কাউন্সিল। ১৯৪৯ সালে তিনি এর সভাপতি হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরও ফেলো ছিলেন।

১৯৫০ সালের ২৭শে ও ২৮শে অক্টোবর মাদ্রাজে মেডিকেল কাউন্সিলের সভা হওয়ার কথা। সেখানে যাওয়ার আগের দিন শরীর খারাপ লাগছিল। ডাঃ জে. সি. গুপ্ত পরীক্ষা করে বললেন—বিশ্রাম নিন, এখন কোথাও যাবেন না। কিন্তু ডাঃ রায় সে কথায় কান দিলেন না। ঘরে শুয়ে বিশ্রাম নেওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব। সভায় যোগ দেওয়ার পথে ডাঃ রায় প্রথমে গেলেন ভেলোরে। সেখানে আমেরিকার একজন বিশিষ্ট সার্জন এসেছেন, তাঁর সঙ্গে কথা বলার জন্য। ২৪শে অক্টোবর রাত্রে খাওয়ার সময় বুকে ব্যথা বোধ করলেন এবং অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরেই রাত ৯টার সময় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। সে সময় তাঁর পুত্র ডাঃ করুণশঙ্কর তাঁর পাশে ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৮ বৎসর। মৃতদেহ আনা হল কলকাতায় বিশেষ বিমানে করে। তাঁর হাতে গড়া ন্যাশনাল মেডিকেল ইনস্টিটিউট, যাদবপুর হাসপাতাল প্রভৃতির রোগীরা পর্যন্ত শোকে বিহ্বল হল। ডাঃ রায় প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি এত সুদৃঢ় করে রেখেছিলেন যে, তাঁর মৃত্যুর পরও এই প্রতিষ্ঠানগুলির স্বাভাবিক চলা বন্ধ হয়নি। একই বৎসরে ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের দুই প্রধান সংগঠকের মৃত্যু হওয়ায় কলেজের ক্ষতি হল সবচেয়ে বেশি।

চিকিৎসক গ্রন্থকার

অনেকের ধারণা পাঠ্যপুস্তক রচনা করায় কোনো কৃতিত্ব নেই, কারণ অনেক সময়েই অপরের তত্ত্ব ও সংগৃহীত তথ্য সন্নিবিষ্ট করে পাঠ্যপুস্তক রচনা করা হয়। একথা যদি সত্য হত, তবে প্রচলিত সমস্ত পাঠ্যপুস্তকেরই সমান কদর হত। কিন্তু তা হয় না। বরং কোনো বিশেষ পুস্তকেরই চাহিদা ছাত্রদের কাছে বেশি। এর কারণ হচ্ছে, পাঠ্যপুস্তক যেমন বিষয়বস্তুতে সমৃদ্ধ হবে, তেমনি বিন্যাসের প্রণালীও বিশিষ্ট হতে হবে, যাতে ছাত্রদের কাছে সহজবোধ্য হয়, সুখপাঠ্য হয়। পাঠ্য পুস্তকের ভাষা এমন হওয়া চাই, যা সহজ এবং সাবলীল। পড়তে পড়তে যদি বারবার হোঁচট খেতে হয় তবে সে বই কেউ পড়বে না।

আগেকার দিনে আমাদের দেশে যে সব ইংরেজি বিজ্ঞানপুস্তক প্রচলিত ছিল সেগুলি বিদেশীদের লেখা। চিকিৎসা-বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থগুলিও বিদেশীদের দ্বারা রচিত। সে সময়ে ইংরেজিতে দেশীয় লোকদের চিকিৎসা-বিজ্ঞানের গ্রন্থ রচনা করা দুঃসাহসের ব্যাপার। বর্তমানে অবশ্য দেশীয় লোকদের দ্বারা রচিত বহু ইংরেজি গ্রন্থ প্রচলিত আছে। প্রথম যেসব বাঙালী ইংরেজিতে চিকিৎসাশাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন, তাঁদের মধ্যে রাখালদাস ঘোষ, বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ এবং মৃগেন্দ্রলাল মিত্রের নাম প্রথমেই মনে আসে। কিছুকাল পরে আরো যেসব বই প্রকাশিত হয়, সেগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কালিপদ দাসের লেখা সার্জারি বই এবং কালিধন চট্টোপাধ্যায়ের প্যারাসাইটোলজি (Parasitology) বই। এই দুইজনের লেখা বই শুধু ভারতে নয়, ভারতের বাইরেও বিভিন্ন দেশে আদৃত হয়ে আসছে। চিকিৎসাশাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ রচনায় বাঙালী চিকিৎসকরা বহুদিন থেকেই উৎসাহী। মেডিকেল কলেজের শিক্ষক মধুসূদন গুপ্ত হুপারের *Anatomist Vademecum* সংস্কৃতে অনুবাদ করেন, প্রকাশিত হয় ১৮৩৫ সালে। পরে ১৮৪৯ সালে প্রকাশিত হয় 'লণ্ডন ফার্মাকোপি-

য়ার' অর্থাৎ ওষুধ কল্পাবলীর বাংলা অনুবাদ। ১৮৫২ সালে প্রকাশ করেন 'এনাটমী বা শারীর বিদ্যা' শীর্ষক বাংলা গ্রন্থ। মধুসূদনের রচনা সুখপাঠ্য ছিল না বটে, তবে তিনি ছিলেন এ ব্যাপারে পথিকৃৎ।

দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থগুলির মান নির্ণয়ের জন্য ডাঃ সূর্যকুমার চক্রবর্তী এবং ডাঃ কোলসকে নিয়ে ১৮৬৭ সালে একটি কমিটি গঠিত হয়। তাঁরা দুর্গাদাস কর রচিত 'মেটিরিয়া মেডিকা' ছাড়া আর কোনো গ্রন্থ অনুমোদনের যোগ্য বলে বিবেচনা করেননি।

সে সময়ে অন্য যেসব গ্রন্থ প্রচলিত ছিল, সেগুলি হল পি. কুমারের 'ঔষধ ব্যবহারক' (১৮৫৪), এস. সি. কর্মকারের 'ঔষধ প্রস্তুত বিদ্যা' (১৮৫৪), রামনারায়ণ দাসের 'সার্জারি' বা 'অস্ত্রচিকিৎসা প্রণালী', প্রসন্নকুমার মিত্রের 'বাল চিকিৎসা' (১৮৬২) ইত্যাদি।

কাশীচন্দ্র দত্তগুপ্ত লিখিত 'অস্ত্রচিকিৎসা প্রণালী' একটি সম্পূর্ণ গ্রন্থ (১৮৭৩)। ডাঃ দত্তগুপ্ত সরকারী টিকাবিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। সে সময়কার অধিকাংশ গ্রন্থ রচয়িতার ভাষাই ছিল দুর্বোধ্য। ডাঃ দত্তগুপ্তর রচনা এই দোষ থেকে মুক্ত।

ক্রমে আরো বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলের ধাত্রীবিদ্যা, স্ত্রীচিকিৎসা ও শিশুচিকিৎসার শিক্ষক মীর আসরাফ আলি রচনা করেন 'বাল চিকিৎসা'। ধাত্রীবিজ্ঞান বিষয়ে প্রথম গ্রন্থ রচনা করেন ডাঃ যদুনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনি লেখেন 'ধাত্রীশিক্ষা এবং প্রসূতি শিক্ষা'। গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ও লেখেন ধাত্রীবিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থ 'চিকিৎসা প্রকরণ এবং চিকিৎসা-তত্ত্ব'। অন্নদাচরণ খাস্তগির অনেক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। সেগুলির মধ্যে 'মানব জন্মতত্ত্ব,' 'ধাত্রী-বিদ্যা,' এবং 'নবপ্রসূত শিশুর পীড়া ও চিকিৎসা' এবং 'স্ত্রীজাতির ব্যাধি সংগ্রহ'(২য় সংস্করণ—১৮৭৮) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ—আয়ুর্বর্দ্ধন, শরীর রক্ষণ, পারিবারিক সুস্থতা। ডাঃদুর্গাদাস কর 'ভৈষজ্য-রত্নাবলী' ব্যতীত আরও একটি পুস্তক রচনা করেছিলেন, তার নাম 'ভিষগবন্ধু'। কিন্তু বইটি প্রকাশিত হবার অগেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর পুত্র রাধাগোবিন্দ করের উদ্যোগে পরে এটি প্রকাশিত হয়।

রাধাগোবিন্দ কর নিজেও লেখেন 'সংক্ষিপ্ত ভৈষজ্যতত্ত্ব বা মেটিরিয়া মেডিকা সার সংগ্রহ' (২য় সং, ১৮৯৭) এবং 'ভিষক-সুহৃদ' (৪র্থ সং, ১৮৯৫), জাহিরুদ্দীন আহ্‌মেদ লেখেন 'সার্জারি' বা 'অস্ত্রচিকিৎসা' (২য় সংস্করণ, ১৮৯৩)। জাহিরুদ্দীন একটি পত্রিকাও সম্পাদনা করতেন —'ভিষক্ দর্পণ'। সুন্দরীমোহন দাসের লেখা 'স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান' প্রকাশিত হয় ১৮৯৬ সালে।

খাদ্য-বিষয়ে প্রথম গ্রন্থ রচনা করেন ভুবনচন্দ্র বসাক। তাঁর রচিত 'খাদ্যবস্তুর দ্রব্যগুণ' প্রকাশিত হয় ১৮৮৫ সালে। দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লেখেন 'খাদ্য বিচার'। (বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, বঙ্গ সাহিত্যে বিজ্ঞান)

উপরে উল্লিখিত সব গ্রন্থের দোষ এই যে ভাষা বড় নীরস, সাহিত্যগুণ তাতে নেই। বাগবাজার সাহিত্যসভার গ্রন্থবিভাগ কর্তৃক ১৯১০ সালে প্রকাশিত হল 'খাদ্য' শীর্ষক একটি গ্রন্থ। ভাষার দিক থেকে, বিষয়বস্তুর দিক থেকে বইটি অভিনব। প্রকাশিত হওয়ামাত্র বইটি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। লেখক বিখ্যাত বিজ্ঞানী মেডিকেল কলেজের রসায়নবিভাগের ডাঃ চুনিলাল বসু। বিজ্ঞান বিষয়ে এমন মনোজ্ঞ গ্রন্থ আগে আর প্রকাশিত হয়নি। তাঁর অন্য কয়েকটি গ্রন্থের নাম 'শারীর স্বাস্থ্য-বিধান' (১৯১৩), 'পল্লীস্বাস্থ্য' (১৯১৬), 'স্বাস্থ্য পঞ্চক' (১৯১৮)। চুনিলাল বসু বাংলায় মোট তেরটি এবং ইংরেজিতে বারোটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। বিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থ ছাড়াও তিনি রচনা করেছিলেন ভ্রমণকাহিনী, রস-রচনা। পরবর্তীকালে ডাঃ রুদ্রেন্দ্র-কুমার পাল ছাড়া আর কেউ বাংলায় চিকিৎসা-বিজ্ঞান বিষয়ে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করেননি।

আগেকার দিনে সবচেয়ে বিখ্যাত জার্নাল ছিল 'ইণ্ডিয়ান মেডিকেল গেজেট'। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৬৬ সালে। এতে সূর্যকুমার চক্রবর্তী, অন্নদাচরণ খাস্তগির, কানাইলাল দে, জগবন্ধু বসু, গোপাল-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নিয়মিত প্রবন্ধ লিখতেন। সূর্যকুমার 'বেথুন সোসাই-টি'র আলোচনা-সভায় কলকাতার জনস্বাস্থ্য, বাঙালী জাতির শারীরিক

ও মানসিক শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে বহু বক্তৃতা দেন। সেই সব বক্তৃতা প্রকাশিত হয় ১৮৭০ সালে *'Popular Lectures On Subjects of Indian Interest'* শীর্ষক গ্রন্থে। কানাইলাল দে দেশীয় ওষুধের উপর বিরাট গ্রন্থ লেখেন—*'Indigenous Drugs of India* এই নামে। কেদারনাথ দাসের তিনটি বিখ্যাত গ্রন্থ—*Handbook of Obstetrics* (১৯১৪), *Textbook of Midwifery* (১৯২০) এবং *Obstetrics Forceps* (১৯২৮)। উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর *Kala-azar: Its Treatment* (১৯১৭), *'A Treatise on Kala-azar'* (১৯২৮), *'Gleanings from My Researches'* (১৯৪০) গবেষকদের অবশ্য পাঠ্য।

ডাঃ রাখালদাস ঘোষ ১৯০১ সালে ভেষজ-বিজ্ঞানের গ্রন্থ *A Treatise On Pharmacology, Materia Medica*-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন। তিনি ছিলেন কলেজ অব ফিজিসিয়ন অ্যাণ্ড সার্জন-এর ওষুধ বিজ্ঞানের অধ্যাপক। মেটেরিয়া মেডিকা একটি 'শুষ্ক' বিষয়, ছাত্ররা মোটেই পড়তে চায় না, অথচ অত্যন্ত দরকারি বিষয়। এই বিষয় নিয়ে বই লেখা দুঃসাহসের পরিচয়। তার উপর ইংরেজিতে। কিন্তু ডাঃ ঘোষের বই বের হওয়া মাত্র ছাত্ররা লুফে নিল। এমনকি আই. এম. এস. অফিসাররা পর্যন্ত বইটির প্রশংসা করতে লাগলেন।

রাখালদাসের জন্ম ১৮৫১ সালে। বাড়ি ছিল বালিতে। স্কুলের পড়াশুনা সেখানেই শেষ হয়। ১৮৭০ সালে ভর্তি হন কলকাতার মেডিকেল কলেজে। বালি থেকে রোজ ক্লাশ করতে আসতেন মেডিকেল কলেজে। ১৮৭৫ সালে এল. এম. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সরকারী কাজে যোগ দেন। পাঁচ বছর পর কাজে ইস্তফা দেন এবং প্র্যাকটিস শুরু করেন বৌবাজারে। খুব দ্রুত তাঁর পসার বেড়ে যায়। তাঁর এতই নাম হয়েছিল যে মথুরার মহারাজা তাঁকে দিয়ে চিকিৎসা করিয়েছিলেন। কিছুদিন রামকৃষ্ণদেবেরও চিকিৎসা করেছিলেন ডাঃ ঘোষ। প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন। কলেজ স্ট্রীটের উপর কয়েকটি বাড়ি তৈরি করেছিলেন। ১০৯ নম্বর কলেজ স্ট্রীটের বাড়িতে তিনি থাকতেন, নিচের

তলায় ছিল তাঁর ডিস্‌পেন্সারি। এই বাড়িতেই হিল্‌টন কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে ওষুধের ব্যবসা শুরু করেন। পরে একটি প্রকাশনা বিভাগও খোলেন। প্রথম বই প্রকাশিত হয়—'*Free masonry, the Master Mason's Guide*'। ডাঃ ঘোষের ফার্মাকোলজি বইটিও প্রকাশিত হয় হিল্‌টন কোম্পানি থেকে। হিল্‌টন কোম্পানি এখনো ঐ বাড়িতেই রয়েছে এবং ডাঃ ঘোষের বংশধরেরা প্রকাশনা বিভাগ চালু রেখেছেন।

রাখালদাস 'A Treatise on Pharmacology, Materia Medica'-র দ্বিতীয় খণ্ড লেখা প্রায় শেষ করে এনেছিলেন। ১৯০২ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় খণ্ডটির সম্পাদনা করেন মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ কর্ণেল লুকিস। প্রকাশিত হয় ১৯০৩ সালে। দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় লুকিস লিখেছেন—

> 'যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধিতে দীর্ঘকাল ভুগে গত আগষ্ট মাসে ডাঃ রাখালদাস ঘোষের মৃত্যু হয়েছে। অকাল মৃত্যুর ফলে তিনি তাঁর গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশিত রূপ দেখে যেতে পারলেন না। তিনি পাণ্ডুলিপি প্রায় সম্পূর্ণ করে এনেছিলেন। শেষ সময়ে তাঁর মুখে শুধু একটি কথাই শোনা যেত, 'আমার বই যেন বের হয়।' সেজন্যই আমি বইটি সম্পাদনা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলাম এবং এখন এটি সাধারণের হাতে তুলে দিতে পেরে আনন্দ বোধ করছি। ···এই ছোট দুটি খণ্ডে ছাত্ররা যে শুধু ওষুধ বিজ্ঞানের জ্ঞাতব্য সব তথ্যই পাবে, তাই নয়, ডাঃ ঘোষের নিজের দীর্ঘদিনের চিকিৎসার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধেও জানতে পারবে। যারা পূর্বাঞ্চলে চিকিৎসা করতে ইচ্ছুক তাদের জন্য আমি দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে এই বইটি সুপারিশ করতে পারি।'

স্যার লুকিসের মতো ব্যক্তি ডাঃ ঘোষের বইটির সম্পাদনা করতে রাজী হওয়ায় এই প্রমাণিত হয় যে বইটি নিতান্ত সাধারণ নয়। লুকিস দুখণ্ড মিলিয়ে বইটিকে এক খণ্ডে প্রকাশ করেন, দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে। ১৯১০ সালে চতুর্থ সংস্করণ সম্পাদনার দায়িত্ব নেন মেডিকেল কলেজেরই

মেটেরিয়া মেডিকার অধ্যাপক (পরে অধ্যক্ষ) জে. জে. কেলভার্ট। ১৯১৩ সালে পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হয় কর্ণেল ডিয়ারির সম্পাদনায়। তার পর থেকে অর্থাৎ ১৯১৫ সালে প্রকাশিত ষষ্ঠ সংস্করণ থেকে বইটির সম্পাদনা করেন রাখালদাসের পুত্র ডাঃ বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, প্রথম দিকে ডিয়ারির সঙ্গে, পরে ১৯২৫ সালের দশম সংস্করণ থেকে একা। ডাঃ বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ যখন গ্রন্থটি সম্পাদনা করার দায়িত্ব নিজের হাতে নেন, তখন ভেষজ-বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতি হচ্ছে, নিত্যনূতন চমকপ্রদ ওষুধ আবিষ্কৃত হচ্ছে। বীরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে গ্রন্থটির সম্পাদনা করেন। সেজন্য এর জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বেড়ে চলে। বীরেন্দ্রনাথের হাতে ১৯৫২ সালে বইটির ঊনবিংশ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। এরপর থেকে পরিবারিক ভাগাভাগির দরুন বইটির প্রকাশ-নার দায়িত্ব তাঁর হাত থেকে চলে যায়। এখনো রাখালদাসের বই প্রকাশিত হচ্ছে হিল্‌টন কোম্পানি থেকে এবং এর জনপ্রিয়তা এখনো অক্ষুণ্ণ।

ডাঃ বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের একটি গ্রন্থ রচনা করেন ১৯১২ সালে, ডাঃ জহরলাল দাসের সঙ্গে যুগ্মভাবে। ডাঃ দাস বীরেন্দ্র-নাথের সহপাঠী ছিলেন। গ্রন্থটির রচনাকালে তিনি পাটনা শহরের হেল্‌থ অফিসার ছিলেন। পরে ডাঃ দাস কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। মনো-মালিন্যের দরুন ডাঃ দাস এই বইটির সংশ্রব ত্যাগ করেন। তখন থেকে ডাঃ ঘোষ একাই বইটির রচয়িতা হিসাবে পরিচিত হন। ডাঃ দাসও একা একটি বই লিখেছিলেন, কিন্তু বইটি তেমন চলেনি। ফার্মাকোলজির অধ্যাপকের পক্ষে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বই লেখা কিছুটা আশ্চর্যের বটে!

বর্তমানে 'হাইজিন' বলে কোনো বিষয় মেডিকেল কলেজে পড়ানো হয় না। পরিবর্তে পড়ানো হয় হাইজিনের চেয়ে অনেক ব্যাপক বিষয়বস্তু, প্রিভেনটিভ অ্যাণ্ড সোস্যাল মেডিসিন। রোগ হলে রোগীর চিকিৎসা হয়, সাধারণ লোকের কাছে এটাই স্বাভাবিক রীতি। তাদের কাছে

রোগ থেকে মুক্ত থাকার উপায়গুলি তত জরুরী নয়। জীবাণু এবং রোগী এই দুটি ছাড়াও এমন অনেক অবস্থা আছে, যেগুলির উপর রোগ হওয়া, না-হওয়া নির্ভর করে। ধরা যাক ম্যালেরিয়ার কথা। ম্যালেরিয়া রোগীর সঙ্গে বাস করলেও ম্যালেরিয়া হবে না, যদি না মশা ম্যালেরিয়ার জীবাণু একজনের শরীর থেকে নিয়ে দশ বার দিন পর আরেকজনের শরীরে তা ঢুকিয়ে দেয়। আবার, বসন্ত রোগ ছড়ায় রোগীর সান্নিধ্যে এলে। কিন্তু একথা সকলের জানা, বসন্তের টিকা নেওয়া থাকলে বসন্ত রোগ হতে পারে না। কারণ, টিকা দেওয়ার ফলে শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে যথেষ্ট। হুকওয়ার্ম ক্রিমির জন্য হয় রোগ। হুকওয়ার্মে ভুগছে এমন রোগীকে চিকিৎসক চিকিৎসা করেন বটে, কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই আবার সে আক্রান্ত হয়। কেন? কারণ গ্রামের মানুষ সাধারণত যেখানে সেখানে মলত্যাগ করে এবং হুকওয়ার্মের ক্রিমি চামড়ার ভিতর দিয়ে লোকের শরীরে প্রবেশ করে। সেজন্য হুকওয়ার্ম থেকে রেহাই পেতে হলে দরকার যেখানে সেখানে মলত্যাগের অভ্যাস ত্যাগ করা। আবার এমন রোগও অনেক আছে, যাদের জন্য কোনো জীবাণু দায়ী নয়—যেমন, হৃদ্‌রোগ, ক্যান্সার, মানসিক ব্যাধি প্রভৃতি। এই সব রোগের কারণগুলি ছড়িয়ে আছে প্রাকৃতিক আবহাওয়ায়, সামাজিক অবস্থায়, আহারে, আচরণে এবং আরো বহু জানা-অজানা বস্তুতে।

ডাঃ বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ ছিলেন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি যখন এই বই লেখেন তখন মেডিকেল কলেজগুলিতে 'হাইজিন' সবচেয়ে অবহেলিত বিষয়। হাইজিনের শিক্ষক পাওয়া ছিল দুষ্কর, কারণ হাইজিনের শিক্ষক শিক্ষকমহলে সবচেয়ে অবজ্ঞাত ব্যক্তি। ছাত্ররা কদাচিৎ কোনো হাইজিন বই পড়ত, কলেজের নোটই ছিল একমাত্র সম্বল। মেডিসিন, সার্জারি, মিডওয়াইফারি—এই সব বিষয়েই ছাত্রদের উৎসাহ। আজ দিনকাল পাল্টেছে। এখন প্রিভেন্টিভ মেডিসিনের শিক্ষকরা আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। মেডিসিন, সার্জারি, মিডওয়াইফারি এখন প্রিভেন্টিভ মেডিসিন ছাড়া চলে না। ডাঃ ঘোষ অনেক আগেই

বুঝতে পেরেছিলেন চিকিৎসকদের দৃষ্টি স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের দিকে একদিন না একদিন ফিরবেই।

১৯৫৩ সালে এই বই-এর ত্রয়োদশ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই থেকে প্রমাণিত হয় এর জনপ্রিয়তা কত। স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের বইটির ভূমিকায় বিখ্যাত শল্যচিকিৎসক কেনেথ মেকলিয়ড লিখেছিলেন :

> 'বিষয়বস্তুর সুন্দর বিন্যাস ও স্বচ্ছ বর্ণনা করার ক্ষমতা ডাঃ বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ উত্তরাধিকারসূত্রে পিতার কাছ থেকে লাভ করেছেন। তাঁর পিতা ডাঃ রাখালদাস ঘোষের এই ক্ষমতাছিল অসামান্য। একটি নিষ্ঠাবান এবং বুদ্ধিদীপ্ত সহকারীর আনন্দ-স্মৃতি এখনও বহন করছি।'

মেডিকেল কলেজের ডাঃ কানাইলাল দে এবং পরে স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের ডাঃ রামনাথ চোপরা এদেশের গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন দেশীয় গাছ-গাছড়ার দিকে। ডাঃ চোপরার গবেষণার ফলে বহু উদ্ভিদজাত ওষুধের রাসায়নিক ক্রিয়া জানা সম্ভব হয়। ডাঃ চোপরা গবেষকদের কাছে প্রেরণাস্বরূপ। ডাঃ ঘোষও চোপরার পথেই অগ্রসর হয়েছিলেন। আয়ুর্বেদমতে অর্জুন গাছের এবং অশোক গাছের ছালের ব্যবহার হয়ে থাকে। ডাঃ ঘোষই প্রথমে এই দুটি গাছের বাকল পরীক্ষা করে রাসায়নিক বিশ্লেষণ করেন।

বীরেন্দ্রনাথের জন্ম কলকাতায় ১৮৮২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি। স্কুলের পড়াশুনা মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে। এণ্ট্রান্স পাশ করার পর আসেন সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে। এখান থেকে পাশ করেন এফ. এ.। এর পর তিনি ভর্তি হন কলকাতা মেডিকেল কলেজে। বীরেন্দ্রনাথ নিজে গল্প করেছেন, তিনি জীবনে একবার মাত্র তাঁর পিতাকে হাসতে দেখেছিলেন। রাখালদাস ছিলেন ভীষণ গম্ভীর প্রকৃতির এবং কড়া মেজাজের। ছেলেবেলা থেকে দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে তাঁকে বড় হতে হয়েছে। পরবর্তীযুগে অবশ্য তিনি উপার্জন করেছেন প্রচুর অর্থ, কলকাতায় বাড়ি করেছেন কয়েকটি, আত্মীয় অনাত্মীয় বহু লোককে সাহায্য করেছেন, আশ্রয় দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর মুখে হাসি কেউ কখনো

দেখেনি। রাখালদাসের তিন পুত্র। জ্যেষ্ঠ সুরেন্দ্রনাথ, মধ্যম বীরেন্দ্রনাথ এবং কনিষ্ঠ শৈলেন্দ্রনাথ। রাখালদাস একদিন ছেলেদের জিজ্ঞাসা করলেন, তাদের মধ্যে কেউ ডাক্তারি পড়তে চায় কিনা। একমাত্র বীরেন্দ্রনাথই ডাক্তারি পড়তে চাইলেন। শুনে রাখালদাস একটু হাসলেন।

১৯০৭ সালে বীরেন্দ্রনাথ এল. এম. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। যোগ দিলেন বেলগাছিয়ার 'ক্যালকাটা মেডিকেল্ স্কুল অ্যাণ্ড কলেজ অব ফিজিশিয়ন অ্যাণ্ড সার্জন অব বেঙ্গল'-এ মেটেরিয়া মেডিকার শিক্ষক হিসাবে। এল. এম. এস. পাশ করার পর তিনি প্রণাম্ করতে গিয়েছিলেন ডাঃ রাধাগোবিন্দ করকে। ডাঃ কর আশীর্বাদ করে বললেন, 'বাপের নাম রাখা চাই।' পরক্ষণেই বললেন, 'চাকরি করবে? যদি কর, কাল থেকে এসে যোগ দাও স্কুলে।' চাকরি হয়ে গেল। এখানেই কাটালেন সারাটা কর্মজীবন। ১৯১৪ সালে তিনি গেলেন ইংল্যাণ্ডে। লণ্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজে অধ্যাপক ক্রাশনির(Prof. Crushney) অধীনে কাজ করার সুযোগ পেলেন। অধ্যাপক আর্থার রবার্টসন ক্রাশনি ভেষজ-বিজ্ঞানে একটি বিখ্যাত নাম। রক্ত সংবহন, বৃক্ক প্রভৃতির উপর কার্যকরী অনেক ওষুধ তিনি আবিষ্কার করেন। ডাঃ ঘোষ এই বিশ্বখ্যাত বৈজ্ঞানিকের সাহচর্যে এসে গবেষণার প্রতি গভীর-ভাবে আকৃষ্ট হন। লণ্ডন থেকে গেলেন গ্লাসগোর রয়াল ইন্‌ফার্মারিতে এবং সেখান থেকে ডাবলিনের কুম্‌বে হাসপাতালে। ডাবলিনে এল. এম. ডিপ্লোমা লাভ করলেন এবং ১৯১৫ সালে পেলেন এফ. আর. এফ. পি. এস. উপাধি।

দেশে ফিরে এসে ডাঃ ঘোষ বেলগাছিয়ার মেডিকেল স্কুল ও কলেজে মেটেরিয়া মেডিকার অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হলেন। ১৯১৬ সালে এই স্কুল পূর্ণাঙ্গ কলেজরূপে পরিগণিত হয়, নাম হয় বেলগাছিয়া মেডিকেল কলেজ। ১৯১৯ সালে কলেজের পরিবর্তিত নাম হয় কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ। এই কলেজের প্রথম্ যুগে যে সব চিকিৎসক কাজ করেছেন, তাঁদের প্রত্যেকেই ছিলেন নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বনামধন্য।

তাঁদের অনেক স্বার্থত্যাগ করতে হয়েছে। অধ্যাপকদের প্রায় সবাই ছিলেন অবৈতনিক। ডাঃ ঘোষও কলেজ থেকে পেতেন যৎসামান্য পারিশ্রমিক। চিকিৎসক হিসাবে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালের চিকিৎসক এবং মেকলিয়ড কোম্পানির প্রধান চিকিৎসক হিসাবে কাজ করেছেন বহু বছর। কিন্তু ভেষজ-বিজ্ঞানই ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বিষয় এবং কারমাইকেল মেডিকেল কলেজই ছিল তাঁর প্রকৃত কর্মক্ষেত্র। বর্তমান আর. জি. কর মেডিকেল কলেজের ফার্মাকোলজি বিভাগ কলেজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিভাগ। এর প্রতিটি জিনিস ডাঃ ঘোষের নিজের হাতে গড়া। তিনি যে শুধু নিজেই গবেষণা করতেন তাই নয়, অনেক তরুণ মেধাবী ছাত্রকেও উদ্বুদ্ধ করেছেন গবেষণায়।

ভারতবর্ষে ভেষজ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রায় সব ব্যাপারেই ডাঃ ঘোষ জড়িত ছিলেন। ওষুধপ্রস্তুতপ্রণালী শিক্ষা দেবার গ্রন্থ রচনার জন্য ১৯৪৮ সালে একটি 'ফার্মাকোপিয়া কমিটি' গঠিত হয়। ডাঃ ঘোষকে এই কমিটির সভাপতি নিযুক্ত করা হয়। প্রতি দেশেরই পৃথক ফার্মাকোপিয়া থাকে। ইয়োরোপীয় চিকিৎসার প্রথম ফার্মাকোপিয়া রচিত হয় ইতালী ও স্পেনে। লণ্ডন ফার্মাকোপিয়ার জন্ম ১৬১৮ সালে। এডিনবরায়, ডাবলিনে আলাদা ফার্মাকোপিয়া প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৬৯৯ এবং ১৮০৭ সালে। ১৮৬৪ সালে ব্রিটেনের সর্বত্র ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়া চালু হয়। আমেরিকায় প্রথম ফার্মাকোপিয়া প্রকাশিত হয় ১৮২০ সালে।

ভারতে প্রথম ফার্মাকোপিয়া প্রকাশিত হয় ১৮৩৪ সালে 'বেঙ্গল ফার্মাকোপিয়া' নামে। ১৯০০ সালে ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়ার (১৮৯৮) পরিশিষ্ট হিসাবে এটি যুক্ত হয়। ডাঃ ঘোষের উৎসাহে এবং সভাপতিত্বে ১৯৫৫ সালে গোটা ভারতের প্রথম ফার্মাকোপিয়া প্রকাশিত হয়।

মেডিকেল কাউন্সিল অব ইণ্ডিয়া মেডিকেল কলেজগুলিতে ভেষজ-বিজ্ঞানের পাঠ্যক্রম নির্ধারণের জন্য যে কমিটি নিয়োগ করেছিলেন, ডাঃ ঘোষ তারও সভাপতি ছিলেন।

ডাঃ ঘোষ ১৯৩৭ সালে এম. বি. ই. অর্থাৎ 'মেম্বর অব ব্রিটিশ এম্পায়ার' উপাধি লাভ করেন এবং ১৯৩৯ সালে এডিনবরা রয়েল সোসাইটির 'ফেলো' নির্বাচিত হন। ১৯৫৭ সালের ৩রা নবেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

ডাঃ ঘোষের তিন পুত্র এবং এক কন্যা। পুত্রদের মধ্যে দুজন চিকিৎসক। এক পুত্র ডাঃ মণীন্দ্রনাথ ঘোষ পণ্ডিচেরী মেডিকেল কলেজে ফার্মাকোলজির অধ্যাপক। তিনিও একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন—*Fundamentals of Experimental Pharmocology.* বীরেন্দ্রনাথ পিতার মুখে একবার হাসি দেখেছিলেন, কিন্তু তাঁর পুত্রেরা তাঁর মুখে কতবার হাসি দেখেছেন বলা কঠিন। বীরেন্দ্রনাথ পিতার মতই তেজদীপ্ত এবং গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন। ছাত্ররা, গবেষকরা তাঁকে যেমন শ্রদ্ধা করতেন, তেমনি ভীষণ ভয় করতেন, কারণ তিনি কর্তব্যে অবহেলা সহ্য করতে পারতেন না।

এই শতকের গোড়ার দিকে কলকাতার দুজন শল্যচিকিৎসকের নাম সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে রোগীরা আসত—এই দুজনের একজনকে দিয়ে অপারেশন করাবার জন্য। এঁরা হলেন, সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারী এবং মৃগেন্দ্রলাল মিত্র। সুরেশপ্রসাদ ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ডি.। মৃগেন্দ্রলাল ছিলেন এডিনবরার এফ. আর. সি. এস.।

মৃগেন্দ্রলালের জন্ম ১৮৬৭ সালের ২৭শে মে, বর্ধমান জেলার কাইতি গ্রামে। শৈশবেই তাঁকে চলে যেতে হয় পাঞ্জাবে, সেখানে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সরকারী কাজে নিযুক্ত ছিলেন। পড়াশুনা করেন পাঞ্জাবে। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৮৯১ সালে এল. এম. এস. উপাধি লাভ করেন। এরপর যোগ দেন সরকারী কাজে। প্রথমে কাজ করেন মধ্যভারতে। ১৮৯৫ সালে আসেন কলকাতায়, মেডিকেল কলেজের এজরা হাসপাতালে হাউস-সার্জন হিসাবে কাজ করেন কিছুকাল। তারপর তাঁকে কাজ করতে হয় বিভিন্ন জেলা হাসপাতালে। ১৯০০

সালে ফিরে আসেন কলকাতায়। এবার ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলের শস্ত্রচিকিৎসার শিক্ষক নিযুক্ত হলেন। এতদিন মৃগেন্দ্রলালের জীবন কেটেছে অন্যান্য চাকরিজীবীদের মতো গতানুগতিকতার মধ্য দিয়ে। এবার এল এক পরিবর্তনের ঢেউ। ১৯০৫ সালে সাগর পাড়ি দিলেন। উদ্দেশ্য, এফ. আর. সি. এস. করা। সে সময়ে তাঁর বয়স ৩৮। এই বয়সটা পড়াশুনার পক্ষে খুব অনুকূল নয়, তার উপর কালাপানি পার হয়ে যাওয়া। বিধানচন্দ্র রায় মৃগেন্দ্রলালের তিন বছর পর ইংল্যাণ্ডে গিয়েছিলেন, তখন তিনি ২৬ বছরের যুবক। তবে মনোবল এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞা থাকলে বয়স কোনো গুরুতর সমস্যা নয়। মৃগেন্দ্রলাল তা প্রমাণ করলেন। অল্পদিনের মধ্যে এডিনবরার এফ. আর. সি. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। ব্রাসেলস থেকে লাভ করলেন এম. ডি. ডিগ্রি।

দেশে ফিরে এসে তিনি ক্যাম্পবেল স্কুলের আগেকার পদেই কাজ করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁকে অন্যায়ভাবে বদলি করা হল ডায়মণ্ডহারবারের এক ডিস্‌পেন্সারিতে। বদলির কারণ, কলকাতায় জনৈক বিখ্যাত ব্যক্তির জামাতা ফিরে এসেছেন বিলাত থেকে, তাঁকে ডাঃ মিত্রের জায়গায় বসিয়ে দেওয়া হল। ডাঃ মিত্র ডায়মণ্ডহারবারে গেলেন বটে তবে শীঘ্রই পদত্যাগ করলেন। ১৯০৮ সালে যোগ দিলেন 'ক্যালকাটা মেডিকেল স্কুল অ্যাণ্ড কলেজ অব ফিজিসিয়ন অ্যাণ্ড সার্জন'-এ। এই প্রতিষ্ঠানটিকে কলেজে পরিণত করায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভে রাধাগোবিন্দ কর, সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারী এবং নীলরতন সরকারের মতো মৃগেন্দ্রলালের উদ্যমও কম ছিল না। ১৯২১ সালে সুরেশপ্রসাদের মৃত্যু হলে, মৃগেন্দ্রলাল কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে শস্ত্র-চিকিৎসার অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত হন। কয়েকবার কলেজের অধ্যক্ষপদেও তিনি অস্থায়ীভাবে কাজ করেছিলেন।

ডাঃ মিত্র কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ছাড়া যুক্ত ছিলেন আমহার্স্ট স্ট্রীটের বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী মারওয়াড়ী হাসপাতাল এবং কাশীপুরের নর্থ সুবার্বন হাসপাতালের সঙ্গে। বলা বাহুল্য তাঁর

পসার ছিল বিরাট! প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন তিনি। তাঁর কাছ থেকে অর্থ সাহায্য পেত বহু লোক, বিশেষ করে ছাত্ররা। ছাত্রদের নিকট তাঁর গৃহের দ্বার ছিল অবারিত। বহু ছাত্র তাঁর সাহায্য লাভ করেছে। সেই সাহায্য তিনি দিতেন খুব গোপনে। রোগীদের বেলাতেও তিনি ছিলেন খুব সহানুভূতিশীল। যদি টের পেতেন, কোন রোগীর পয়সা দেবার সামর্থ্য নেই, তবে তাঁর কাছ থেকে 'ভিজিটের' টাকা নিতেন না। বস্তির দরিদ্র লোকদের মধ্যে তিনি এবং তাঁর স্ত্রী দুজনেই সেবাকার্য করতেন।

মৃগেন্দ্রলাল শিক্ষক হিসাবে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর ক্লাশের বক্তৃতাগুলি ছিল খুব চিত্তাকর্ষক। এই বক্তৃতাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। তখনকার যুগে শস্ত্র-চিকিৎসার সব পুস্তকই ছিল বিখ্যাত ব্রিটিশ বা আমেরিকান চিকিৎসকদের লেখা। মৃগেন্দ্রলালের গ্রন্থ *Essentials of Surgery* দুইখণ্ডে লিখিত। গ্রন্থটি যে ছাত্রমহলে সমাদৃত হয়েছিল তার প্রমাণ ১৯৩২ সালে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বাংলাতেও 'শস্ত্রচিকিৎসার' একটি গ্রন্থ তিনি রচনা করেন।

সার্জন বললেই ছুরি, কাঁচি, অপারেশন টেবিল, ক্লোরোফর্মের গন্ধ, গায়ে সাদা অ্যাপ্রন্, মুখোশ-পরা কয়েকটি লোকের ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সেই সার্জনই গভীর রাত পর্যন্ত বসে বসে সার্জারির বই লিখছেন—তাও অস্বাভাবিক মনে হয় না। কিন্তু যদি বলা হয়, সার্জন নিভৃতে বসে উপন্যাস রচনা করছেন, তবে অনেকের কাছেই তা অবিশ্বাস্য মনে হবে। অবিশ্বাস্য মনে হলেও মৃগেন্দ্রলাল সত্যি সত্যি একটি উপন্যাস লিখেছিলেন। তাঁর রচিত উপন্যাস 'মুক্তিপথ' এক বিরাট সাহিত্যকীর্তি না হতে পারে, কিন্তু তা সাহিত্য-রসপুষ্ট সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

ডাঃ মিত্র ব্যবসাতেও নেমেছিলেন। এ বিষয়ে অবশ্য নীলরতন সরকারই পথপ্রদর্শক। Lister Antiseptic and Dressing Co নামে তিনি অপারেশনে ব্যবহার্য ড্রেসিং-এর একটি ব্যবসা খোলেন।

আধুনিক ড্রেসিং-এর সরঞ্জাম সম্বন্ধে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য ১৯১৯ সালে আবার তিনি ইংল্যাণ্ডে যান। কিন্তু ব্যবসাতে তাঁর প্রচুর লোকসান হয়, এমনকি পার্ক সার্কাসের বাড়িটিও বিক্রি করে দিতে হয়।

ডাঃ মিত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' ছিলেন কয়েক বছর। কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের পরিচালন-সমিতিরও সদস্য ছিলেন।

১৯৩৪ সালের ৫ই অক্টোবর ডাঃ মিত্রের মৃত্যু হয়। লাহোরে থাককেই তাঁর বিবাহ হয়, সেখানকার বিখ্যাত ব্রাহ্মনেতা অবিনাশচন্দ্র মজুমদারের কন্যার সঙ্গে। স্ত্রীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন—স্বনামধন্য ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষের কন্যা হেমলতা দেবীকে। হেমলতা দেবীর কন্যা এলা সেন কয়েকটি ইংরেজি গ্রন্থ রচনা করেছেন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

৺ডাঃ মণীন্দ্রনাথ দে

ডাঃ বিষ্ণুপদ মুখোপাধ্যায়

„ করুণশঙ্কর রায়

„ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

„ জয়শ্রী রায়চৌধুরী

„ প্রবোধচন্দ্র দাস

„ ফণীন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী

„ রবীন্দ্রনাথ ঘোষ

„ সন্তোষ মিত্র

„ সুবোধ দত্ত

„ অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়

„ নাহারুদ্দিন আহমেদ

শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়

৺প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীমঞ্জু সর্বাধিকারী

„ বার্ণিক রায়

„ যোগানন্দ দাস

„ রণজিৎ দাস

শ্রীমতি কল্যাণী কার্লেকার

„ রাবেয়া মুখোপাধ্যায়

„ সন্তোষকুমারী দেবী

কবিরাজ রবীন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী

হিল্টন এণ্ড কোম্পানি